রিক্সাওয়ালা

লাও চাঅ-র

ফুছে ইয়াং-এর বাংলা

অনুবাদক

অশোক গুহ

অগ্রণী বুক ক্লাব

১৬ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা

প্রকাশক :

প্রফুল্ল রায়

অগ্রণী বুক ক্লাব

১৬ বৃন্দাবন বসু লেন,

কলিকাতা

মুদ্রাকর :

শ্রীফণিভূষণ হাজরা

গুপ্তপ্রেশ

৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন,

কলিকাতা

প্রচ্ছদপট :

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক নির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১ কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা

চার টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর, ১৯৪৬

আশ্বিন, ১৩৫৩

পরিচিতি

চীনা সাহিত্যে নবযুগ এসেছে। এই নবযুগ এনেছেন লু-স্যুন, লাও-চাও, টিয়েন-চুন; টিঙ-লিঙ প্রভৃতি। এই সব সাহিত্যিকরা জনগণের ভিতর থেকেই এসেছেন; তাই তাদের লেখায় ফুটে উঠেছে জনগণেরই আশা?আকাঙ্ক্ষা। লাও চাও-এর রিক্সাওয়ালা সেদিক থেকে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি যেন পিকিঙ্-এর পথ ঘাট, তার পরিবেশ তুলে এনে তার বইয়ের পাতায় বসিয়ে দিয়েছেন। ঐখানে যারা ভিড় করেছে তারাও নিচুতলার মানুষ। তাদের দারিদ্র্য আশা, আনন্দ রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, নিয়ে এসেছে হতাশা। কিন্তু এই হতাশার অন্ধকারে কেউ কেউ দেখছে আলোর রেখা। মুক্তি তারা পেতে চায়, মুক্তি তারা পাবেই। এক কথায় বলতে গেলে এ চীনের পথের পাঁচালি, জনগণের পাঁচালি।

লাও-চাও সম্বন্ধেও এখানে একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। লাও-চাও এই নিচু স্তর থেকে এসেছেন। তিনি জনগণেরই একজন, উঁচু ধাপে উঠতে তিনি রাজি নন। তাদেরই জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এবং এরই জন্য সরকার থেকে তার মাথার উপর পুরস্কারও ধার্য করা হয়েছিল। আজ তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সাহিত্যিক কৌলিণ্যের গর্বে তিনি এই নিচু তলার লোকদের ভুলে যাননি। তিনি কিছুদিন আগে চুঙকিঙের এক সাহিত্য-সভায় বলেছেন: 'যতদিন বেঁচে থাকব, আমার কলম আমি ছাড়ব না; আর ছাড়ব না আমার আন্তরিকতা।'

এই আন্তরিকতারই নিদর্শন তার রিক্সাওয়ালা।

অনুবাদক

এক

যার পরিচয় দিতে যাচ্ছি সে 'উট' নয়, খুশি তার নাম। উট তার ডাকনাম—কি করে অমন অদ্ভুত নামকরণ তার হোলো, সে কাহিনী আসছে পরে। যখন সেখানে এসে আমরা পৌঁছব, তখন বলব। তারপর তার ডাকনাম ভুলে গিয়ে আসল নামেই ডাকব।

মেসিনের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে যেমন তার একটা বল্টুরও ভালো করে পরিচয় দিতে হয় তেমনি করেই খুশিকে আমরা পরিচিত করতে চাই। 'উট'—এই খেতাব পাওয়ার আগে সে ছিল স্বাধীন রিক্সাওয়ালাদের একজন। 'স্বাধীন' বলতে এমন একদল ছোকরা-রিক্সাওয়ালাদের বোঝায়, যাদের নিজেদের রিক্সা আছে। তারা নিজেদের রিক্সা নিজেরাই টেনে রুজি রোজগার করে। রিক্সাওয়ালা শ্রেণীর মধ্যে এদের গোত্র আলাদা, বেশ উঁচুই।

আর হবেই বা না কেন? নিজের রিক্সা নিজে টানবার ধাপে পৌঁছনো খুব সোজা নয়। এক বছর—দুবছর—তিন বা চার বছরের ধাক্কা তো বটেই—তার বেশিও হতে পারে। এক ফোঁটা, দুফোঁটা ঘামের তো আর কর্ম নয়—কে জানে কতো হাজার হাজার, লাখো লাখো ফোঁটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে একখানা রিক্সার মালিক হওয়া যায়। জলঝড় তুচ্ছ করে দাঁতে দাঁত চেপে ছুটে, কতোদিন চা আর ভাত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে তবে তো আসে এমন ভাগ্য। একি যে সে ভাগ্য! এতোদিনের দুঃখ আর সংগ্রামের পুরস্কার—এ যেন একশ যুদ্ধে জেতা সৈনিকের গলার পদক। এতদিন সে মালিকের রিক্সা ভাড়া নিয়ে টেনেছে, লেত্তির ঘা খাওয়া লাট্টুর মতোই বন্ বন্ করে ঘুরেছে, একমুহূর্ত জিরোতে পায়নি। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুর্ণির মতো পাক খেয়েছে, কিন্তু তার দৃষ্টি একবারও ঝাপসা হয়ে যায়নি, লক্ষ্য সে হারায়নি। সবসময়েই সে চিন্তা করেছে সেই রিক্সাখানার কথা যে তাকে মুক্ত করবে, স্বাধীন করবে—যে হবে তার হাত পায়ের মতোই এক অঙ্গ। রিক্সার মালিকের মুখঝামটা তাকে সইতে

হবে না, কারও কাছে দিতে হবে না লম্বা কৈফিয়ৎ; নিজের রিক্সা আর নিজের শক্তি—আর কি চাই? শুধু চোখ দুটো খোলা রেখে টেনে যাবে—ভাত জুটবেই।

খুশি এমনি একজন রিক্সাওয়ালা। কষ্টকে সে কোনোদিন ডরায়নি, অন্যান্য রিক্সাওয়ালাদের মত সে নয়। নিজের দোষ ক্রুটির দিকে তার কড়া নজর, সর্বদাই শোধরাতে চেয়েছে; আকাঙ্ক্ষা মনে পুষে রেখে চুপ করে বসে থাকেনি, কাজে ফলাও করতে চেষ্টা করেছে। তার পরিবেশ যদি আলাদা হোতো, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কিছুটা লেখাপড়া শেখবার সুবিধে থাকতো, তাহলে এই রবারের চাকাঠেলিয়ের দলে এসে সে নিশ্চয়ই ভিড়ত না। যে কাজেই তাকে দেওয়া যেত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুযোগ এলে সে হেলায় হারাত না। কি করবে বেচারা! ভাগ্য মন্দ তাই রিক্সাওয়ালার দলেই তাকে ভিড়তে হয়েছে। কিন্তু এখানেও সে তার ক্ষমতা আর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। আমাদের তো মনে হয়, নরকে গেলেও সে সভ্য-ভব্য শয়তান না হয়ে ছাড়ত কিনা সন্দেহ।

এক নগণ্য গ্রামে তার জন্ম। সেইখানেই সে বেড়ে উঠেছে, বাবা মা আর কয়েক 'মু' জমি হারিয়ে আঠারো বছর বয়সে সে শহরে এল। গ্রাম্য ছেলের বলিষ্ঠতা তখন তার দেহে, মনে গ্রাম্য সরলতা। রুজি রোজগারের জন্য এমন কাজ নেই যা সে করেনি, তারপরে সে ভেবে দেখল, রিক্সা টানা হচ্ছে রোজগারের সোজা সড়ক। সোজা সড়ক তো বটেই; অন্য কাজে রোজগারের একটা সীমা আছে, যতোই খাটো বেশি পয়সা মিলবে না, কিন্তু রিক্সাটানার ব্যাপারে মোটেই তা নয়। এখানে সুযোগের পর সুযোগ এসে দেখা দেবে, কোথায় বা কখন যে তুমি আশাতিরিক্ত রোজগার করবে তার হদিস তুমি নিজেই জানতে পারবে না।

কিন্তু এমন সুযোগ হঠাৎ আসে না—সে একথাও জানে। সুযোগের জন্য তৈরী হতে হবে। রিক্সাখানাকে মেজেঘষে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখতে হবে, রিক্সাওয়ালা হবে চটপটে আর তেজিয়ান। বিক্রি করবার মতো ভালো জিনিস চাই, তবে তো কদর বোঝে এমন খদ্দের মিলবে।

খুশি অনেক খতিয়ে দেখল, তার স্থির বিশ্বাস হোলো, তার মধ্যে ভালো রিক্সাওয়ালার গুণ সবই আছে। গায়ে আছে জোর, বয়েসও অল্প, শুধু রিক্সাই সে কোনোদিন টানেনি। আনকোরা নতুন রিক্সায় হাত দিতে গেলে প্রথম ভয়ই করবে। কিন্তু ঘাবড়ে গেলে তো চলবে না। তার এমন বলিষ্ঠ দেহ দশ দিন, কি বড় জোর দুহপ্তা শিক্ষানবিশী করলে চলার ধরন-ধারণ শিখে নেবে,

তারপর একটা নতুন রিক্সা ভাড়া নিলেই চলবে। মাস মাইনেয় রিক্সা টানার কাজ জোটাতে কবে পারবে কে জানে। তাড়াতাড়ি জুটে গেলেই ভালো! তারপর দুবছরের মধ্যে টাকা জমিয়ে একখানা রিক্সা কেনা খুব বিচিত্র নয়। অবিশ্যি, দুবছরের জায়গায় তিন কি চার বছরও লাগতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। খুশি তার নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে দেখে মনে মনে বলে, না তার বেশি নয়। চার বছরে নিশ্চয়ই সে রিক্সার মালিক হবে; হাঁ হবেই, এ শুধু স্বপ্নই নয়।

বয়েসের তুলনায় তার গড়ন বেশ বাড়ন্ত। বিশ বছরের কম বয়েস হলে কি হবে, দেখতে বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান, কিন্তু মুখের ছেলেমানষি ভাবটুকু ঠিকই বজায় আছে। সে কিছুদিন উঁচু ধাপের রিক্সাওয়ালাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর কোমর বেঁধে রিক্সা টানতে লেগে গেল, পুঁজি হোলো তার লোহার মতো দৃঢ় ছাতি আর সিধে মেরুদণ্ড। রিক্সা টানতে টানতে ঘাড় বাঁকিয়ে মাঝে মাঝে সে নিজের কাঁধ দেখে অবাক হয়ে যায়, এত চওড়া তার কাঁধ! পরনে ঢিলে পায়জামা, হাটু পর্যন্ত তুলে মুরগীর নাড়িভুঁড়ির ব্যাণ্ড দিয়ে বেঁধে রাখে, তাকে দেখেই মনে হয়, রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে ও হবে সবার সেরা। গ্রাম্য সরল ছেলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে ওঠে।

তার চেহারায় আকর্ষণ করবার মতো এমন কিছু নেই—মাথাটা ছোট পালিস করে কামানো, চোখদুটো গোল আর কুতকুতে—মোটামুটি গেঁয়ো চেহারা যাকে বলে। মুখখানা সব সময়েই লাল, মনে হয় এইমাত্র কেউ বুঝি থাবড়া কসিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ডান কান থেকে একটা ক্ষত প্রায় চোয়ালের হাড়ের উপর এসে পৌছেচে—ছেলেবেলায় একদিন গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল—তখন একটা খচ্চর ওকে কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নেয়; যা কবে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু দাগ মিলিয়ে যায় নি। চেহারা নিয়ে খুশি কোনোদিনই মাথা ঘামায়নি—শরীরে শক্তি থাকলেই হোলো, মুখেও তারই ব্যঞ্জনা থাকা চাই। মুখ তো হাত পার মতোই একটা অঙ্গ—হাঁ, তাই। শহরে এসেও সে মাথা নিচে দিয়ে হাতের উপর ভর করে মাঝে মাঝে দেখেছে, শরীর ঠিক আছে কিনা। যখন শরীরের উপর এমনি পরীক্ষা চলত তার মনে হোতো সে যেন একটা গাছ, তার এমন কোনো অঙ্গ নেই যা সিধে আর মজবুত নয়।

এমন কি সোজা হয়ে দাঁড়ালেও খুশিকে একটা সিধে গাছের মতোই মনে হয়। সুস্থ, জীবন্ত, নির্বাক এক গাছ। বুদ্ধিশুদ্ধি যে না আছে তা নয়, কিন্তু অন্যের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার মুখ ফোটে না। রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে নিজেদের দুঃখ আর মালিকের অবিচার নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। পথের বাঁকে, রিক্সার আড্ডায়,

ছোট চায়ের দোকানগুলিতে, হাটে বাজারে প্রতি রিক্সাওয়ালা তার নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলে, তখন সে দুঃখ আর তার নিজের থাকে না, সমস্ত দলের পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়—জনপ্রিয় গানের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খুশি গেঁয়ো ছেলে, তার জিভ আর ঠোঁট শহুরে ভাই বেরাদারদের মতো চটপটে নয়। ছেলেবেলা থেকেই বেশি কথা বলা তার ভালো লাগত না, সুতরাং সে শহরে রিক্সাওয়ালাদের মতো চটপটে হবে না এতো জানা কথা। তা ছাড়া নিজের ব্যাপার নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতেও বাধে। ঠোঁট দুটি বুজে থেকে একটা সুবিধে সে পেয়েছে, সে ভাবতে পারে, ভেবে ভেবে ঠিক নিজের পথ খুঁজে নেয়, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। বিফল হলে কাউকে সেকথা ঘুণাক্ষরেও জানায় না। এমন কি দুতিন দিন কেউ তার মুখ থেকে কথাই শুনতে পায় কিনা সন্দেহ।

তাই সে যখন ঠিক করল, রিক্সা টানবে, সে সোজাসুজি একটা রিক্সা ভাড়া করেই বসল। প্রথমে সে একটা ঝরঝরে ভাঙা রিক্সা ভাড়া নিয়ে পা দুখানাকে দুরস্ত করে নিল। প্রথম দিন কিছুই রোজগার হোলো না; দ্বিতীয় দিনে বেশ ভালোই হোলো, কিন্তু তারপর দুদিন কাটল চিৎ হয়ে শুয়ে। উরুত ঢাউস দুই কুমড়োর মতো ফুলে উঠল; আর কি অসহ্য ব্যথা! পা পাড়তেই পারল না। খুশি মুখ বুজে সহ্য করে গেল; সে জানত প্রতি রিক্সওয়ালাকেই প্রথম এই কষ্ট সহ্য করতে হয়।

ব্যথা সারতেই সে আবার উঠে দাঁড়াল। আর ভয় নেই। এবার সে যত খুশি রিক্সা টানতে পারবে; তাকে আর পায় কে! রাস্তাঘাট সে ভালো করেই চেনে, গলিঘুঁজির নাম ধাম পর্যন্ত তার মুখস্থ, দূর পাল্লায় যেতে হলেও সে ঘাবড়াবে না। গায়ে আছে জোর, আর রিক্সা টানায় জোরেরই তো দরকার। সে নিজে নিজেই রিক্সা টানার অন্ধি-সন্ধি শিখে ফেলল—পিছনে ঠেলে দেওয়া, উপরের দিকে তোলা, এমনি নানা ব্যাপার।

ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করতে গিয়ে সে বুঝতে পারল, তার জিভে তেমন ধার নেই। ঝুনো রিক্সাওয়ালারা তার থেকে ঢের বেশি ওস্তাদ। নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরে সে আর বড় রাস্তার বাঁকের রিক্সার আড্ডাগুলির ধার দিয়েও গেল না। সে এবার এমন জায়গায় রিক্সা রাখলে, যার ত্রিসীমানায় আর একখানিও রিক্সা নেই। এমন বেমক্কা জায়গায় সোয়ারি জুটতে তো লাগলই, দর কষাকষিরও হাঙামা রইল না। কাছে পিঠে রিক্সা নেই, দর হাঁকতে সে একটুও ঘাবড়ে যেত না, কখনো বা শুধু বলতো, গাড়িতে উঠুন তো, যা হয় দেবেনখন। তার মুখ দেখে কেউ মনেই করতে পারত না যে, এই গেঁয়ো ছেলেটা তাদের ঠকিয়ে পয়সা নেবে। সন্দেহ যদি বা কেউ করত, ছোকরা সবে শহরে এসেছে পথঘাট চিনবে কিনা—এই ভেবেই করত।

তার কারণও ছিল। যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, কিরে চিনতে পারবি তো? খুশি মৃদু হাসত, কথা বলত না। সোয়ারি অবাক হয়ে ভাবত গাড়িতে উঠবে কি না।

দুতিন সপ্তাহের ভেতরেই পা দুখানা বেশ দুরস্ত হয়ে উঠল, চলবার ধরন-ধারণও সে শিখে ফেলল। চলবার ভঙ্গীতেই রিক্সাওয়ালা পাকা কি আনাড়ি বোঝা যায়। যার পা ফেলার তাল বার বার কেটে যায়, সে আনাড়ি না হয়েই যায় না। জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, সবে সে গাঁ থেকে এসেছে। আর যে মাথা গুঁজে চলবে, পা যার থপ্ থপ্ করে পড়বে না, মনে হবে যেন দৌড়চ্ছে, কিন্তু আসলে জোরেই হেঁটে চলেছে—এমন লোকই হোলো ওস্তাদ রিক্সাওয়ালা। পঞ্চাশের উপরে না গেলে এমন ভঙ্গী আয়ত্তে আনা যায় না। তা ছাড়া আর একদল আছে যাদের গায়ে তাগদ নেই, অথচ অভিজ্ঞতা ষোলোআনা না হলেও পুরোপুরি দশআনা তো আছেই—তাদের আর এক ভঙ্গী। তারা যখন সোয়ারি নিয়ে চলে, সামনে ঝুঁকে পড়ে কাঁধ দুটো এগিয়ে দিয়েই চলে। হাঁটুদুটো বার বার উঁচুতে তুলে পা ফেলার তালে তালে মাথা নিচু করে তারা বুঝিয়ে দেয় জোর কদমে ছুটেছে। কিন্তু আসলে তারা ছোটেই না; শুধু ঐ ভঙ্গী পুঁজি করেই ব্যবসা চালায়।

খুশির ভঙ্গী এ দুদলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লম্বা তার পা, উরু দুটিও বেশ সবল; নিঃশব্দে সে চলত, রিক্সার হাতল দুটি সোজা থাকত—সোয়ারিকে ঝাঁকুনি সইতে হোতো না। থামবার সময়ও খুব বেগ পেতে হোতো না, দু-এক পা এগিয়ে গিয়েই থেমে পড়ত। মনে হোতো রিক্সার প্রতিটা অংশেই তার শক্তি সঞ্চালিত হচ্ছে। পিঠ একটু বাঁকিয়ে, হাতল দুটো দুহাত দিয়ে চেপে ধরে সে যখন ছুটত, সোয়ারির কোনো আশঙ্কার কারণই থাকত না।

পুরনো রিক্সাটা সে এবার বিদায় দিয়ে একটা নতুন রিক্সা ভাড়া নিল। গায়ে ঝকঝকে পিতলের আর গালার কাজ করা। বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার আচ্ছাদন, সামনের পর্দা, দুটো ল্যাম্প, আর খুব জোর আওয়াজি এক ভেঁপু—এইসব মিলিয়ে নতুন রিক্সাটি একেবারে চমৎকার। সে হিসেব করে দেখল, এমনি একখানা রিক্সার দাম একশ ডলারের উপরে তো হবেই। পিতলের আর গালার কাজ যেমন তেমন হলে একশ ডলারেই পাওয়া যাবে। রিক্সা কিনতে হলে তাহলে একশ ডলার চাই। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা হিসেব করে ফেলল, রোজ যদি দশ সেণ্ট করে জমায়, তাহলে হাজার দিন লাগবে একশ ডলার জমাতে। হাজার দিন! হাজার দিনের কথা চিন্তা করলেও মাথা ঝিম ঝিম করে। তবুও হাল সে ছেড়ে দিল না—হাজার আর দশ হাজার দিনই হোক, রিক্সা সে কিনবেই।

সে অনেক ভেবে ঠিক করল, কোনো পরিবারে মাস মাইনেয় রিক্সা টানার কাজ জুটিয়ে নেবে। মনিবের যদি অনেক বন্ধু থাকে, আর ঘন ঘন যদি তিনি নিমন্ত্রণ পান তাহলে তো কথাই নেই। মাসে গড়পড়তায় দশটা নিমন্ত্রণ পেলেই মনিবের বন্ধুদের কাছে ফিবারে সে দুই বা তিন ডলার করে দস্তুরি পাবে। এই উপরি পাওনার সঙ্গে মাসে খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাইনে থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, সব মিলিয়ে দেখা যাবে বছরের শেষে হাতে প্রায় পঞ্চাশ কি ষাট ডলার জমেছে। এমনি করে হিসেব করে দেখে সে মনে জোর পেত, মনে হোতো শীগগীরই সে বুঝি লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে, সে হবে রিক্সার মালিক। সে সিগারেট ফুঁকত না, মদও খেত না, জুয়ো খেলার অভ্যেসও তার ছিল না। এক কথায় বলতে গেলে কোনো নেশাই তার ছিল না। ছিল না পরিবারিক বন্ধন। তাই সে প্রতিজ্ঞা করল, দেড়বছরের ভিতরে সে নিজের রিক্সা নিজে টানবে। হাঁ, পুরনো ঝরঝরে রিক্সা হলে চলবে না, নতুন রিক্সাই সে কিনবে।

এক পরিবারে কাজ সে পেয়ে গেল, কিন্তু যা সে আশা করেছিল তেমনটি হোলো না। তা আশা আর বাস্তবে তফাৎ আছে বই কি। এক বছর চলে গেল, দেড় বছর চলে গেল, নতুন রিক্সা কেনা আর ঘটে উঠল না। পৃথিবীটা খুব সোজা জায়গা তো আর নয়! খুব সাবধানেই সে রিক্সা চালাল, মনিবের মন জোগাতেও কসুর করল না, কিন্তু তাতে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া আটকাতেও পারল না। কোথাও দুমাস, কোথাও বা তিনমাস, কোথাও বা আট কি দশ দিন কাজের পরেই তার চাকরি চলে গেল। চাকরি তো নয় মোমবাতির আলো, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলেই হোলো। আবার আর একজনের দরজায় গিয়ে ধরনা দেওয়া ছাড়া উপায় কি? এমনি করেই চলল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। রিক্সা টানা একদিনও কামাই গেল না, সঙ্গে সঙ্গে রইল মাস মাইনেয় কাজের চেষ্টা। রিক্সা কিনতে হবে তো। এ যেন ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া খুঁজে বেড়ানো! একটু জিরোতে সে পেল না, চাইল না।

এই সময়ে প্রায়ই তার ভুল-চুক হতে লাগল। প্রতিদিন সে পেট ভরাবার মতো রোজগার করতে পারছিল না, তার উপরে রিক্সা কেনার জন্য টাকা জমানো তো ছিলই। শক্তিক্ষয় হতে লাগল, পদে পদে ভুল করতে শুরু করল। রিক্সা টানায় আর তার মন ছিল না। কি যেন সে সারাক্ষণ ভাবত, মুখে দেখা দিল আশঙ্কার ছায়া। কবে সে রিক্সা কিনতে পারবে কে জানে? কেন এমন হোলো? সে তো চেষ্টার কসুর করেনি! এমনি নানা চিন্তা এসে জুড়ে বসল, সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এখন সে রাস্তা চলতে গিয়ে প্রায়ই বিপদ ঘটাতে লাগল।

বারের টায়ার গিয়ে পেতলের টুকরো কি ভাঙা বাসনের ওপর পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে তুবড়ি ফাটার শব্দ, যাঃ টায়ার ফেঁসে গেল! তখন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে রিক্সাখানাকে ফেলে রাখা ছাড়া আর উপায় কি! মাঝে মাঝে কারো গায়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েও সে বিপদ বাধাল। একবার তো চৌমাথা অন্যমনস্ক হয়ে পার হতে গিয়ে রিক্সাখানাকেও তুমড়ে ফেলল। মাস মাইনেয় যখন কাজ করত, এমনিধারা ব্যাপার তখন ঘটত না। কিন্তু চাকরি গেলে তার আর মাথার ঠিক থাকত না। এই ভাবনাই হোতো, রিক্সা কেনার আশা বুঝি পিছিয়ে যাচ্ছে? রিক্সা ভেঙেচুরে তার খেসারৎ দিয়ে সে আপনমনে জ্বলে উঠত। আগুনে যেন আরো খানিকটা কেরোসিন পড়ত। সে আর রিক্সা ভাড়া নিত না, সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিত। কিন্তু কদিনই বা এমনি কাটত? একদিন আবার বেরিয়ে পড়ত রাস্তায় সওয়ারির খোঁজে।

এই দুশ্চিন্তা আর ভয়ের মধ্যে তার জীবন কেটে চলল, যতই দুশ্চিন্তা তাকে চেপে ধরল ততই সে খাওয়া-দাওয়ার খরচ কমিয়ে দিল। লোহার শরীর তার, খাওয়া কমালেও শক্তি কমবে না। কিন্তু একবারও সে ভাবল না যে অসুখ করতে পারে। অসুখ করলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত, জমানো পয়সা ভেঙে ওষুধ কিনত না। কিন্তু সববারই বিনা খরচায় সেরে উঠত না। অসুখ যখন সাংঘাতিক হয়ে দেখা দিত, তখন ওষুধও কিনতে হোতো, পথ্যের জন্যও খরচ করতে হোতো। তাছাড়া বহুদিন বিশ্রাম তো দিলেই। কিন্তু এত দুঃখকষ্ট তাকে দমিয়ে কখনও দিতে পারেনি, বরং তাকে আরো দৃঢ় করে তুলল, কিন্তু রিক্সা কেনার মত টাকা জমানো তো আর সোজা কথা নয়! সম্ভাবনা কেবলই দূরে, আরো দূরে পিছিয়ে গেল।

তিনবছর এমনি করেই কাটল। তিনবছর পরে তার হাতে জমল একশ ডলার।

সে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। তার মতলব ছিল একেবারে হাল ফ্যাসানের রিক্সা কিনবে, কিন্তু একশ ডলার তো পুঁজি, তারই ভিতরে কিনতে গেলে আর মনের মতো রিক্সা মেলে না। তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, একখানা রিক্সা পাওয়া গেল, সবে তৈরী হয়েছে, কিন্তু যার জন্যে তৈরী করা হয়েছিল সে টাকা দিয়ে কিনে নিতে পারেনি। খুশি যে-রিক্সার এতদিন স্বপ্ন দেখেছে, একেবারে তেমনি না হোক, তার কাছাকাছি তো বটেই রিক্সাখানা। তার প্রকৃত দাম একশ ডলারের বেশি, কিছু বেশি, কিন্তু আগের খদ্দেরের আগাম টাকা জব্দ হয়ে যাওয়ায় দোকানী কিছু কম টাকায়ই ছাড়তে রাজি হোলো। খুশির তো মহা আনন্দ! এমন দাঁও মেরেছে, মুখ তার

খুশিতে লাল হয়ে উঠল, হাত কাঁপতে লাগল। সে ছিয়ানব্বুই ডলার বার করল গেঁজের থলে থেকে।

এই রিক্সাখানা আমি চাই। দোকানী একশ ডলারে তুলবার জন্য অনেক চেষ্টা করল, রিক্সাখানা একবার ঠেলে সামনে নিল, আর একবার পিছনে নিয়ে গেল, বাজাল ভেঁপু, সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাখানার গুণকীর্তন করে চলল কথার তুবড়িবাজি। শেষে চাকার উপর লাথি মেরে বলল, শুনছ গো কর্তা, ঘণ্টার শব্দ শুনছ! রিক্সা নে গিয়ে টেনে টেনে ঝরঝরে করে ফেল না, তবু চাকার কিছু হবে না। যদি কিছু হয়, দোকানে এসে আমার মুখের উপর চাকা দুখানা ছুঁড়ে মেরো। কিন্তু দাম একশ ডলার! একপেনি কম হলেও পারব না!

খুশি আবার তার টাকা গুনে দেখল, ছিয়ানব্বুই ডলার—একপেনি বেশি বা কম নয়।—আমি রিক্সাখানা চাই, কিন্তু ছিয়ানব্বুইয়ের বেশি আমি দিতে পারব না। দোকানী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, এর সঙ্গে দরকষাকষি করে কোনো লাভ নেই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, কি আর করব, খাতির তো রাখতে হবে। নাও গো কর্তা, রিক্সাখানা তোমার। ছ'মাসের চুক্তি রইল, ভেঙেচুরে একসা করে না আনলে এমনিই সারিয়ে দেব। এই যে চুক্তিনামা নিয়ে নাও।

খুশি হাত বাড়িয়ে দিল, হাত তখনও কাঁপছে। চুক্তিনামা নিয়ে রিক্সা ঠেলে সে রাস্তায় নেমে এল। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার, এত খুশি সে হয়েছে। রিক্সা এনে সে একটা নিরালা জায়গায় থামল। নিজের রিক্সা— ভালো করে একবার দেখতে হবে। সুন্দর রিক্সা! ঝক্‌ঝক্ করছে; আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। যতই সে দেখল, ততই তার ভালো লাগল। ঠিক মনের মতো হয়নি, একথা একবারও তার মনে হোলো না। নিজের রিক্সা সে পেয়েছে, আবার কি চাই! দেখতে দেখতে এল শ্রান্তি, কার্পেট-মোড়া পাদানের উপর বসে পড়ল, চোখ তখনো তার পিতলের চকচকে ভেঁপুটার দিকে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, এবছরে সে বাইশে পা দিয়েছে। বাপ মা অল্প-বয়সে মারা গেছে বলে জন্মতিথিটা একদম সে ভুলেই গেছে। শহরে এসে জন্মতিথিতেও যে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে তারও ফুরসুৎ পায়নি। আজকে এই নতুন রিক্সা কেনার দিনকেই যদি জন্মতিথি বলে ধরে নেওয়া যায় তাতে ক্ষতি কি! আজ তার রিক্সার জন্মতিথি তো বটেই! নিজেরটাও সে জুড়ে দিতে চায়। তারও তো নতুন করে আজ জন্ম হোলো। আজকের দিন তো

সে ভুলতে পারবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রিক্সা সে কিনেছে—এই রিক্সা তো তার শরীরের একটা অঙ্গবিশেষ।

কিন্তু কি করে এই ডবল জন্মতিথির উৎসব সে করবে? খুশি মনে মনে একটা মতলব ঠাওরাল। তার প্রথম সোয়ারি হবে ফিটফাট পোশাক পরা কোনো লোক, মেয়ে-সোয়ারি সে নেবে না। দক্ষিণ ফটক কি বাজারের দিকের সোয়ারি পেলেই ভালো হয়। বাজারে গিয়ে সবচেয়ে ভালো খাবারের দোকানে ঢুকে সে ভাজা মাংস বা অমনি কোনো খাবার খেয়ে নেবে। খাওয়া দাওয়া সেরে যদি মনমতো কোনো সোয়ারি পায় তাহলে তাকে রিক্সায় তুলবে—না হয়ত রিক্সাকে আজকের রাতের মতো বিশ্রাম দেবে। এই তার জন্মতিথির উৎসব।

রিক্সা কেনবার পর থেকে খুশির একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য দেখা দিল। জীবন এমন সহজ সরল হয়ে গেল, ইচ্ছে করলে সে এখন মাস মাইনেয় চাকরি করতে পারে, না হয় স্বাধীনভাবে ভাড়া খাটতে পারে। তেমন তাড়াহুড়ো নেই, দিনের শেষে রিক্সার মালিককে তো আর ভাড়া গুনতে হবে না। যা পয়সা রোজগার করবে সব নিজের। মনের দিক থেকেও উদারতা দেখা দিল। অনেক মিতা জুটিয়ে ফেলল! ছ'মাস রিক্সা টানবার পর তার আশা আরো বেড়ে গেল। এমনি হারে রোজগার হলে বড়জোর আর দুবছর সে রিক্সা টানবে—হাঁ দুবছরের বেশি নয়—তারপরেই আর একখানা রিক্সা কিনতে পারবে, তারপরে আর একখানা; এমনি করে একটা গোটা রিক্সার আড্ডার মালিক হয়ে বসবে।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় রঙীন আশার সমাপ্তি ঘটে তিক্ত হতাশায়, খুশির ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম হোলো না।

দুই

খুশির ভয়ডর খানিকটা কেটে গেছে। এখন সে বেশ জোরেই ছোটে, আনমনা হয়ে বিপদ বাধায় না। নিজের রিক্সা বলে সতর্কতারও কমতি নেই।

শহরে যখন এসেছিল তার থেকে মাথায় এক ইঞ্চির উপর বেড়েছে, তার তো মনে হয় আরো বাড়বে—ফনফনিয়ে বেড়ে উঠবে। ঠোঁটের ওপর দেখা দিয়েছে গোঁপের রেখা। নিচু ফটক কি ছোট ঘর থেকে বেরুতে গেলে এখন তাকে দস্তুরমতো মাথা নুইয়ে বেরুতে হয়, তাতে তার গর্বই হয়। মাথায় ঢ্যাঙা হয়েছে বটে কিন্তু মুখখানা এখনো শিশুর মতো সরল, এ এক মজা মন্দ নয়।

এনন ঢ্যাঙা জোয়ান, আর টানছে অমন একখানা চমৎকার রিক্সা; একেবারে আয়নার মতো ঝকঝক করছে রিক্সার গা, গদি কি সাদা ধবধবে, ভেঁপুতে কি আওয়াজ, ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চললে মানাবে কেন? রিক্সা আর নিজের চেহারার মান বাঁচাতে হলে জোরে ছুটতে হবে বইকি। না, এ তার গর্ব নয়, তার দায়িত্বের কথাই উঠছে। উড়ে যেতে না পারলে এমন রিক্সা, এমন জোয়ান চেহারার মান থাকে না। কারো কাছে একথা মুখ ফুটে সে বলেনি। কি হবে বলে? মনের সায় আছে যখন, তখন আর কি। সে ছুটেই চলবে, সোয়ারি নিয়ে সে উড়েই যাবে।

রিক্সাখানাকেও সে ভালো বেসে ফেলেছে। ছমাস যেতে না যেতে তার প্রত্যেকটা অংশ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ওর তো মনে হয় তার যেন মন আছে। খুশি যখন এপাশে ওপাশে হেলে পড়ে, রিক্সাখানা কথা কয়ে ওঠে, তাকে সাহায্য করে। অসহযোগিতা কখনো করে না। যখন মসৃন নির্জন রাস্তায় সে চলে তখন আর দুহাত দিয়ে হাতল চেপে ধরতে হয় না, এক হাত দিয়ে আলতো ভাবে চেপে ধরে চালায়, কাঁকরের উপর চাকা নাচতে নাচতে চলে, মনে হয় হালকা বাতাসে যেন ভেসে চলেছে। যখন সোয়ারিকে ঠিকানায় পৌঁছে দেয়, জামা একেবারে ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে যায়, মনে হয় এইমাত্র ধুয়ে দিয়েছে, এখনো নিড়ানো হয়নি। পরিশ্রান্ত সে হয় বটে, কিন্তু গর্বও হয়—মনে হয় তেজী ঘোড়াকে সায়েস্তা করে দশ লি চক্কোর দিয়ে সে ফিরল!

কিন্তু ভয় তার কমেছে বলে, সতর্কতা তার কমেনি। জোরে ছুটতে না

পারলে যেমন সোয়ারির কাছে তার মান থাকে না, তেমনি রিক্সাখানা অসতর্ক হ'য়ে ভেঙে বা দুমড়ে ফেললে নিজের কাছে নিজের মানই বা বাঁচে কই! রিক্সা তার জীবন, সাবধান সে তো হবেই। সাবধানতা আর সাহস এই দুয়ে মিলে এসেছে তার আত্মবিশ্বাস: সে এখন বিশ্বাস করে যে, সে আর তার রিক্সা দুই-ই লোহা দিয়ে তৈরী, ভারী মজবুত।

শুধু জোরেই সে ছোটে না, এখন খাটুনিও বেড়ে গেছে। সে মনে করে রিক্সা টেনে ভাতের জোগাড় করা মস্ত বাহাদুরি। যখন ইচ্ছে তখন রিক্সা ঠেলে রাস্তায় নেমে পড়ে, বাধা দেওয়ার তো কেউ নেই! বাইরের গুজবে সে কান দেয় না; সে কি আর শোনেনি যে, চ্যাঙ্‌ মিন টিয়েন-এ লড়াই হচ্ছে, সৈন্য সংগ্রহ চলছে, অথবা শহরের পশ্চিম ফটক দিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কি আর হবে? দোকানীরা দোকানের ঝাপ টেনে দেবে, হয়ত শীগগীরই পথে সশস্ত্র পুলিস কি শান্তিরক্ষা-বাহিনী দেখা দেবে। কিন্তু তার কি আসে যায়? রাস্তায় রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে বিপদ না বাঁধালেই হোলো, গুজবে সে বিশ্বাসই করে না। তবে তার নিজের রিক্সা বলেই সাবধান হতে হ'য়েছে, কিন্তু শহুরে লোকের মতো হাওয়া দেখেই বৃষ্টির আঁচ সে এখনো করতে শেখেনি। তাছাড়া নিজের উপর তার এটুকু বিশ্বাস আছে যে, যতই বিপদে পড়ুক বেরিয়ে সে ঠিকই আসবে। অমন জোয়ান চেহারা, অমন চওড়া কাঁধ, তাকে বিপদে ফেলা তো আর সোজা কথা নয়!

লড়াইয়ের খবর আর গুজব প্রতিবছর বসন্তেই শোনা যায়। শস্যের পাকা ছড়ার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে! উত্তর চীনের লোকদের কাছে শস্যের পাকা ছড়া যেমন আশা নিয়ে আসে, তেমনি আনে সঙিনের ভীতি। খুশির রিক্সার বয়স সবে মাস ছয়েক হয়েছে, এমন সময় শস্য পাকার সময় হয়ে এল। বসন্তের বর্ষণের জন্য ছড়াগুলো তখন উন্মুখ হয়ে আছে। চাষীরা আশা করছে বৃষ্টির, কিন্তু বসন্তের খেয়ালী বৃষ্টির তখনো দেখা নেই, কিন্তু এদিকে লড়াই ঠিক বেঁধে গেল। সে তো আর কারো অপেক্ষা রাখে না।

খবর সত্যি কি মিথ্যে তা নিয়ে খুশি মাথা ঘামায় না। সে যে একদিন চাষার ছেলে ছিল তাও সে ভুলে গেছে। যুদ্ধ এলে খামার নষ্ট হবে তো তার কি এল গেল! বসন্তের বৃষ্টিরও সে তোয়াক্কা রাখে না। একমাত্র রিক্সাখানই তার ধ্যান-জ্ঞান, তারই দৌলতে ভাত তার জুটবে। এ যেন এমন এক টুকরো জমি, যে ফসলই বোনো না কেন, মরে হেজে যাবে না। তাছাড়া আর এক সুবিধা আছে; সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে, চোখে চোখে রাখা যাবে। তবে বাইরের পৃথিবীর হালচাল যতটুকু জানা দরকার খুশি তা জানে। অনাবৃষ্টি আর যুদ্ধের গুজবে জিনিসপত্রের দাম চড়ে যাচ্ছে, এ-তো যে কোনো জিনিস কিনতে গিয়েই সে

টের পায়। কিন্তু শহুরে লোকের মতো শুধু অভিযোগই করে, প্রতিকারের কোনো উপায়ই খুঁজে পায় না। জিনিসপত্রের দাম চড়ছে, কিন্তু কি করা যায়? সস্তা করবার উপায় কি? কেই বা করবে! ওসব গোলমেলে ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে নিজের রুজি রোজগারের ধান্ধায়ই ব্যস্ত। এতদিন শহরে থাকা তার বৃথা যায়নি, শহুরে লোকের ধাঁচ সে পুরোপুরি পেয়েছে।

শহুরে লোক প্রতিকারের উপায় ভাবুক না ভাবুক, গুজব রটাতে খুবই ওস্তাদ। কিছুই ব্যাপার নয়, একটা গুজব রটালেই হোলো; কখনো বা গুজবের মধ্যে একটু-আধটু সত্যের ছিটেফোঁটাও মিলে যায় বটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তারা বোকা বা কুড়ে দুটোর একটাও নয়। এক ঝাঁক যেন ছোট মাছ; বিশেষ কিছু করবার নেই বলে জলের উপর মাথা তুলে কতগুলো বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করছে। এই মিথ্যে গুজবের ভিতরে সেরা গুজব হচ্ছে যুদ্ধের: অন্য গুজবগুলি পরী আর দৈত্যের রূপকথার মতো। যতই বলো না কেন, তারা কখনো বাস্তবে দেখা দেবে না। কিন্তু যুদ্ধের গুজবের ব্যাপারই আলাদা। দেখতে দেখতে বাজে গুজব যে কখন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে কে জানে। গুজব আর সত্যি ঘটনায় অন্য ব্যাপারে যথেষ্ট তফাত থাকলেও যুদ্ধের ব্যাপারে তা মোটেই নয়। এখানে গুজবের আট কি ন'ভাগ তো সত্যি বটেই, তার বেশিও হতে পারে।

শীগগীরই যুদ্ধ বাধবে! একথা যদি কারো মুখ থেকে আপনি শোনেন, ঠিক জানবেন যুদ্ধ বাধলো বলে। কাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে তা নিয়ে হয়তো নানা লোকের নানা মত শুনবেন। খুশি একথা ভালো করেই জানে। রিক্সাওয়ালারা যুদ্ধ চায় না বটে, কিন্তু যুদ্ধ এলে তাদের খুব ক্ষতি নেই। যুদ্ধ বাধলে বড়লোকরাই ভয় পায় সবচাইতে বেশি। গুজবের হাওয়া উঠলেই তারা পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। টাকার লোভে তারা কোথাও গিয়ে জোটে বটে, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনায় সেখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে সরে পড়তেও দেরি হয় না। কিন্তু পালাতে গেলেও একা তারা পারে না। তাদের পা যে টাকার ভারে ভারী হয়ে গেছে; সুতরাং ভাড়া করা পা চাই বইকি। বাক্স বইবার জন্য চাই কুলি; তাদের নিজেদের ভারী গতরের জন্য চাই রিক্সা। তাই যুদ্ধ এলে আশঙ্কা আছে কিন্তু রিক্সাওয়ালাদের এ একটা মরশুমও বটে। দরও তখন যথেষ্ট চড়া। পুবের স্টেশন—কোথায় কর্তা? পুব স্টেশন—এক ডলার চল্লিশ সেণ্ট—এক পয়সা কমে হবে না—লড়াই এগিয়ে এল বলে! এমনি এক দুর্যোগের দিনে খুশি এক সোয়ারি পেল। শহরের দেয়ালের বাইরে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। গত দশদিন ধরে যুদ্ধের গুজব জোর চলছে, জিনিসপত্রের দামও চড়ছে। যুদ্ধ এখনো বহুদূরে, শীগগীর যে পিকিঙ্-এ

পৌছবে এমন লক্ষণ নেই। খুশি আপন খুশিতে রিক্সা টেনে চলল, গুজবের জন্য কামাই দিতে সে রাজি নয়। সেদিন সে রিক্সা নিয়ে শহরের পশ্চিম দিকে বেরিয়ে পড়লো। চারদিকে আসন্ন বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। পথ খাঁ খাঁ করছে, একটা রিক্সারও চিহ্ন নেই পথে, এমন কি চিঙ্-হুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও নয়। নিউ রোড দরজার কাছে কিছুক্ষণ সে ঘুর ঘুর করে বেড়াল। সোয়ারির দেখা নেই! একজন পথচারী তাকে ডেকে বলল, আজ আর শহরের বাইরে যাওয়ার সোয়ারি মিলবে না, পশ্চিম দরজার বাইরে গাড়ি রিক্সা সব আটক করা হচ্ছে। খুশি ঠিক করল, একপাত্র চা খেয়ে রিক্সা নিয়ে চলে যাবে। রাস্তা যখন খাঁ খাঁ করছে, বিপদ আসন্ন নিশ্চয়ই। অবিশ্যি বিপদকে সে ডরায় না, কিন্তু শূন্য রাস্তায় টহল দিয়ে তো আর লাভ নেই।

সে এমনিধারা চিন্তা করছে এমন সময় দক্ষিণ দিক থেকে দু'খানি রিক্সা এসে হাজির হোলো। সোয়ারি দুজনকে ছাত্র বলেই মনে হয়। তারা দুজন চিৎকার করে বলছে, চিঙ্ হুয়া কে যাবে—চিঙ্ হুয়া। চিঙ্ হুয়া বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে বেশ কিছু দূরে। রিক্সাওয়ালারা চুপ করে রইল; একজন বসে বসে পাইপ টানছিল, সে একবার ঘাড় ফিরিয়েও দেখল না। বিপদ ঘনিয়ে আসছে, এখন কে শহর ছেড়ে চিঙ্ হুয়া যাবে? রিক্সার সোয়ারি দুজন আবার চিৎকার করে উঠল, কি, সব বোবা হয়ে গেছ নাকি? চিঙ্ হুয়া কে যাবে—চিঙ্ হুয়া!

মাথা কামানো ছোকরা রিক্সাওয়ালা বলে উঠল দুডলার পেলে আমি যাই কর্ত্তা। যেন সে অন্য রিক্সাওয়ালাদের ঠাট্টা করেই কথাটা বললো।

চলে এস, আর একখানা আমাদের যোগাড় করতে হবে। রিক্সা দুখানা এবার থামল। ছোকরা রিক্সাওয়ালা একটু হকচকিয়ে গেল, কি করবে ভেবে পেল না। অন্য সবাই চুপ. খুশি বুঝতে পারল, এখন শহরের দেয়ালের বাইরে কেউই যেতে রাজি নয়; নইলে স্বাভাবিক অবস্থায় বিশ কি ত্রিশ সেণ্টে সওয়ারি নিয়ে তারা চিঙ্ হুয়া গেছে, আর আজ কিনা দু দু ডলারেও কারো মুখে রা নেই। অন্যের কথা থাক্, তার নিজেরই তো যাওয়ার ইচ্ছা নেই। কিন্তু ছোকরা-রিক্সাওয়ালা নাছোড়বান্দা, সে ঠিক করল, কেউ না যায় সে একাই যাবে। কিন্তু তার আগে একবার কাউকে ভিড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ খুশির দিকে তার নজর পড়ল।

কি রে জোয়ান মরদ যাবি নাকি?

'জোয়ান মরদ'—এই দুটি কথা শুনে খুশি হাসল—আত্মপ্রসাদের সে হাসি; বেশ কথাটা বলেছে তো। সে ভেবে দেখল, অন্তত এমন প্রশংসার জন্যেও

তো ছোকরার সঙ্গী হওয়া উচিত। তারপরে ডুডলার তো আছেই। রোজই আর এমন মওকা মেলে না। বিপদ? নাওতো ঘটতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, দুদিন আগে সে শুনেছিল 'স্বর্গের বেদী' অঞ্চল নাকি পল্টনে ভরে গেছে, কিন্তু নিজে গিয়ে তো পল্টনের টিকিও দেখতে পায়নি। রিক্সা টেনে নিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিপদ আসে আসুক না, সে যাবেই।

পশ্চিম দরজায় পৌঁছে তারা সেখানে পাহারাওয়ালার চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেল না। খুশির ভয় হোলো। ছোকরাও ভয় পেয়েছে, কিন্তু মুখের হাসি বজায় রেখে সে বলল, সাঙাৎ, কপাল যদি ভালো হয়, কোনো ভয় নেই আর কপাল মন্দ হলে কি আর করা যাবে? বিপদ এড়াতে চাইলেই কি এড়ানো যায়?

খুশি বুঝতে পারল, অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু এতদূর এসে এখন ভয়কাতুরে বুড়ির মতো ফিরে গেলে চলে না। যা থাকে বরাতে এগুতেই হবে।

পশ্চিম দরজা পার হয়ে তারা এগিয়ে চলল। পথ শূন্য; যতদূর চোখ যায় একখানা রিক্সা নেই। খুশি নুয়ে পড়ে রিক্সা টেনে চলেছে, বুক ভয়ে ধুক্ ধুক্ করছে। আশেপাশে তাকাবার সাহস তার নেই। 'উজ্জ্বলা ব্রিজের' কাছে এসে সে একবার মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে চারিদিকে তাকাল। না, একটাও সৈন্য দেখা যাচ্ছে না, বুকের ধুকধুকানি কমে এল। সে মনে মনে বলল, ডুডলার পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি! একটু সাহস না থাকলে এমন দাঁও তো ফস্কাবেই। এমনি সে কথা বলে না, কিন্তু কি মনে করে আজ সে সঙ্গীকে বলল, ভাই সোজা সড়ক ছেড়ে এবার অন্যপথ ধরা যাক, কি বলিস্!

আরে আমাকে আর বলতে হবে না। সোজা শড়কে চলে কি ফ্যাসাদ বাঁধাব!

মোড় ঘুরতে যাবে এমন সময় এক কাণ্ড হোলো। কোথা থেকে জনদশেক সৈন্য ছুটে এসে তাদের ঘিরে ফেলল। তারা হোলো বন্দী।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা। খুশির একটা জামায় শীত মানে না, কিন্তু উপায় নেই। পোশাক নেই, নেই বিছানা, শুধু সৈনিকদের বহু ব্যবহৃত একটা ধূসর কোট, আর নীল রঙের পায়জামা—তাও ঘামের দুর্গন্ধভরা। যখন ওরা তাকে ওগুলো ব্যবহার করতে দেয়, তখনই ঘামে জবজবে ভিজে ছিল। ছেঁড়া কোটটার দিকে তাকিয়ে খুশির মনে পড়ল, তার নিজের নীল রঙের কোট আর পায়জামার কথা। কেমন চমৎকার একেবারে ধবধবে পরিষ্কার!

ঘামের গন্ধ নাকে এসে ঢুকছে, পোশাক ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে গেছে! সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। অতীতের কথাই মনে পড়ছে। কত খেটে খুটে সে রিক্সা কিনেছিল! আজ তার মনে হয়, সে এক কীর্তি। যত মনে পড়ে, তত সৈন্যদের প্রতি ঘৃণা তার বেড়ে যায়। তার পোশাক কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে টুপি আর রিক্সা। এমন কি কোমরে যে কাপড়ের ফালিখানা সে কোমরবন্ধের মতো জড়িয়ে রাখত, সেখানা পর্যন্ত তারা কেড়ে নিতে ছাড়েনি। শুধু তাই-ই নয়। মেরে মেরে শরীরে তারা কালশিরা দাগ ফেলেছে, পায়ের তলায় পড়েছে ফোস্কা।

আচ্ছা, পোশাক আর গায়ের দাগের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, নতুন পোশাক না হয় কেনা যাবে, কালশিরা দাগও মিলিয়ে যাবে, কিন্তু রিক্সাখানার কি হবে? গায়ের রক্ত জল করে রিক্সা সে কিনেছিল, সেই রিক্সা তারা কেড়ে নিয়েছে! ছাউনিতে পৌঁছবার পর আর রিক্সাখানার চেহারা দেখেনি। সব কিছু সে এক নিমেষে ভুলতে পারে, কিন্তু রিক্সাখানার কথা কি করে ভুলবে।

কষ্টকে সে ডরায় না। কিন্তু মুখের কথায় তো আর একখানা রিক্সা জুটবে না। আবার কয়েক বছরের ধাক্কা তো বটেই। নতুন করে শুরু করতে হবে। খুশি কেঁদে ফেললে। শুধু সৈন্যদের উপর নয়, সমস্ত পৃথিবীর উপর তার ঘৃণা জন্মেছে। কেন তার উপর এমন অবিচার হোলো, কেন, কেন? সে চিৎকার করে উঠল।

নিজের স্বর শুনে সে চমকে গেল। না, না, এখন পুরনো দিনের জাবর কাটলে চলবে না। এখন শুধু ভাবতে হবে কি করে সে জ্যান্ত এদের হাত থেকে পালাতে পারে সেই উপায়।

এটা কোন জায়গা? তাও সে জানে না। কদিন ধরে পল্টনের সঙ্গে চলেছে তো চলেছেই, মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে, কিন্তু তবু বিরাম নেই। সৈন্যদের জিনিস-পত্র ঠেলা গাড়িতে টেনে নিয়ে চলেছে। যখন তারা কোথাও তাঁবু ফেলে, তখনো সে ছুটি পায় না। জল আনে, আগুন ধরায়, ঘোড়াগুলির দানাপানি জুগিয়েছে, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এমনি চলে—মন ফাঁকা হয়ে গেছে। দুপুর রাতে শান্ত হয়ে ঘুমোতে যখন যায়, তখন আর ভাববার শক্তি থাকে না, মরার মতো ঘুমোয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আর যদি চোখ খুলতে না হয় তাহলেই বুঝি সে বাঁচে!

তার শুধু এইটুকু মনে আছে, পল্টন প্রথমে পাহাড় অঞ্চলে যায়। পাহাড় বেয়ে উঠবার সময় সে অন্য কোনো কথা ভাববার ফুরসৎ পায়নি। শুধু মনে হোতো, এই বুঝি পা ফসকে সে পড়ে গেল! পড়ে গেলে তো আর নিস্তার নেই—সাদা ঈগলগুলো কেমন চারদিকে উড়ছে! ওরা ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে মাংস খেয়ে নেবে, হাড়

কথানাই শুধু থাকবে। দিনের পর দিন এমনি পাহাড় বেয়ে চলবার পর, একদিন আবার সমতল জমি দূরে দেখা দিল।

তখন সূর্য ডুবে গেছে, রাত হয়েছে। রাতের খাওয়ার বিউগল বেজে উঠল, যারা কিছুদূরে পাহারায় ছিল তারা ফিরে এল। তাদের সঙ্গে তিন চারটে উট! খুশির বুক দুলে উঠল। এতদিন মন ছিল তার ফাঁকা, কোনো ভাবনা মুহূর্তের জন্য দাগ ফেলতে পারেনি, আজ কিন্তু ভাবনার ছায়া পড়ল তার মনে। এ যেন দিশেহারা কোনো পথিক, পথ ভুলে ঘুরে মরছিল, হঠাৎ চেনা পথ-রেখার দিগ পেয়েছে। এবার আর তাকে পায় কে! উট পাহাড়ে উঠতে পারে না! তারা তাহলে সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছেচে। পিকিঙ-এর পশ্চিমে গাঁয়ের লোকেরা উট পোষে—একথা সে জানে। তাহলে এত ঘুরে ঘুরে তারা কি এতদিনে মাত্র পিকিঙ-এর কিছুটা পশ্চিমে এসেছে! এ আবার কি ফন্দি এদের? ভেবে সে কোনো কূলকিনারা পেল না। পিকিঙ-এর পশ্চিমে তাহলে কি তারা হোয়াইটস্টোন গিরিবর্ত্মে এসে হাজির হয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে এই তো মস্ত সুযোগ! এখান থেকে উত্তর-পুব দিকে পাহাড়; দক্ষিণে রেলের লাইন। একটা সোজা সড়ক পশ্চিমেও চলে গেছে। পল্টন কোন পথ ধরবে কে জানে। কিন্তু তার পালাবার এই সুযোগ!

পল্টন যদি পাহাড়ের দিকে যায়, তাহলে সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করা বৃথা; পালালেও উপোস করে মরবার যথেষ্ট আশঙ্কা। পালাতে হলে এইই উপযুক্ত জায়গা। এখান থেকে সে ঠিক শহরে পালিয়ে যেতে পারবে। যদিও দূর বটে, কিন্তু পথঘাট চেনা! খুশি উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ক্লান্ত দেহে আবার যেন শক্তির জোয়ার এসেছে, বুকে লেগেছে দোলা। সারাদেহ কাঁপছে উত্তেজনায়।

দুপুর রাত গড়িয়ে গেল, তবু চোখে ঘুম এল না। আশায় সে উল্লসিত হবার পরক্ষণেই এল নিরাশা। যদি বিফল হয়? পাশ ফিরে কতবার সে ঘুমোতে চেষ্টা করল, পারল না। চারদিক নিস্তব্ধ; আকাশ তারায় তারায় ভরে গেছে। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ওকি! উট ডাকছে। বেশি দূরে নয়, কাছেই, কান পেতে সে শুনল। কেমন যেন বিষণ্ণ ডাক, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে না।

হঠাৎ দূরে কামানের গর্জন শোনা গেল—বহুদূরে কিন্তু কামানের শব্দই বটে। চারদিকে হল্লা-হুল্লোড়, ব্যস্ততা। সে উঠে বসল; সময় এসেছে! পল্টনকে এবার পাহাড়ে গিয়ে লুকোতে হবে—তাছাড়া উপায় নেই!

নিশ্বাস বন্ধ করে সে হামাগুড়ি দিয়ে চলল উটগুলোর খোঁজে। উট তার কোনো উপকারেই আসবে না। কিন্তু ভারবাহী হিসেবে সেও তো ওদেরই একজন—তাই বুঝি কেমন মায়া পড়ে গেছে। চারদিকে ব্যস্ততা, হল্লা। সে খুঁজে পেল তাদের।

উটগুলি মাটির ঢিবির মতো নিঃশব্দে পড়ে আছে, শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চারদিক চুপচাপ। সৈনিক যেমন করে বালির বস্তার পেছনে আশ্রয় নেয়, তেমনি করে সে উটগুলির পেছনে পালিয়ে রইল। মনে মনে সে খতিয়ে দেখল—গুলির শব্দ দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। যদিও লড়াই না বেধে থাকে তবু ওপথে ওরা যাবে না। পাহাড়েই পালাবে, কিন্তু উট সেখানে অচল। ওদের উটগুলো এখানে রেখেই পালাতে হবে। মাটিতে কান পেতে সে শুনতে চেষ্টা করল পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে কিনা, বুক কাঁপতে লাগল অজানা আশঙ্কায়।

বহুক্ষণ কেটে গেল। না, কারো সাড়াশব্দ নেই। উটের খোঁজেও কেউ আসেনি। উটগুলির কুঁজের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখল। কেউ কোথাও নেই, শুধু ঘন কালো রাত চারদিক ছেয়ে আছে। আর কি—এবার সে ছুটবে। বরাতে যাই থাকুক—সে ছুটবেই!

তিন

কিছুদূর গিয়েই খুশি থামল। উটগুলি ফেলে সে যেতে রাজি নয়! নিজের জীবন ছাড়া আর রেস্ত বলতে কিছুই তার নেই। পথে এখন এক টুক্‌রো শণের দড়ি দেখলেও সে তা কুড়িয়ে নিতে পারলে খুশি হয়। হয় তো কোনো কাজেই আসবে না, কিন্তু হাতের মুঠোয় পুরে সুখ আছে বই কি! এ যেন মস্ত অবলম্বন—নিজেকে আর সর্বহারা বলে মনে হবে না। এখন অবশ্য নিজের প্রাণ বাঁচানোই সব চাইতে বড় কথা—কিন্তু কি হবে প্রাণ বাঁচিয়ে যদি আর কিছু না রইল? উটগুলি সে নিয়ে যাবে। উট দিয়ে কি হবে, সে কথা সে ভাবল না। তবু তো কিছু হাতে পাওয়া গেল।

উটগুলিকে টেনে সে তুলল। জন্তুদের কি করে বাগ মানাতে হয় সে জানে না। কিন্তু ভয় সে পেল না। উটগুলি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। সে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। কটা সে নিয়ে চলেছে, সবগুলি বাঁধা আছে কিনা—সেদিকে নজরই দিল না।

কয়েক পা গিয়ে আপশোষ হোলো, উটগুলি নিয়ে এসে সে ভালো করেনি। ভারী বোঝা বয়ে বয়ে এই জন্তুগুলির জোরে চলার অভ্যেস নেই। তাকে এখন ওদেরই সঙ্গে আস্তে আস্তে সাবধানে চলতে হবে। রাস্তায় এখানে জল, ওখানে কাদা—একবার পিছলে পড়লে হোলো। ওদের পা দুখানাই সব, জখম হলে আর রইল কি? তার পর পল্টনের ভয় এখনো যায়নি।

কিন্তু ছেড়ে দিতেও তার মনে ধরল না। আচ্ছা দেবতারাই বলুন—বিনে পয়সায় পাওয়া উটগুলি কি করে সে ছেড়ে দেয়?

রিক্সা টানতে ওস্তাদ বলেই দিক সম্বন্ধে জ্ঞান তার টনটনে। কিন্তু এখন সব যেন কেমন ঘুলিয়ে গেল। উটগুলো পেয়ে সে পথের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেনি। তার উপর কি কালো রাত। এখন তারারাই ভরসা। কিন্তু তারাগুলো কেমন মিট মিট করছে—মনে হয় ওরা বুঝি তার থেকেও মুস্কিলে পড়েছে। খুশি আর আকাশের দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল। জোরে সে চলতে চাইল, কিন্তু উটগুলির জন্যে চলতে পারল না।

সে ভেবে দেখল, উট নিয়ে চলতে হলে তাকে সদর সড়কেই চলতে হবে। হোয়েটস্টোন গিরিবর্ত্ম থেকে হলুদ গাঁ পর্যন্ত একটা সোজা রাস্তা আছে, উট

নিয়ে চলাচলে সে পথে কোনো অসুবিধেই হবে না। রিক্সাওয়ালার কাছে সোজা পথের দাম ঢের বেশি। কিন্তু বিপদ এই যে, ও পথে লুকিয়ে থাকবার সুবিধে নেই। যদি আবার পল্টনের সঙ্গে দেখা হয়, তখন কি হবে? পল্টনের সঙ্গে দেখা না হলেও আর এক বিপদ আছে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, উট সে কোথায় পেল, কি উত্তর দেবে? তার ছেঁড়া পোশাক দেখে কেউ তো আর তাকে উটের মালিক বলে বিশ্বাস করবে না। না, মালিকের ভূমিকায় তাকে মানায় না, একেবারেই না! নিশ্চিন্ত হতে হলে, তাকে জন্তুগুলি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারল না, দড়ি ধরে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। ওদের ছেড়ে সে দেবে না, লোক বুঝে গল্প তৈরী করে বলবে, যদি বেঁচে থাকে, কয়েকটা উটের মালিক হয়ে বেঁচে থাকাই তো ভাল, আর মরলে তো সব ল্যাঠাই চুকে গেল।

গায়ের জামাটা সে ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলল, কলার আর পিতলের বোতাম ছুঁড়ে ফেলে দিল। এখন আর সৈন্য বলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। পায়জামা গুটিয়ে হাঁটু পর্যন্ত তুলে দিল। কিন্তু এখনো ঠিক উট-চালক বলে তাকে মনে হয় না; দল ছেড়ে পালানো সৈনিকও আর সে নেই।

তার মনে হোলো উটের পিঠে চড়ে বসলে বেশ হয়। খিদেয় পেট জ্বলছে, চলবার শক্তি আসছে কমে, উটের পিঠে চড়লে অন্তত খিদের জ্বলুনি খানিকটা কমবে, শক্তিও ক্ষয় হবে না। কিন্তু উটের পিঠে চড়াই যে মুস্কিল। উটকে কোনো উপায়ে হাঁটু গেঁড়ে বসাতে হবে। সে তো, সময়সাপেক্ষ, ও নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় নেই। তাছাড়া উটের পিঠে চড়লে সুমুখের পথ ঘাট অত উঁচু থেকে দেখাই যাবে না, আর উট যদি একবার পা পিছলে পড়ে যায় তাহলে তাকেও কুপোকাৎ হতে হবে। না, তার চাইতে হাঁটাই ভালো।

সে বুঝতে পারল, সদর রাস্তা ধরেই সে চলেছে; কিন্তু কোথায় কোন অঞ্চলে সে ক্রমে এসে পড়েছে, কোনদিকেই বা যাচ্ছে—সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারল না। গভীর রাত, দীর্ঘদিনের উপোস আর ভয়ে শরীর আর মন পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে; আর চলতে চায় না এমনি অবস্থা। নিজের আস্তে আস্তে চলার তালে তালে ঘুম পাচ্ছে, একরকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সে চলেছে। রাত এখনো ঘন কালো; হাওয়া বইছে, মন অজানা আশঙ্কায় ভরে গেছে। খুশি ভালো করে পায়ের নিচের পথরেখার দিকে তাকাল। সুমুখে পথ যেনো দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে, পা বাড়াতেই ভয় হয়। কিন্তু পা বাড়ালেই যেকে সেই; পা মাটিতেই ঠেকছে, সমতল জমিতেই পা পড়ছে। তবু এমন রাতে সাবধান না হয়ে

উপায় নেই। খুশি নিজের উপরই রেগে গেল। কিন্তু উপায় কি? চোখে ছাই কিছুই দেখা যাচ্ছে না! মনে হচ্ছে, শূন্যতা থেকে শূন্যতায় সে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে চলেছে উটের সার।

ক্রমে আঁধার চোখে সয়ে এল। বুকের ধুক-ধুকানি কমেছে, চোখ বুজে আসছে। সে বুঝতে পারল না, এগিয়ে চলেছে না একেবারে থেমে পড়েছে। শুধু সে অনুভব করল একের পর এক গতির ঢেউ—এক কালোয় কালো সমুদ্র যেন দুলে দুলে উঠছে। সব কিছু আবছা হয়ে আসছে, তালগোল পাকিয়ে গেছে। চোখ খুলে রাখবার উপায় তাকে খুঁজে বার করতে হবে এখন। যদি গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তিনদিনেও সে ঘুম ভাঙবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কি করে চোখ খুলে রাখা যায়? মাথাটা ঘুরছে, সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা; পা তুলতে পারছে না; গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করাই শক্ত, নিজের সত্তাই যেন সে ভুলে যাচ্ছে। একটা মোমবাতি নিবে এসেছে প্রায়, এখন চারদিকে আলো ছড়ান তো দূরের কথা, নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখাই শক্ত।

আর কখনো সে এমন বিপদে পড়েনি, এমন অনিশ্চিতের ঢেউয়ে হাবু-ডুবু খায়নি। বন্ধু তার বড় কেউ নেই, আর তার প্রয়োজনও সে বোধ করেনি। সূর্য যতক্ষণ আলো দিচ্ছে, যতক্ষণ চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ ভয় করবার কিছু নেই। কিন্তু এমন আঁধার রাতে···

গাধা বা খচ্চর হলে ছিল ভালো, সায়েস্তা করবার জন্যে জেগে থাকতেই হোতো, কিন্তু উটরা একেবারে নিরীহ জন্তু। চলেছে তো চলেছেই—দড়িতে একটু টানও পড়ছে না। মাঝে মাঝে তাকেই বরং সজাগ হয়ে দেখতে হচ্ছে, উটগুলো আছে কিনা। বলা তো যায় না, তার ঘুমের সুযোগ নিয়ে হয় তো পালিয়েই গেছে। এ যেন এক চাঙড় বরফ দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলছিল, কখন যে গলে জল হয়ে গেছে টেরও পায়নি।

কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল—সে নিজেই জানে না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে। মিনিট পাঁচেকও হতে পারে, আবার এক ঘণ্টাও হতে পারে।

সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। এ স্বাভাবিক ঘুম ভাঙা নয়, হঠাৎ হোঁচট খাওয়া বরং বলা যেতে পারে। এখনো তেমনি আঁধার সব লেপে পুঁছে একাকার করে দিয়েছে। শুধু মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ স্বর কানে এসে বাজছে; মাথার ভিতরের ভার যেন গলে যাচ্ছে; ঘুমের নেশা কেটে যাচ্ছে।

উট? অন্য কিছু চিন্তা করবার সময় নেই। হাতে দড়ি রয়েছে, উটগুলি ঠিক আছে তো? হাঁ, ঠিকই আছে। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, আলসেমি এখনো যায়নি। নড়তে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ঘুমোলেও তো চলে না। ফন্দি

ঠাওরাতে হবে, ভেবে চিন্তে ফন্দি ঠাওরাতে হবে। রিক্সার কথাও তার মনে পড়ল। রিক্সাখানা বেহাত হয়েছে। কেন এমন হোলো ?

প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। উটগুলোর দিকে সে তাকাল। রাতের আঁধারে সে গুনে দেখবার সময় পায়নি, এখন গুনে দেখল। তিনটে উট। বেশি নয়, কিন্তু ওরাই এখন তার একমাত্র ভরসা। উটগুলি বেচে একখানা রিক্সা কিনলেই তো হয় ? সে লাফিয়ে উঠতে গেল। তাইতো এমন বোকা সে, আগে একথা ভাবেইনি।

মন সে স্থির করে ফেলল। মোরগের ডাক সে শুনতে পেয়েছে তো ? মোরগ যদি রাত দুটোর সময়ও ডেকে থাকে, তাহলেও ভোর হবার আর বেশি দেরী নেই। আর কাছে যখন মোরগ আছে, তখন গ্রামও আছে নিশ্চয়ই। হয় তো ছোটোখাটো শহরই হবে। ওখানে নিশ্চয়ই উট ব্যবসায়ী পাওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি গেলে ভোরেই ওখানে সে পৌছে যাবে, তারপর উট বিক্রি করে শহরে ফিরে গিয়ে রিক্সা কিনবে। এখন গোলমালের সময় রিক্সার দাম নিশ্চয়ই কমেছে। রিক্সা কেনার কথাই সে ভাবল, তাই উট বিক্রি করা তার কাছে সোজা বলেই মনে হোলো।

আশায় সে উল্লসিত হয়ে উঠল, ক্লান্তি উবে গেল। কেউ যদি তিনটে উটের বদলে একশ 'মু' জমি কি তিনটে মুক্তোও তাকে দেয়, সে নেবে না, সে রিক্সা কিনবে। উঠেপড়ে চলতে লাগল, দড়ি বাঁধা উট তিনটি রইল পিছনে। উটের চলতি বাজার দর সে জানে না, কার কাছে যেন শুনেছিল, যখন রেল লাইন হয়নি তখন পঞ্চাশ ভরি রুপোয় এক একটা উট বিকোত। উট গাধা বা ঘোড়ার থেকে খায় কম, খাটতে পারে বেশি। তিনটে উট বিকিয়ে এখন আর দেড়শ ভরি রুপো পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু আশি কি একশ ডলার মিলবেই—আর রিক্সা কেনার পক্ষে তাইই তো যথেষ্ট।

আকাশ এবার ফরসা হয়ে এসেছে। আর ভুল হবে না—পুবদিকেই সে চলেছে। পথ ভুল হতে পারে, কিন্তু দিক ঠিকই আছে। পশ্চিমে পাহাড় আর পুবে আছে শহর। শহরের দিকেই সে চলেছে। ঘন কালো রাতের বুকে এবার আলো আঁধারি খেলা শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনো ঠিক চোখে মালুম হয় না। ধূসর কুয়াশার ভিতরে দূরের গাছপালা, চষা ক্ষেত ধীরে ধীরে রূপ পাচ্ছে। তারাগুলি নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ; আকাশ যেন আরও উঁচুতে উঠে গেছে ; পারার মতো একটা পাতলা আস্তরণ ভাসছে সেখানে। মেঘ কি কুয়াশা হবে। খুশি মুখ তুলে তাকাল, আর ভয় নেই। ভিজে ঘাসের গন্ধ এসে নাকে লাগছে। পাখীর অস্পষ্ট ডাক সে শুনতে পাচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলো তার সজাগ হয়ে উঠল।

নিজেকেও সে দেখতে পাচ্ছে; পোশাক ছিঁড়ে গেছে, মুখে ধুলোর ঘন অস্তর পড়েছে, কিন্তু এখনো সে বেঁচে আছে। দুঃস্বপ্ন দেখার পরে জেগে উঠে যেমন মনে হয় বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য, এ যেন তেমনি এক অনুভূতি। নিজের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে এবার উটগুলির দিকে তাকল। তার মতোই নোংরা, কিন্তু ওদের দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। এই ঋতুতে জীবজন্তুর গা থেকে লোম ঝরে পড়ে। উটগুলিরও লোম ঝরে পড়েছে, এখানে ওখানে দুএক থোকা শুধু ঝুলে আছে। গলার কাছটা কি বিশ্রী! লম্বা সরু গলায় একটাও লোম নেই—মনে হয় যেন রোগা কতগুলো ছাগল চলেছে।

কিন্তু খুশির ভালোই লাগল। যতই বিশ্রী দেখতে হোক না, বেঁচে তো আছে। তিন তিনটে জ্যান্ত উটের সে মালিক, তার চাইতে ভাগ্যবান কে আছে। রিক্সার বদলে দেবতারা তাকে উট দিয়েছেন। উট ফেল্‌না জিনিস নয়, সচরাচর মেলে নাকি? খুশিতে উছলে পড়ল।

ধূসর আকাশে লাল আভা দেখা দিয়েছে, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে গাছপালা। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে। ধূসর আর লাল রঙে মিশে কোথাও বা ফিকে লাল কোথাও বা বেগুনী রং ধরেছে; খানিক পরেই কমলা রং ফুটে উঠল। সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুব আকাশে কুয়াশার রং গাঢ় লাল, মাথার উপরে আকাশ ঘন নীল। হঠাৎ লাল কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ল পেঁজা তুলোর মত, তারই ফাটল দিয়ে সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ছে, মেঘে মেঘে সোনার জরি দিয়ে কে যেন বুনছে এক প্রকাণ্ড চাদর। ঘাস আর গাছপালার রং—নীলকান্তমণির মতোই উজ্জ্বল।

গাছের গুঁড়িগুলো প্রথম আলোয় ঝলমল করছে, উড়ন্ত পাখীর পাখায় লেগেছে সোনালী রং। চারিদিক যেন হাসছে। খুশির মনে হোলো সে কত দিন এমন সূর্যোদয় দেখেনি। এত দিন এক অভিশাপের ভিতর কেটেছে; সূর্য আর চাঁদের মুখ সে দেখেনি, দেখেনি উদার আকাশ। আজ অভিশাপ মোচন হয়েছে। সে মুক্ত; পথ চলেছে; উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পথরেখা। ঘাসের উপর শিশির টল্‌টল করছে, তার উপর পড়েছে রোদ—মুক্তোর মত জ্বলছে—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, নিজের দুঃখ ভুলে যেতে হয়। খুশি প্রাণ ভরে দেখে নিল। তার শরীরে ধুলোর পলাস্তারা পড়েছে, পোশাক জীর্ণ—কিন্তু সূর্যের আলো, তার উষ্ণতা তার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। সে উষ্ণতা, আলো পৃথিবীরই বাসিন্দে। এত সুখী সে, আনন্দে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করল।

নিজের ছেঁড়া পোশাক আর কদাকার উটগুলির দিকে তাকিয়ে সে হাসল। আশ্চর্য ব্যাপারই বটে! এই চারটে অদ্ভুত জীব কি করে বিপদ এড়িয়ে আবার

সূর্যের আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে! দেবতার দয়া ছাড়া কি আর তা সম্ভব হোতো!

পিকিঙ! পিকিঙ-এর জন্য সে পাগল হয়ে উঠল। তার মা বাপ নেই, আপন বলবার মতো কিছুই নেই। তবু পিকিঙ তার বাড়ি—গোটা শহরটাই তার বাড়ি। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে কিছু উপায় হবেই।

দূরে একটা গ্রাম। বেশ বড় গ্রাম বলেই মনে হয়। একসার উইলো গাছ সবুজ পোশাকপরা সৈনিকের মতোই যেন গ্রামখানিকে পাহারা দিচ্ছে। নিচু হয়ে খুশি তাকিয়ে দেখল বাড়িগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। গেঁয়ো কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ তার কাছে বড় মিষ্টি ঠেকল। ওখানে গেলে কি হবে না হবে, না ভেবেই সে গ্রামের দিকে রওনা হোলো।

কুকুরগুলো তার পিছনে তাড়া করে এল—সেদিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ রইল না, কিন্তু গ্রামের ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীলোকদের ভিড় জমতেই সে অস্বস্তি বোধ করল। তার মনে হোলো, উটচালক হিসেবে তাকে বুঝি একদম মানায়নি। তা না হলে হাঁ করে ওরা তাকিয়ে আছে কেন? না, অসহ্য হয়েই উঠেছে। সৈন্যেরা তাকে মানুষ বলে গণ্য করেনি, এরাও তাকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে—যেন অদ্ভুত কিছু দেখেছে। এক সময়ে তার স্বাস্থ্য আর শক্তি তার ভিতরে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তুলত, আজ আর বিন্দুমাত্র তা অবশিষ্ট নেই। খুশি চারদিকে তাকাল। বস্তিগুলোর মাথার উপর তেমনি উজ্জ্বল আকাশ দেখা যাচ্ছে; কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও যে জৌলুষ ছিল তা আর নেই। কেমন ম্লান হয়ে গেছে।

গ্রামের একটাই সদর রাস্তা; এখানে ওখানে খানা খন্দ; দুর্গন্ধ উঠছে। খুশির পথ চলতে চলতে ভয় হোলো, এই বুঝি উটগুলো পা হড়কে পড়ে গিয়ে বিপদ বাঁধায়। এখন তার বিশ্রাম দরকার। রাস্তার উত্তরে একখানা বড় বাড়ি দেখা গেল। মালিকের অবস্থা মোটামুটি ভালোই। বাড়ির পিছনটা টালি-ছাওয়া, দেউড়ি বলতে কিছুই নেই, নেই দরোয়ানের ঘর। খুশির মন আনন্দে নেচে উঠল; এ-বাড়ির মালিক উটব্যবসায়ী না হয়ে যায় না। ফটক থাকলে উট এ-বাড়িতে ঢুকতেই পেত না। বেশ, এইখানেই সে জিরিয়ে নেবে, হয়তো উটগুলিরও একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে।

জে, জে, জে—খুশি উটগুলিকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল। উটচালক যখন উটগুলিকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলে তখন এমনি শব্দই করে। খুশির খুব আনন্দই হোলো। ভাগ্যিস সে ডাকটা শিখে রেখেছিল। গাঁয়ের লোকেরাও তাকে আর আনাড়ি ভাবতে পারবে না। উটগুলো সত্যিই ডাক শুনে হাঁটু

গেড়ে বসে পড়ল। খুশিকে আর পায় কে! মহা আড়ম্বরে সে গিয়ে একটা উইলো গাছের গুঁড়ির উপর জাঁকিয়ে বসল। গাঁয়ের লোকেরা তখনো হাঁ করে তাকিয়ে আছে, সেও তাদের দিকে তাকাল। ওদের সন্দেহ দূর করবার তা ছাড়া আর উপায় কি!

কিছুক্ষণ কাটল, এমন সময় বাড়ির উঠোন থেকে একজন বুড়ো ফটকের বাইরে এলেন। মুখখানা তার ঝকঝক করছে, পরনের নীল কামিজের সুমুখের বোতাম খোলা। তাকে দেখেই মনে হয়, গ্রামের বেশ সম্ভ্রান্ত লোকই হবেন।

খুশি মনস্থির করে ফেলল। বুড়ো কর্তা এখানে জল পাওয়া যাবে? তেষ্টা পেয়েছে।

বুড়ো খোলা বুক ঘসে ময়লা তুলতে তুলতে খুশি আর উটগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। হাঁ, হাঁ, জল পাওয়া যাবে বই কি। কোত্থেকে আসছ তুমি?

পশ্চিম থেকে। জায়গার নাম খুশি বলতে সাহস করল না।

পশ্চিমে তো সৈন্যদের গোলমাল চলছে? বুড়োর চোখ তার পায়জামার উপর।

হাঁ, খুব গোলমাল। আমাকে তারা ধরেছিল, কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু পশ্চিমের পথ দিয়ে নির্বিঘ্নে উট নিয়ে এলে কি করে?

সৈন্যেরা সব পাহাড়ে চলে গেল কিনা, পথ এখন খুব ঠাণ্ডা।

হুঁ, বুড়ো ঘাড় নাড়ল। তুমি একটু বোসো, আমি জল নিয়ে আসছি।

খুশি বুড়োর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের উঠোনে ঢুকে দেখল, চারটে উট বাঁধা রয়েছে।

কত্তা, আমার উটগুলোও কিনে নিন না! একপাল উট হবে'খন।

তিরিশ বছর আগে, একপাল কেন, তিন তিনটে পাল উট আমি পুষেছিলাম। কিন্তু সময় বদলে গেছে। কজন লোক এখন উট পুষতে পারে?

বুড়ো উটগুলির দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর বললেন, কদিন আগে ওদের নিয়ে গিয়ে পশ্চিমে চরিয়ে আনব ভেবেছিলাম কিন্তু সৈন্যদের হাঙ্গামার কথা শুনে আর সাহস হোলো না। সারা গ্রীষ্ম যদি এমনি বাঁধা থাকে তাহলে ওদের দিকে আর তাকান যাবে না। গরম বেশি পড়লে মুস্কিলই হবে। তার উপর ডাঁশের জ্বালাতন। কি করব? চোখের সামনে ওদের কষ্ট হবে।

কত্তা, আপনি আমারগুলো কিনে নিয়ে এক কাজ করুন। পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে চরিয়ে আনুন। এমন জোয়ান উট যদি গ্রীষ্মে এখানে বাঁধা থাকে মশা

আর ডাঁশের কামড়েই ওদের দফা রফা হয়ে যাবে। খুশি কাকুতি মিনতি শুরু করল।

উট কেনার মত টাকাই বা কোথায়? উট পোষবার এ সময় নয়।

আপনি উটগুলো রেখে দিন কত্তা, দাম যা খুশি দেবেন। বিক্রি করে ঝাড়া হাত পা হয়ে আমি শহরে ফিরতে চাই। আবার তো রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে হবে।

বুড়ো খুশির মুখের দিকে তাকালেন। না—লোকটা চোর নয়। উটগুলির উপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। বেশ পছন্দসই বটে, কিন্তু কিনে লাভ কি?

বই কেনার বাতিক যার আছে, যে-বই দেখে কিনতে ইচ্ছে হয়, ঘোড়ার মালিক ঘোড়া দেখলে লোভ সামলাতে পারে না।

যার এক সময় তিন পাল উট ছিল তারো যে একই অবস্থা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি। তার উপরে ছোকরা বলছে, সস্তায় দেবে। বুড়ো আর লোভ সামলাতে পারলেন না, ভুলে গেলেন উট কিনে তার কোনো লাভই হবে না।

ওহে ছোকরা, টাকা হাতে থাকলে কিনতাম। বুড়ো সত্যি কথাই বলেন।

রেখে দিন। আমাকে যা খুশি দেবেন কত্তা। খুশির কথা শুনে বুড়ো লজ্জিতই হলেন। ফিরিয়ে দিতে কেমন যেন ঠেকছে।

সত্যি কথাই তোমাকে বলছি। তিরিশ বছর আগে এই তিনটে উট বেচলে দেড়শো লিয়াঙ রুপো পাওয়া যেত। আজ আর সে দিন নেই। গোলমাল আর লড়াই বেঁধে দাম একেবারে নেমে গেছে। তুমি বরং অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখ।

বলেছি তো, আপনার যা খুশি দেবেন। খুশি বুঝতে পারল, বুড়ো সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু উট নিয়ে সে যাবে কোথায়? তার উপর ধরা পড়বার সম্ভাবনাও আছে।

শোনো তোমাকে বিশ কি ত্রিশ ডলারের বেশি দেওয়ার আমার সাধ্য নেই—তাও অনেক কষ্ট করেই জোগাড় করে দিতে হবে।

খুশির বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বিশ কি ত্রিশ ডলার! রিক্সা কিনতে হলে অন্তত শখানেক ডলার তো চাইই। কিন্তু উপায় কি? তাড়াতাড়ি উটগুলি বিক্রি করতে হবে—তাছাড়া খদ্দেরই বা পাবে কোথায়?

কত্তা, যা হয় দিন।

তুমি কি কাজ কর? তোমার তো এ ব্যবসা নয়?

খুশি সত্যি কথাই বলল।

এঁ্যা, জন্তুগুলির জন্য নিজেই যে মরছিলে! বুড়ো খুশির কথা শুনে আশ্বস্ত

হলেন। চোরাই উট নয়, কিন্তু বড় বেশি তফাতও নেই। তবে যুদ্ধের সময় ওসব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তখন পুরনো আইন-কানুন সব রদ হয়ে যায়।

ওহে বাপু, আমি তোমাকে পঁয়ত্রিশ ডলার দিচ্ছি। দাঁও মারছি না একথা যদি বলি তো কুত্তা ছাড়া আমি কিছুই নই। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, আর এক ডলার বেশি দেওয়ার আমার ক্ষমতা নেই। ষাট বছর বয়েস হয়েছে, মিছে কথা বলব না।

খুশি ভেবে পেল না কি বলবে। এক সময়ে না খেয়ে সে টাকা জমিয়েছে। একটি পয়সা সে কম কখনো নেয়নি। কিন্তু বহুদিন পল্টনের সঙ্গে থেকে এমন মিষ্টিকথা শুনে সে গলে গেল, দর কষাকষি করতে মন চাইল না। দশ হাজার ডলারের স্বপ্ন দেখার চাইতে হাতের মুঠোয় পঁয়ত্রিশ ডলার পাওয়া ঢের ভালো। কিন্তু একটা কথা কাঁটার মতোই খচখচ করে বিঁধতে লাগল, মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলারের জন্য সে জীবন বিপন্ন করে উটগুলিকে টেনে নিয়ে এল! তা এখন যদি খদ্দের না মেলে! তিনটে জলজ্যান্ত উটের দাম তো আর পঁয়ত্রিশ ডলার নয়। উপায় নেই বলেই তো জলের দরে বেচতে হোলো।

বুড়ো কত্তা, উটগুলি আপনার হোলো। শুধু একটা জিনিস চাইব—আমাকে একটা কামিজ আর কিছু খেতে দেবেন।

আচ্ছা।

খুশি পুরো একঘটি জল চোঁ চোঁ করে খেয়ে পঁয়ত্রিশটি চকচকে ডলার আর দুখানা ময়দার রুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কর্তার দেওয়া পুরনো খাটো-ঝুল কামিজ তার পরনে। জোর কদমে সে চলল। তাড়াতাড়ি শহরে পৌছতে হবে।

চার

খুশি তিন দিন পিকিঙ-এর পশ্চিম অঞ্চলে একটা ছোট্ট হোটেলে বিছানায় অচেতন হয়ে পড়ে রইল। হোটেলটার নাম 'সমুদ্রের রাজ্য'। তার সবকিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে, মাড়িতে ফোস্কা পড়েছে। তিনদিন ধরে জল ছাড়া সে কিছু খেতে পারল না। তিনদিন উপোসের পর জ্বর ছাড়ল, শরীর তখনো দুর্বল—একতাল মণ্ডার মতোই! এই কদিন সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছে; তার মধ্যে উট তিনটের কথাই বেশি ছিল। তাই যখন তার জ্ঞান হোলো, তখন 'খুশি উট' নামকরণ তার হয়ে গেছে।

পিকিঙ-এ যখন সে প্রথম আসে তখন থেকে তার নামকরণ হয় 'খুশি'। এখন তার সঙ্গে 'উট' এই খেতাবটি যুক্ত হোলো। নামের জন্য সে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু অত বড় বড় তিনটে জন্তুকে জলের দরে বেচে এল! তার উপরে আবার কিনা 'উট' খেতাব মিলল—এমন ব্যবসা না করলেই তো ভালো ছিল!

একটু সুস্থ হতেই সে ভাবল, বাইরে গিয়ে একবার পৃথিবীর হালচাল দেখে আসবে। কিন্তু পা এতো দুর্বল হয়ে পড়েছে যে বিশ্বাস করা যায় না। হোটেলের দরজা পর্যন্ত গিয়েই সে চোখে আঁধার দেখল, মাথা ঘুরে গেল। ঝুপ করে সে বসে পড়ল। বোকার মতো ঠায় সে বসে রইল; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। আঁধার কেটে গেছে, মাথা ঘোরা কমে আসছে। খুশি চোখ মেলে তাকাল। পেটে শব্দ হচ্ছে, খিদে পেয়েছে তার। আস্তে আস্তে উঠে সে একটা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিছু গরম পিঠে কিনল। পিঠের ভাঁড়টা নিয়ে আবার মাটিতে সে বসে পড়ল। গরম পিঠের ঝোল মুখে যেতেই কেমন অস্বস্থ বোধ করল—অনেকক্ষণ মুখেই সে রাখল তারপর গিলে ফেলল। আর খেতে তার ইচ্ছে হোলো না—কিন্তু গরম ঝোল তাতানো সুতোর মতোই তার পাকস্থলীতে অস্থানে সেঁধিয়ে গেছে, মোচড় দিচ্ছে পেট। সে আবার যেন নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে।

আরো খানিকটা ঝোল খেয়ে সে সুস্থ হোলো। এবার নজর পড়ল নিজের চেহারার দিকে—শরীর হাড়-জিরজিরে হয়ে গেছে; ছেঁড়া পায়জামাটা আরো

নোংরা হয়ে গেছে। হাতে পায়েও জোর নেই, কিন্তু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। পিকিঙ-এর পথে এমন ভুতের মতো তো বেরুনো চলে না! কিন্তু 'সাফসুফ' হতে গেলে পয়সা খরচ হবে। মাথা পালিশ করে কামাতে হবে, পোশাক বদলাতে হবে, কিনতে হবে নতুন জুতো আর মোজা।—সেও তো এককাঁড়ি টাকার ব্যাপার! পকেটের পঁয়ত্রিশ ডলারের এক পয়সাও সে ছোঁবে না; কিন্তু না ছুঁলেই বা কি, ওই কটা টাকা দিয়ে তো আর রিক্সা কেনা চলবে না। নিজের জন্য তার দুঃখই হোলো। এক দুঃস্বপ্ন থেকে সে যেন জেগে উঠেছে,—সে বুড়িয়ে গেছে।

অবশেষে পুঁজিই ভাঙতে হোলো। দুডলার বিশ সেণ্ট খরচ হয়ে গেল। তুলোর একটা মোটা কোর্তা আর পায়জামার খরচ পড়ল এক ডলার, এক জোড়া কালো ক্যাম্বিসের জুতো আশী সেণ্ট; যেমন তেমন বুনোনো এক জোড়া মোজার দাম পঞ্চাশ সেণ্ট; একটা টুপি পঁচিশ সেণ্ট। পুরনো ছেড়া পায়জামার বদলে সে দুবাণ্ডিল দেশলাই পেল।

দেশলাইয়ের বাণ্ডিলগুলো বগলদাবা করে সে পশ্চিম দরজার দিকে চলল। কিছুদুর যেতে না যেতেই সে শ্রান্ত হয়ে পড়ল, পাও যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে; দাঁতে দাঁত চেপে সে রইল। রিক্সা ভাড়া করবার তার পয়সা নেই, আর তা সে চায়ও না। পিকিঙ-এ হেঁটে না পৌছতে পারলে তো সব পণ্ড হয়ে গেল। না, তা হবে না। খুশি নিজের সাহস আর শক্তির উপর এখনো আস্থা হারায়নি। যতই দুর্বল সে হোক না কেন, পিকিঙ-এ সে পৌছবেই।

হোঁচট খেতে খেতে সে চলতে লাগল। একসময়ে এসে পৌছল পশ্চিম দরজায়। তেমনি গাড়ি-ঘোড়া-মানুষের ভিড়, তেমনি হল্লা হুল্লোড়—কানে তালা লেগে যাচ্ছে, ধুলো এসে লাগছে নাকে—কেমন সোঁদা গন্ধ! খুশির মনে-হোলো, রাস্তায় নেমে সে একবার মাটিতে চুমু খায়। এই তো তার নিজের মাটি—যাকে সে ভালোবাসে—যে তাকে ভাত জোগায়! তার বাবা মা নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, একমাত্র বন্ধু তার এই পুরনো শহর। সে তাকে সবকিছু দিয়েছে। আজ যদি তাকে এই পুরনো শহরের পথে পথে উপোস করে ঘুরে বেড়াতে হয়, তবুও সে তাকে নিজের গ্রামের চাইতে ভালোই বাসবে। এখানে দেখা শোনা, জানা চেনার বহু জিনিস আছে; আছে রং আর শব্দের সমারোহ। তোমার যদি বিকোবার মতো শক্তি থাকে, এখানে এলে টাকা তুমি রোজগার করবেই। হাজারো ভালো জিনিস রয়েছে এখানে, ভালো ভালো খাবার, ভালো পোশাক—কি চাই তোমার? এমন কি ভিক্ষে করলেও মাংসের ঝোল এখানে মিলবে, দুএক কুচি মাংসও মিলতে পারে, অথচ গ্রামে চালের পিঠেই হচ্ছে সবচেয়ে সেরা খাবার।

উজ্জ্বলতা ব্রিজের কাছে এসে সে নদীর ধারে বসে কাঁদল। সূর্যের বাঁকা রশ্মি এসে পড়েছে। মানুষ আর গাড়ির সার চলেছে ব্রিজের উপর দিয়ে। সন্ধ্যা আসন্ন, তাই সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু খুশির কোনো তাড়াহুড়ো নেই। চিরপরিচিত পরিবেশ, এ যেন তারই এক অঙ্গ! এখানে মরতে পেলেও সে সুখী।

অনেকক্ষণ সে চুপকরে বসে রইল, তারপরে ব্রিজের মুখের একটা দোকান থেকে একভাড় বীনের টক ঝোল কিনল। ভিনিগার, সয়াবীন, গোলমরিচ সব মিলিয়ে খোসবু বেরিয়েছে চমৎকার! খুশির হাত কাঁপছে, গন্ধে নিশ্বাস যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এক চুমুক সে খেল, গরম খাবার পথ করে নিয়ে পাকস্থলীর দিকে চলেছে। ভাঁড় শেষ হয়ে গেল; ঘাম বেরুচ্ছে, চোখ আরামে বুজে আসছে। আর এক ভাঁড় টক ঝোল সে কিনল।

খাওয়া শেষ করে দাঁড়াতেই তার মনে হোলো, পুরনো শক্তি সে ফিরে পেয়েছে। আবার সে নতুন মানুষ। পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়েছে, ডুবে যাচ্ছে; নদীর জলে লাল রং। তার মুখের দাগটা সে হাত দিয়ে ঘসল; কোমরবন্ধে টাকা আছে ভাবনা কি! একবার চারদিকে তাকাল। সন্ধ্যার আলোয় ঝলমল করছে শহর; নিজের দুঃখ সে ভুলে গেল, ভুলে গেল অসুস্থতা। তার নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত শহরে ফিরে এসেছে, পিকিঙ-এ ফিরে এসেছে।

ফটকে মানুষ আর গাড়িঘোড়ার ভিড়। সবাই তাড়াতাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত। চিৎকার, চাবুকের শাঁই শাঁই শব্দ, গালিগালাজ—সব কিছু মিশে এক অদ্ভুত শব্দ যেন বিরাট অ্যামপ্লিফায়ার থেকে ঝরে পড়ছে। খুশি ভিড় ঠেলে পথ করে চলল, একটা খুদে মাছ যেন ঢেউ থেকে ঢেউ-এ লাফিয়ে চলেছে। অবশেষে সে শহরের ভিতরে এসে পৌঁছল! তার সুমুখে নিউ স্ট্রীটের মোড়। সোজা চলে গেছে চওড়া রাস্তা—দুধারে লাল টালি-ছাওয়া বাঙলোর সার। খুশি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। চোখ দুটিও গোধূলীর রাঙা আলোয় জ্বলা লাল টালির মতোই জ্বলছে। মাথা নিচু করে সে ভাবতে লাগল!

বিছানাপত্র এখনো মানবমিলন রিক্সার আড্ডায় পড়ে আছে—সেখানে যাওয়াই দরকার। ওয়েস্ট গেট রোড দিয়ে সে এগিয়ে চলল। তার বৌ নেই, তাই সে রিক্সার আড্ডায়ই রাত কাটাত। রিক্সা আড্ডা থেকে রিক্সা ভাড়া না নিলেও মালিক তাকে থাকতে দিয়েছিল। রিক্সার আড্ডার মালিক ন'কর্তা লিউর বয়েস প্রায় বছর সত্তর তো হবেই। একেবারে থুত্থুরো বুড়ো, কিন্তু বুড়ো হাড়ে ভেল্কি খেলে। অল্পবয়েসে সরকারি সেপাই থেকে শুরু করে জুয়ার আড্ডার মালিক, মেয়েমানুষের ব্যাপারী, তেজারতি সবই করেছে। ন'কর্তা লিউর এসব কাজ করবার

মতো বুদ্ধি আর তাগদেরও অভাব ছিল না। চিঙ্ বংশের পতনের আগে যে বিদ্রোহ হয় তাতে সে ভিড়ে গিয়েছিল। ভালো বংশের কতো মেয়ে চুরি করে যে তখন বিক্রি করেছে—তার কি ঠিক আছে! একবার আসামীর কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু একটুও ভয় সে পায়নি, হাকিমের দয়া ভিক্ষা করেনি। হাকিম তার দৃঢ়তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন; সে বেকসুর খালাস পেল। এই থেকেই ন'কর্তার নামডাক।

জেল থেকে বেরিয়ে ক্রমে সে দেখল, সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, পুলিসের ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ছে। সে বুঝতে পারল আগের দিনের বীরদের আর ঠাঁই হবে না, তাই সে বীরত্বের পথ ছেড়ে রিক্সার আড্ডা খুলে বসল। সে গরীবদের সঙ্গে কখন কেমন ব্যবহার করতে হয় জানত; কখনো বা কড়া হতে হয়, কখনো বা করতে হয় সাহায্য। লোক খাটাবার কল কৌশল তার জানা ছিল। রিক্সাওয়ালারা তো তার সঙ্গে মুখ ফুটে কথাই বলতে পারত না; সে একবার তাদের দিকে তাকালেই তারা ভয়ে কুঁকড়ে যেত, বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। তাদের মনে হোতো, ন'কর্তা এক কাঁচাখেকো দেবতা, এক পা তার স্বর্গে আর এক পা নরকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—তার হুকুম কি অমান্য করবার জো আছে!

এখন সে ষাটখানা রিক্সার মালিক। ভাঙা রিক্সা তার আড্ডায় একখানাও নেই। একেবারে পুরনোখানাও নতুনের মতো ঝকঝকে আর মজবুত। ভাঙা রিক্সা গাদা করে রাখার অভ্যেস তার নেই, তখন তখনই মেরামত করতে পাঠিয়ে দেয়। একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেলে লোহার দরে বেচে ফেলে। অন্য রিক্সার অড্ডার তুলনায় ভাড়াও তাই তার বেশ চড়া, কিন্তু বছরে তিনটে পর্বে সে রিক্সাওয়ালাদের কাছ থেকে এক পয়সা ভাড়া নেয় না—এইখানে অন্য রিক্সার আড্ডার মালিকের সঙ্গে তার তফাৎ। আড্ডায় থাকবার বন্দোবস্তও আছে—অবিবাহিত রিক্সাওয়ালারা বিনে ভাড়ায় সেখানে থাকতে পায়। কিন্তু রিক্সা ভাড়া ঠিক ঠিক মিটিয়ে দিতে না পারলে সে রেগে যায়। বিছানাপত্র বাজেয়াপ্ত করে তাকে চায়ের ভাঙ্গা বাসনের মতোই বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু খুব বিপদে পড়লে কি অসুখ হলে, তখন ন'কর্তাকে শুধু খবর দিলেই হোলো, তারপর যা করবার করবে। নিজের ক্ষতিবৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে দেখবে না। হাঁ, এমনি লোক ন'কর্তা!

ন'কর্তার চেহারাখানা ঠিক বাঘের মতো। বয়েস প্রায় সত্তর হোলো, অথচ কোমর একটুও নুয়ে পড়েনি, এখনো দশ-বিশ লি তিনি হাঁটতে পারেন। চোখ দুটো ভাঁটার মতো গোল, পুরু ঠোঁট, দাঁতগুলো বড়বড়—দেখেই মনে হয় দাঁত বার করে বাঘের মতো এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। খুশির মতোই তিনি লম্বা-চওড়া, মাথা পালিশ করে কামানো, মুখে দাড়ি গোঁপ নেই। তিনি বাঘ খেতাব পেয়ে বেশ খুশি

হয়েছেন বলেই মনে হয়, কিন্তু জীবনে একটি তার দুঃখ—ছেলে নেই। মেয়ে একটি আছে, তার বয়েস বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। যারা ন'কর্তা লিউকে চেনে, তারা তার মেয়ে বাঘিনীকেও চেনে বইকি। হাঁ, বাঘিনীই বটে! মুখ দেখে তো ভয়ই পেতে হয়। বাপের ব্যবসা দেখাশুনো সে-ই করে, হিসেব রাখে—এখনো তার বিয়ে হয়নি। বিয়ে কে করবে? একেবারে পুরুষের মতো কাটখোট্টা মেয়ে, গালাগাল দিতে বুঝি পুরুষের চেয়েও ওস্তাদ।

ন'কর্তা লিউ বাইরের ব্যাপারগুলো দেখেন, বাড়ির ব্যাপারে বাঘিনীই কর্ত্রী। মানবমিলন আড্ডা বেশ ভালোই চলে। নামডাকও আছে। রিক্সার মালিক আর রিক্সাওয়ালারা রিক্সা সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলেই ন'কর্তা আর তার মেয়ের দোহাই পাড়ে—এ যেন পণ্ডিতরা প্রমাণের জন্য শাস্ত্রের নজির খাড়া করছেন।

নিজের রিক্সা কেনার আগে খুশি মানবমিলন রিক্সার আড্ডা থেকেই রিক্সা ভাড়া নিয়ে টানত, টাকাকড়ি যা সে রোজগার করত, ন'কর্তার কাছেই জমা রাখত। যখন সে রিক্সা কেনার মতো টাকা জমাল, একদিন সে গচ্ছিত টাকা চেয়ে নিয়ে রিক্সা কিনে আনল।

ন'কর্তা, দেখুন কেমন রিক্সা কিনেছি!

ন'কর্তা মাথা নেড়ে বললেন, বেশ ভালো হয়েছে।

কিন্তু আপনার এখানেই আমাকে থাকতে দিতে হবে। মাস মাইনের কাজ পেলে তখন চলে যাব।

বেশ তো, ন'কর্তা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

তখন থেকে মাসমাইনেয় কাজ পেলে খুশি মানবমিলন রিক্সার আড্ডা ছেড়ে চলে যেত, আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে এসেই থাকত।

অন্য রিক্সাওয়ালাদের কাছে এ এক বিচিত্র ব্যাপারই বটে। মানবমিলন থেকে রিক্সা ভাড়া না নিয়েও এখানে থাকা যায়—একথা তারা ভাবতেই পারত না। তাই কেউ কেউ অনুমান করত, খুশি বুড়ো লিউ-এর জ্ঞাতি হবে; কেউ কেউ বা রং চড়িয়ে বলত, বুড়ো মেয়ের জন্য ঘরজামাই পাকড়েছে। এই অনুমানের মধ্যে ঈর্ষার আমেজ থাকলেও তারা জানত, যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে খুশিই হবে মানবমিলনের মালিক। তাই খুশির সুমুখে এসব কথা বলত না।

ব্যাপারটা কিন্তু তেমন কিছু নয়। বুড়ো লিউ খুশিকে খাতির করতেন বটে, কিন্তু সে হবু-জামাই হিসেবে নয়। খুশি তেমন একজন লোক—যে নতুন পরিবেশেও তার পুরনো অভ্যেস বজায় রাখবে। সে যদি সৈন্যদলে যায়, সেখানে গিয়ে উর্দির জৌলুষ দেখিয়ে লোক ঠকাবার চেষ্টা সে কখনো করবে না। রিক্সার আড্ডায় সে কখনো চুপ করে বসে থাকে না। ভাড়া খেটে ফিরে এসে গায়ের ঘাম সে মজতে দেয়,

তারপর লেগে যায় কাজে। রিক্সাখানা ঘসেমেজে পরিষ্কার করে, টায়ারে হাওয়া দেয়, বৃষ্টি বাঁচাবার ক্যাম্বিসের ঢাকনাখানা খুলে নিয়ে রোদে দেয়—এসব কাজ নিজেই করে, কাউকে বলতে হয় না, রিক্সার আড্ডায় অন্তত জন বিশেক লোক থাকে, কিন্তু তারা কেউ ওসব দিকে নজরই দেয় না। ভাড়া খেটে এসে বসে গল্প করে, কেউবা ঘুমোয়। শুধু খুশিই চুপ করে বসে থাকে না।

প্রথমে ওরা ভারত, খুশি বুঝি ন'কর্তাকে কাজ দেখিয়ে খুশি করবার চেষ্টা করছে। নইলে কুত্তার মতো অমন ছুটোছুটি করে ফাইফরমায়েস খাটছে কেন? কিন্তু কয়েক দিন যেতেই ওরা বুঝতে পারল, ব্যাপারটা তা নয়। খুশি কুড়ে হয়ে বসে থাকতে পারে না, ওইটাই ওর স্বভাব।

বুড়ো লিউ কখনো মুখে তাকে প্রশংসাও করেননি, কখনো একবার তার দিকে তাকিয়েও দেখেননি। কিন্তু মনে মনে তিনি জানতেন, খুশি খুব পরিশ্রমী। তাই রিক্সা ভাড়া না নিলেও সে মানবমিলনে জায়গা পেয়েছিল। বহু কাজ তিনি তাকে দিয়ে পেয়েছেন, এমন কি উঠোনও সে ঝাঁট দিত।

বাঘিনীরও তাকে খুব পছন্দ, বোধহয় বাপের চাইতে একটু বেশিই, খুশি খুব মন দিয়ে সব কথা শোনে, কখনো মুখে মুখে উত্তর দেয় না, অন্য রিক্সাওয়ালাদের মেজাজ দুঃখকষ্ট সয়ে সয়ে তিরিক্ষে হয়ে গেছে, তারা পাল্টা জবাব দিতে ছাড়ে না। বাঘিনী অবিশ্যি তাদের থোড়াই কেয়ার করে, কিন্তু তাদের সে মোটেও পছন্দ করে না। তাই যা কিছু বলবার খুশিকেই ডেকে বলে, যখনই সে অন্য কোথাও মাসমাইনেয় যেত, লিউ আর বাঘিনীর মনে হোতো, একজন মস্ত বন্ধু হারাল। ফিরে এলে তারা খুশিই হোতো।

দুবাক্স দেশলাই বগলদাবা করে সে মানবমিলন রিক্সার আড্ডায় ঢুকে পড়ল। সবে সন্ধ্যে হয়েছে, লিউরা খেতে বসেছে। বাঘিনী তাকে দেখে ভাত খাওয়ার কাঠিটা নামিয়ে রাখল।

খুশি, তোমাকে কি নেকড়ে বাঘে টেনে নিয়ে গিছল, না আফ্রিকার সোনার খনিতে মজুরি করতে গিছলে?

খুশি চুপ করে রইল।

ন'কর্তা লিউ একবার চোখ তুলে তাকালেন।

খুশি বেঞ্চির একধারে বসল।

যদি এখনও না খেয়ে থাক, আমাদের সঙ্গে বসে যাও। বাঘিনী যেন ঘনিষ্ট বন্ধুকে অভ্যর্থনা করছে, এমনিভাবেই বলল। খুশি তবু নিরুত্তর। এত অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়ে সে যেন কেমন হয়ে গেছে, কথা হারিয়ে ফেলেছে।

বহুদিন থেকেই মানবমিলন রিক্সার আড্ডায় সে আছে। যখন সে মাস মাইনেয় কাজ করেছে, বার বার মনিব বদলেছে; ভাড়া খাটবার সময় প্রতি মিনিটে নূতন সোয়ারি সে নিয়েছে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তার গড়ে ওঠেনি। একমাত্র বুড়ো লিউ আর বাঘিনীর সঙ্গেই তার যা কথাবার্তা হয়েছে। আজ সে সব কিছু হারিয়ে প্রাণ নিয়ে তাদের কাছেই ফিরে এসেছে, তারা তাকে দূরে সরিয়ে তো রাখলই না, বরং খেতেও বলছে। তার একবার মনে হোলো তারা বুঝি তাকে ঠকাতে চায়, পরমুহূর্তেই টস-টস করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

তুভাঁড় বীনের টক ঝোল এইমাত্র খেয়ে এসেছি।

ন'কর্তা তার মুখের দিকে এখনো তাকিয়ে আছেন, তার গোল চোখ দুটির স্পর্শ সে অনুভব করছে। কোথায় ছিলে এতদিন? রিক্সা কি হোলো।

রিক্সা? খুশি মেঝেয় থুথু ফেলল।

বসে চাট্টি ভাত খাও, ভয় নেই, বিষ তো নয়। তুভাঁড় বীনের ঝোল এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে। বাঘিনী তাকে টেনে নিয়ে টেবিলে বসিয়ে দিল। বড় ভাজ যেন দেওরকে সাধ্য সাধনা করে খাওয়াতে বসাচ্ছে।

খুশি ভাত খাবার আগে টাকা বার করে বলল, ন'কর্তা, আমার এই টাকা কটা রেখে দিন—তিরিশ ডলার আছে। খুচরো সে পকেটে পুরল।

ন'কর্তা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলে?

খুশি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়বার কাহিনী বলল।

ন'কর্তা শুনে মন্তব্য করলেন, তুমি একেবারে বোকা। উটগুলো শহরে নিয়ে এলেই হোতো, কসাইখানায় বিক্রি করলেও মাথা পিছু দশ ডলারের বেশি পাওয়া যেত, শীতকাল হলে এক লোমের দামই পাওয়া যেত অনেক।

খুশি বিক্রি করার সময়ই জানত সে ঠকেছে, এখন ন'কর্তার কথা শুনে মন আরো খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কসাইখানায় সে তাদের বেচতে যেত না। উটগুলি ছিল তার সঙ্গী, তাদেরও তারই মতো বাঁচবার অধিকার আছে। যাক বুড়োকে বেচে দিয়ে ঠিক হয়েছে, সে খুশি হয়ে উঠল।

বাঘিনী এবার টেবিলের উপর থেকে থালা বাসন সরিয়ে নিল। ন'কর্তা চুপ করে বসে রইলেন, কি যেন তিনি ভাবছেন মনে হোলো। কিছুক্ষণ পরে হেসে বললেন, বোকা ছোকরা হোটেলে উঠেছিলে কেন, সোজা হলুদগ্রামের রাস্তা ধরে সটান এখানে চলে এলে পারতে।

আমি পশ্চিম পাহাড়ের পথ ধরে ঘুরে এসেছি। সোজা রাস্তায় ধরা পড়বার ভয় ছিল। গাঁয়ের লোকেরা যদি পালানো সৈন্য বলে ধরত, তাহলে তো গিয়েছিলাম!

ন'কর্তা হাসলেন। এতক্ষণ তার মনে ভয় ছিল, খুশি হয় তো টাকা কটা চুরি করে নিয়ে এসেছে। তিনি আর যাই হোক চোরের থলেদার হতে রাজি নন। যৌবনে তিনি বহু বেআইনী কাজ করেছেন, এখন তিনি সে সব শুধরে নিয়েছেন, সুতরাং সাবধান হতে হয় বইকি। খুশির গল্পে এই একটা ফাঁকই ছিল, এখন সে বুঝিয়ে বলায় তার আর সে আশঙ্কা রইল না।

কি করবে টাকা দিয়ে? কিছু ঠিক করেছ?

না! আপনি যা বলেন।

আর একখানা রিক্সা কিনতে চাও? তার বড় বড় দাঁতগুলো ঝক-ঝক্ করে উঠল, তারা যেন বলতে চাইছে: বেটা নিজে রিক্সা কিনবে, অথচ বিনে ভাড়ায় এখানে থাকবেও।

এ'কটা টাকায় তো আর হবে না। একখানা নতুন রিক্সাই আমি কিনতে চাই। খুশি ন'কর্তার দাঁত দেখতে পেল না, সে দেখল তার হৃদয়ের মহত্ত্ব।

আমি ধার দেব—শতকরা একটাকা সুদে। অন্যের কাছে আমি দুটাকা নিয়ে থাকি।

খুশি মাথা নাড়ল।

কিস্তিবন্দিতে কিনলেও তার চাইতে সুবিধে হবে না।

না। আমি কিস্তিবন্দিতেও কিনতে রাজি নই, খুশি বলল। আস্তে আস্তে টাকা জমিয়ে যখন কেনার মতো টাকা হবে তখন নগদ দাম দিয়েই কিনব।

বুড়ো অবাক হয়ে খুশির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তিনি যেন অদ্ভুত কতগুলি ছবির মতো প্রতীক চিহ্ন দেখছেন; তার অর্থ বোঝা যায় না বটে, কিন্তু রেগে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ারও উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পরে টাকাটা তুলে নিলেন। তিরিশ ডলার—কিছু মনে কোরো না!

না কর্তা, খুশি বলল, এবার শুতে যাব। আপনাকে এক বাণ্ডিল দেশলাই দিয়ে যাই—এই বলে সে টেবিলের উপর এক বাণ্ডিল দেশলাই রাখল। কিন্তু ন'কর্তা, কাউকে উটের কথা জানাবেন না।

পাঁচ

ন'কর্তা লিউর কাছ থেকে নয়, উটের গল্প সমুদ্রের রাজত্ব হোটেল থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। শহরে এসেও পৌছল খবর। আগে কেউ খুশির কোনো খুঁত ধরতে পারেনি, শুধু তারা মনে করত ছোকরার অতিরিক্ত লজ্জা, কারো সঙ্গে মাথামাথি করা ওর ধাতে পোষায় না। এখন তারাই তার সম্বন্ধে মত বদলাল। খুশির কোনো পরিবর্তন হয়নি—সে আগের মতোই আছে। কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও নেই, নিজের কাজ করে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলল, খুশি একটা সোনার ঘড়ি কুড়িয়ে পেয়েছে, কেউ বা বাধা দিল—না, ঘড়ি নয়, তিনশ ডলার; সব চাইতে পাকা খবর জানে বলে যাদের বিশ্বাস তারা ঘাড় নাড়ল, না ঘড়িও নয়, তিনশ ডলারও নয়, পশ্চিমের পাহাড় থেকে তিরিশটা উট নিয়ে সে ফিরেছে।

নানা গল্প সৃষ্টি হোলো বটে, কিন্তু সবই একসুরে বাঁধা: খুশি হঠাৎ বহু-টাকার মালিক হয়েছে। একটা লোক যতই অদ্ভুত ধরনের হোক না কেন—হঠাৎ সে টাকার মালিক হয়েছে শুনলে সবাই তাকে খাতির করে, সম্মান দেখায়। কারণ, নিজের গায়ের রক্ত জল করে টাকা জমান খুবই শক্ত, তাই হঠাৎ কিছু টাকা পাবার স্বপ্ন সবাই দেখে। অবিশ্যি, সে ভাগ্য হাজার বছরেও একবার আসবে কিনা সন্দেহ—কিন্তু স্বপ্ন দেখে খানিকটা খুশি হয়ে উঠতে তো আর আপত্তি নেই। যদি কখনো কোনো লোকের ভাগ্যে এমনি টাকা পাবার সৌভাগ্য হয়, তাকে তারা তাদের নিজেদের থেকে আলাদা করেই দেখে, দেখবে না, অমন ভাগ্যবান সে! খুশির কম কথা বলা, তার অদ্ভুত ব্যবহার তাদের চোখে অন্য অর্থ নিয়ে এবার দেখা দিল। তারা ভাবল, বড়-লোকরা অমনিই হয়। এখন থেকে ওদেরই তো তার কাছে যেতে হবে, সে তো আর আসবে না, আর তাই তো উচিত।

খুশি, কেমন করে অত টাকা পেলে ভাই? প্রতিদিনই সে এমনি প্রশ্ন পথে যেতে যেতে শুনল। প্রথমে সে চুপ করে থাকত, কিন্তু কাঁহাতক পারা যায়! সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। সে রেগে গেল, তার গালের ক্ষত দাগটা দগদগে লাল হয়ে উঠে, সে চিৎকার করে বলে, টাকা পেয়েছি! মর বেজন্মিত বেটা! রিক্সাখানা কোথায় গেল?

হাঁ, সত্যি কথা। রিক্সাখানা কোথায়? সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু পরের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে উদ্বিগ্ন হওয়ার চেয়ে ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করা ঢের ভালো। তারা এবার রিক্সার কথা ভুলে গিয়ে তার ভাগ্যের কথাই বলতে শুরু করল। কদিন কাটল, খুশি তখনো রিক্সা টানছে। সে ব্যবসা ছেড়ে দিল না, একটা বাড়ি কিম্বা একখণ্ড জমি কিনল না। লোকের উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কালেভদ্রে তার নাম উঠলে এখন আর কেউ জিজ্ঞেস করে না কেন তার নাম উট হোলো। নামটা কিন্তু তাই বলে গেল না, কায়েমি হয়ে রইল।

খুশি কিন্তু আগে সহজে ব্যাপারটা ভুলতে পারেনি। আর একখানা নতুন রিক্সা কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অশ্রান্ত খাটুনির মধ্যে শুধু একটা কথাই তার মনে হয়, নতুন রিক্সা সে কিনবে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে ভয় পাইয়ে দেয়, যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সত্যি, কি হবে উন্নতির চেষ্টা করে? হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছো, উন্নতি করতে চাইছো বলেই কি পৃথিবী তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে? যদি তাইই হোতো, তাহলে তার রিক্সাখানা অমনি করে কেড়ে নেওয়া হোলো কেন? সেখানা গেছে যাক, সে না হয় আর একখানা কেনার মতো টাকা জমাল, কিন্তু এখানার যে আগের খানার মতো দশা হবে না তাই বা কে বলতে পারে?

তার মনে হোলো অতীত যেন একটা দুঃস্বপ্ন, সে তার ভবিষ্যতের আশা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। আগে সে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে পারত না, এখন কিন্তু কাউকে মদ খেতে বা বেশ্যাবাড়ি যেতে দেখলে সে একরকম প্রশংসা করেই ফেলে। উন্নতির চেষ্টা যখন বৃথা, এগিয়ে যাওয়ার পথে ছড়িয়ে আছে কত বাধাবিপত্তি, তখন জীবনকে উপভোগ করে নিতে দোষ কি? হাঁ, ওরা ঠিকই করছে। বেশ্যাবাড়ি সে না যাক, মাঝে মাঝে দুএক পাত্র মদ তো টানতে পারে, তাতে মনের ভার হাল্কাই হবে। মদ আর সিগারেটের উপর তার ঝোঁক পড়ল। এমন কিছু পয়সা খরচাও নয়, কিন্তু বেশ একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, মনে হয় জীবনের জটিল রাস্তায় চলতে হলে একটু আধটু না খেলে চলে না, তা ছাড়া অতীতের বেদনা ভুলিয়ে দিতেও এর জুড়ি নেই।

কিন্তু তবু সে মদ আর সিগারেট ধরতে সাহস করল না। একটা ফালতু পয়সা হাতে এলে জমাবে না মদে আর সিগারেটে উড়িয়ে দেবে? জমানই তো উচিত; তা না হলে আর একখানা নতুন রিক্সা কেনা জীবনেই ঘটে উঠবে না। যদিও আজ কিনলে, কাল সেখানা হারানোর ভয়ও আছে, কিন্তু তবুও কিনতে তো হবেই। এই তো তার একমাত্র ইচ্ছা, একমাত্র আশা, এমন কি তার ধর্মই বলতে পারা যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, সে যদি তার নিজের রিক্সার মালিক না হতে পারে, তাহলে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। হোমরাচোমড়া

রাজকর্মচারী, মস্ত বড় ধনী বা সম্পত্তির মালিক সে হতে চায় না, সে রিক্সা টানতেই চায় আর সে রিক্সা হবে নিজের ; যদি তা সে নাই পারল তা হলে মুখ দেখানোই তো দায় হয়ে উঠবে। সারাদিন এই কথাই সে ভাবত, নিজের পুঁজি নাড়াচাড়া করে কাটাতো, তার মনে হোতো, একদিন যদি সে এইকথা ভুলে যায় তাহলে সে আর মানুষ থাকবে না, জন্তুর সামিল হয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করে বেড়াবে। যার কোনো আশা নেই সে কি আর মানুষ।

রিক্সা যতই ভালো হোক, ভাড়া করা তো বটেই,—চালিয়ে সে সুখ পেল না। রিক্সা তো নয়, পিঠে যেন একখানা ভারি পাথর বয়ে নিয়ে চলেছে—এই কথাই তার মনে হোতো কিন্তু তাই বলে হেলাফেলা করবার লোকও সে নয়; রিক্সা মেজে ঘসে ঝকঝকে তকতকে করে রাখত, অসাবধান হয়ে পথে কোনো কিছুর ধাক্কাও সে লাগায়নি। কিন্তু সাবধান হওয়া এক কথা, আর ফুর্তি করা আর এক কথা। ভাড়া করা রিক্সা টেনে মনে কি আর ফুর্তি আসে ?

হাঁ, তোমার নিজের রিক্সা মেজে ঘসে পরিষ্কার করা, গেঁজে খুলে কড়কড়ে রুপোর চাকতিগুলো গোনারই সামিল ; এতে সত্যিকারের ফুর্তিও আছে। কিন্তু ভাড়া করা রিক্সায় কি আর সে ফুর্তি পাওয়া যায় ? সব সময়ই মনে হয়, এতো আর নিজের নয়। একটা পয়সা খরচ করবারও যো নেই। তাহলে রিক্সা কেনার আশা পিছিয়ে যাবে যে। খুশি মদে বা সিগারেটে পয়সা তো খরচ করলই না, এমন কি ভালো চাও সে খেল না। অথচ তার ভাই বেরাদাররা, জোর কদমে ছোটার পর চাখানায় গিয়ে দশ পয়সা দামের এক পাত্র চা খেত। চায়ের সঙ্গে থাকত দুটো বড় বড় সাদা চিনির ঢেলা, আর কি তার খোসবু, গরম কাটানো আর দম ফিরে পাবার এমন দাওয়াই আর নেই। খুশিও জোর কদমেই ছোটে, ঘাম তার কান বেয়ে টস-টস করে ঝরে পড়ত, বুকে হাঁফ ধরত, তারও ইচ্ছে হোতো ওদের মত চাখানায় ঢুকে একপাত্র চা খায়। না, অভ্যেস নয়, চায়ের তখন রীতিমত দরকার, দুএকপাত্র চা খেলে দম নিতে সুবিধেই হয়। কিন্তু পয়সা খরচের ভয়ে সে চাখানায় ঢুকত না। এক পয়সা দামের বিস্বাদ চা খেয়ে সে তেষ্টা মেটাত।

মাঝে মাঝে নিজেকে গালিগালাজ করতেই তার ইচ্ছে হয়। কেন নিজেকে এমনভাবে সে বঞ্চিত করছে ? কিন্তু রিক্সাওয়ালাকে টাকা জমাতে হলে, এছাড়া উপায়ই বা কি ?' সে মনে মনে ঠিক করল, প্রথমে রিক্সা কিনতে হবে, তার পরে অন্য কথা। নিজের রিক্সা হলেই সব মেহনৎ পুষিয়ে যাবে।

খুশি টাকা রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে লাগল। যখন তার মাস মাইনের কাজ না থাকত, তখন সে খুব খাটতে লাগল। সেই ভোরে রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে

পড়ত, ফিরত অনেক রাতে। সে ঠিক করেছিল, এত টাকা রোজগার না হলে আস্তানায় ফিরবে না। এই জন্য মাঝে মাঝে সারা দিনরাতও তাকে রিক্সা টানতে হোতো।

আগে অন্যের কাছ থেকে সোয়ারি ভাঙিয়ে সে কখনো নেয়নি, বুড়ো মানুষ কি বাচ্চা ছোকরা দেখলে তার মায়া হোতো। তার এমন লম্বা চওড়া চেহারা, এমন ঝকঝকে রিক্সা সে ইচ্ছে করলেই তো ওদের কাছ থেকে সোয়ারি ভাঙিয়ে নিতে পারে—এইকথাই বার বার তার মনে হোতো। এখন কিন্তু সে দিকে নজরই নেই। 'টাকা তার চাই। একটা পয়সারও যথেষ্ট দাম আছে—কাকে সে বঞ্চিত করেছে না করেছে সে কথা ভাবতে গেলে তার চলবে না। সোয়ারি তার চাই; অন্য কিছু সে ভাবে না—সে যেন ক্ষুধার্ত এক পশু। সোয়ারি পেয়ে সে যখন দৌড়ায়, তার মনের ভারী পাথরটা সরে যায়, হালকা হয়ে আসে তার বুক, রিক্সা কেনার আশা তাকে যোগায় শক্তি।

দেখতে দেখতে তার আগের সুনাম নষ্ট হয়ে গেল। যখনই সে অন্যের সোয়ারি ভাঙিয়ে নিয়ে যেত, তারা গালাগাল করত, খুশি উত্তর দিত না, মাথা নিচু করে ছুটে চলে যেত। মনে মনে ভাবত: রিক্সা না কিনতে হলে আমি কি এমন হতে পারতাম। ইস্ একটু লজ্জা হোলো না। এই বলে সে যেন তার সাঙাতদের কাছে ক্ষমা চাইত, কিন্তু মুখ ফুটে কোনো দিন তাদের সে একথা বলতে পারত না।

তার মনে পড়ল, পাহাড় থেকে সে যখন ফিরে এসেছিল তারা তাকে কি চোখেই দেখত। এখন তারা ঘৃণাই করে। চাখানায় চায়ের পেয়ালা নিয়ে সে একাই এক টেবিলে বসে, রিক্সার আড্ডায়ও একা বসে বসেই নিজের পয়সা গোনে। রাগে গা জ্বলে যায়, কিন্তু জোর করে সে রাগ চেপে রাখে। মারামারি করতে সে ভয় পায় না বটে কিন্তু করতেও সে চায় না। ওরাও মারামারি করতে পেছপা নয়, কিন্তু খুশির সঙ্গে মারামারি করতে গেলে একবার মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে হবে বইকি। ওদের একজনও গায়ের জোরে তার সমান নয়, এক হয় সবাই মিলে যদি রুখে আসে। কিন্তু সেটা তেমন সম্মানের কথা নয়। খুশি মনের রাগ মনেই পুষে রেখে রিক্সা টানতে লাগল। রিক্সা না কেনা পর্যন্ত এ সইতেই হবে, তারপর সে দেখে নেবে। তখনো তো আর রোজকার ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার তাগিদ থাকবে না, সোয়ারিও ভাঙিয়ে নিতে হবে না। তখন দেখা যাবে।

তার যা স্বাস্থ্য, তাতে অতবেশি খাটা তার উচিত নয়। শহরে এসে সেই যে অসুখে পড়েছিল, তার ধকল এখনো যায়নি। কি করে যাবে? ভালো

করে সেরে ওঠবার আগেই সে রিক্সাটানা শুরু করে দিয়েছে। শরীর দুর্বল, একথা মানতে সে রাজি নয়, কিন্তু ভয়ানক ক্লান্তি লাগে। তবুও বিশ্রাম সে করে না, ঘাম হলেই ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে—এই কথাই সে ভাবে। খাবার না খেয়ে তো পারে না, কিন্তু পেটপুরে খাবার সে খায় না। এখনো তেমনি ঢ্যাঙা আছে, মাংসপেশী এখনো তেমনি শক্ত, কিন্তু ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে। অতবড় লম্বা-চওড়া শরীরটা ঠিক রাখতে হলে তেমনি খাবার দরকার—সেকথা সে ভুলে গেছে।

বাঘিনী তাকে মাঝে মাঝে বকুনি দিয়েছে, এই ছোকরা এমনি যদি বেশি দিন চলে, তাহলে আর দেখতে হবে না। মুখদিয়ে নির্ঘাত রক্ত পড়বে। তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিও না বলে রাখছি।

সে নিজেও একথা জানে, কিন্তু কি করবে? ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে আধপেটা খেয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি! মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে গেছে। বাঘিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলেছে, খুব তো বলছ, পয়সা না জমালে রিক্সা আসবে কোত্থেকে?

অমন কথা অন্য কেউ তার মুখের উপর বললে বাঘিনী পুরো আধ দিন ধরে তাকে শাপান্ত করতো, কিন্তু খুশির উপর খুব সদয় বলেই ঠোঁট কুঁচকে বলেছে, একটু সবুর করেই রিক্সা কেন না বাপু! তোমার তো আর লোহার শরীর নয়। দুতিনদিন খাও-দাও, জিরোও; তা না শুধু টো টো করে ঘোরা! খুশি আমোলেই দেয়নি! বাঘিনী রেগে বলেছে, নিজের গোঁ ছাড়বে না, আমি কি করব। বলে দিচ্ছি বাছা, অক্কা পেলে তখন আমাকে দুষো না!

ন'কর্তাও আপত্তি করেছেন। এই রাতদিন রিক্সা টানায় শরীর ক্ষয় হোক কি না হোক যায় আসে না, কিন্তু টায়ারের পরমায়ু যে বেশ খানিকটা কমবে—এতো জানা কথা। অবিশ্যি, ভাড়া দেওয়ার সময় সমস্ত দিনরাতের করারেই ভাড়া দেওয়া হয়, আর রিক্সাওয়ালারাও যখন খুশি রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, যতক্ষণ খুশি টানতে পারে। খুশির মতো সবাই যদি সারা দিনরাত টানে—তাহলেই হয়েছে! রিক্সার আর অস্তিত্বই থাকবে না। যতই মজবুত হোক, চব্বিশ ঘণ্টা টানলে ঝরঝরে হয়ে তো যাবেই। বুড়ো ন'কর্তা খুশি হতে পারলেন না, কিন্তু কিছু বলবারও উপায় নেই। মুখ বুজে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এক চোখের কোণে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে।

একবার তার মনে হোলো, খুশিকে তাড়িয়ে দিলেই লেঠা চুকে যায়। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে ভরসা তিনি পেলেন না। না, খুশি তার হবু জামাই হবে, একথা তিনি কোনোদিন মনেও আনেননি, কিন্তু মেয়ের এই

ছোঁড়াটাকে ভারী পছন্দ। তিনি মেয়েকে ভয় করেন, তাকে ঘাঁটাবার তার ইচ্ছে নেই, এইতো একমাত্র মেয়ে, বিয়ে হওয়ার আশা নেই—তার একমাত্র বন্ধু এই ছোকরা—একে তাড়িয়ে দিলে কি চলে?

সত্যিকথা বলতে গেলে ন'কর্তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নেই। এমন কাজের মেয়ে, বিয়ে দিলে যে সব অচল হয়ে যাবে? এই স্বার্থপরতার জন্মেই তিনি মেয়েকে ভয় করে চলেন। জীবনে বুড়ো স্বর্গের বা মর্তের ভয় কাকে বলে জানতেন না, কিন্তু বুড়ো বয়সে মেয়েই হোলো তার ভয়ের কারণ। মাঝে মাঝে একথা ভেবে এই সান্ত্বনাটুকু পান যে, তিনি যখন একজনকেও ভয় করছেন, এর থেকেই প্রমাণ হয় তিনি দেবতা আর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা একেবারেই হারিয়ে ফেলেননি। যাক, তিনি নিজেই মনে মনে স্বীকার করলেন, মেয়েকে তিনি ভয় করেন আর সেই ভয়েই খুশিকে তাড়াতে পারেননি। কিন্তু এ কথার এই মানে করা উচিত নয় যে, তার মেয়ে খুশিকে বিয়ে করে বোকা বনুক, এই তিনি চান। না, তিনি তা চান না। তার মেয়ের অবিশ্যি, এ মতলব যে নেই তা নয়। কিন্তু খুশি অতদূর যেতে সাহসই করবে না।

একটু সাবধান হতেই হবে। মিথ্যেমিথ্যি মেয়েকে এখন চটিয়ে লাভ নেই।

খুশি কিন্তু বুড়োর হাবভাব বুঝতে পারল না। তার সময়ই বা কোথায়? মানব-মিলন আস্তানা যদি তাকে ছাড়তে হয় রাগারাগি করে ছেড়ে যাবে বলে সে ভাবতেও পারে না। মাসমাইনের কাজ পেলে সে ছেড়ে যাবে বইকি। আর ছুটো সোয়ারি টেনে টেনে তার ভালোও লাগে না! প্রথমত অন্য রিক্সাওয়ালারা সোয়ারি ভাঙিয়ে নেয় বলে তার উপর চটেছে, দ্বিতীয়ত, রোজ কত আয় হবে তারও কোনো ঠিক নেই। আজ হয়তো খুব রোজগার হোলো, কাল হয়তো একেবারে কিছুই না! কবে যে সে রিক্সা কিনতে পারবে মোটামুটি আন্দাজ করাই মুশকিল হবে। তার চেয়ে বাঁধাবাঁধি রোজগার ভালো! যতই কম হোক না, মাসে মাসে থোক কিছু জমাতে পারবে—মনও হাল্কা হবে।

মাস ঠিকে কাজ সে জোগাড় করে ফেলল। যাক! এখন আর ছুটো সোয়াররি জন্ম রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে না। ইয়াঙ পরিবারে সে কাজ পেল। শ্রীযুক্ত ইয়াঙ সাঙহাই এর লোক, তার বড় বৌ চিয়েন সিনের মেয়ে, ছোট বৌ সুচাই-এর। দুবৌয়ের একপাল ছেলেপুলে।

প্রথমদিন কাজ করতে গিয়ে খুশির মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় হোলো। খুব ভোরে বড় বৌ বাজার করতে বেরুলেন। ফিরে এসেই ছুটতে হোলো ছেলে মেয়েদের নিয়ে স্কুলে। এক স্কুল তো নয়, নানারকমের স্কুল। কোনোটা নিম্ন প্রাথমিক, কোনোটা মধ্য, কোনোটা বা কিণ্ডারগার্টেন। বয়স অনুসারে এক একজনের এক এক স্কুল। ছেলে

মেয়েদের স্কুলে পৌছে দিয়ে শ্রীযুক্ত ইয়াঙকে তার সরকারী অফিসে দিয়ে এল। এবার ফিরে এসে ছোটবৌকে নিয়ে বাজারে বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ঘুরিয়ে আনতে হোলো। এদিকে তুপুরের টিফিনের সময়। ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে আবার রেখে আসা হোলো। ফিরে এসে মনে হোলো, এবার তুটো না খেলে আর চলে না। কিন্তু তারই কি জো আছে। বড় বৌ চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে হবে। খাবার জল বাড়িতে দিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত আছে, কুয়ো থেকে বাসন মাজার কাপড় কাচার জল আনতে হয়। খুশি যখন চাকরিতে ঢোকে তখন এমন কোনো কথা ছিল না, কিন্তু কি আর করে। মনিবকে খুশি রাখবার জন্য কুয়ো থেকে জল তুলে চৌবাচ্চা ভরাল। জল তোলা শেষ করে ভাতের থালা নিয়ে বসেছে এমন সময় ছোট বৌ কি একটা কিনে আনতে ফরমাস করলেন।

বড় বৌ আর ছোট বৌতে একেবারে মিল নেই, কিন্তু ঘরগৃহস্থালীর ব্যাপারে তারা একমত, চাকর বাকরকে কখনো বসিয়ে রাখতে নেই, তাই তারা তাদের খাবার সময়-টুকু দিতেও নারাজ। খুশি একথা জানত না, তাই ভাবল, প্রথম দিনটা হঠাৎ এত কাজ পড়েছে, দ্বিতীয় দিন থেকে খাবার আর জিরোবার সময়টুকু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাই সে মুখবুজে ফাইফরমাশ খেটে গেল, নিজের পয়সা খরচ করে কখানা পিঠে কিনে খেল। তা চাকরী রাখতে হলে এমন একটু আধটু করা দরকার বইকি!

ছোট বৌয়ের জিনিস কিনে ফিরে এলে বড় বৌ টিয়েনসিনি ভাষায় উঠোন ঝাঁট দিতে হুকুম দিলেন। মনিব আর তার বৌ বাড়ি থেকে যখন বেরোন বেশ সেজেগুজেই বেরোন, কিন্তু বাড়ির উঠোন একেবারে জঞ্জালে ভরতি, সেদিকে তাদের নজর নেই। উঠোনখানা দেখেই তার গা ঘিনঘিন করছিল, ঝাঁটদিতে সে লেগে গেল। সে ভুলেই গেল যে, সে রিক্সাওয়ালা, সাধারণ চাকর নয়। যখন উঠোন সাফ করা হয়ে গেল, ছোট বৌ এবার ঘরদোর ঝাঁট দিতে বললেন। খুশি আপত্তি করল না। সে অবাক হয়ে গেল, এমন পটের বিবির মতো ওদের চেহারা, অথচ ঘর হয়ে আছে যেন নরককুণ্ড, পা ফেলাই যায় না।

ঘরদোর সাফ হয়ে এসেছে, এমন সময় ছোট বৌ একবছরের কচি খোকাকে তার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। এক বছরের হলে কি হবে, দামাল ছেলে! হেন কাজ নেই সে করতে পারে না, কিন্তু ধাইগিরি সে কোনো দিন করেনি। তুহাত দিয়ে সে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল, কি জানি খোকা যদি পড়ে যায়; আবার শক্ত করে ধরবারও যো নেই, খোকার ব্যথা লাগতে পারে। সে খোকাকে নিয়ে আমা চ্যাঙ-এর কোলে দিতে গেল। আমা চ্যাঙ বাড়ির ঝি, লম্বা চওড়া

চেহারা, ইয়াঙ্‌ৎসির উত্তরে তার বাড়ি। আমা চ্যাঙ কোলে তো নিলই না, বরং গালাগাল দিল।

ইয়াঙ্‌ পরিবারে চাকর তিন চার দিনের বেশি টেকে না। মনিব আর তার বৌরা চাকরকে কেনা বলে মনে করেন। তারা ভাবেন, চাকরকে যদি না খাটান যায়, তাহলে টাকাই যে উশুল হবে না। এক আমা চ্যাঙ পাঁচ ছ'বছর টিকে আছে। তার কারণ, আমা চ্যাঙ সবাইকে গালাগাল দিতে পারে, এমনকি মনিব আর তার বৌরাও বাদ পড়েন না। মনিবের জিভের ধার আছে, টিয়েনসিনের বৌও কম ঝগড়াটে নন, সুচাউ-এর বৌটিও আস্তে আস্তে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা বলেন কিন্তু তারা তিনজন একসঙ্গে মিললেও আমা চ্যাঙকে এঁটে ওঠা শক্ত। আমা চ্যাঙ উত্তরে এমন সব কথা ছাড়ে, তারা খেই হারিয়ে ফেলেন। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীই তাদের মিলেছে।

খুশি যে গ্রামে বেড়ে উঠেছে, সেখানে গালিগালাজের রেওয়াজই বিশেষ নেই। দরকার হলে হাত চালাতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু আমা চ্যাঙকে মারতে সে সাহসই পেল না। তার উপরে সে মেয়ে মানুষ, তাকে মারাও যায় না। তার দিকে সে কটমট করে তাকাল, চ্যাঙ মা চুপ করে গেল, সে বুঝতে পারল, খুশিকে ঘাঁটালে বিপদ আছে।

এবার বড় বৌ খুশিকে ডেকে ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে আসতে বলল। খুশি ছোট বৌ-এর কোলে খোকাকে দিয়ে এল। ছোট বৌ-এর মনে হোলো, খুশি তাকে অবজ্ঞা করেছে। তিনি মুখ খুলে তাকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন।

খুশি ছোট বৌ-এর খোকাকে কোলে নিয়েছে—এ-ব্যাপারটা বড় বৌ-এর মোটেও ভালো লাগেনি। ছোট বৌকে মুখ খুলতে দেখে এবার তিনিও গলা খেঁকার দিয়ে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। খুশির উপরই চলল গালাগাল, সে সকলের গালিগালাজের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুশি রিক্সা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। রেগে উঠতেও সে যেন ভুলে গেছে।

ছেলেমেয়েদের একে একে স্কুল থেকে নিয়ে সে ফিরে এল। উঠোনে গোলমাল হৈ চৈ—যেন বাজার বসেছে। তিনটি স্ত্রীলোকের চিৎকার, ছেলেমেয়েদের কান্না, সব মিলে যেন অভিনয় শেষ হবার পর থিয়েটার স্ট্রীটের হল্লাকেও হার মানায়। তাছাড়া এমন হট্টগোলের কোনো কারণও নেই।

খুশি আবার রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এবার সরকারী অফিস থেকে মনিবকে আনতে যেতে হবে। পথে নেমে তার মনে হোলো, রাস্তার হৈ-হল্লা, ঘোড়ার বিদঘুটে চিৎকার বাড়ির গোলমালের চাইতে ঢের ভালো।

এমনি করে দুপুর রাত পর্যন্ত চলল আনা আর নিয়ে যাওয়ার পালা, তারপর সে হাঁফ ছাড়বার সময় পেল। তখন ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে, মাথার ভিতরে বোঁ বোঁ শব্দ শুরু হয়েছে। মনিব আর দুই বৌ-এর মুখ কিন্তু তখনো থামেনি। কিন্তু ঘুম ছাড়া তখন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় নেই। সে তার ছোট কুঠরিতে ঢুকে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম তখন চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে।

ঠিক ফটকের পাশেই এই কুঠরিটি, মাঝখানে কাঠের একটা দেওয়াল তুলে দুভাগ করা হয়েছে। চ্যাঙ মা একপাশে ঘুমোয়, সে একপাশে। ঘরে আলো নেই; একটা ছোট্ট দুফুট মাপের জানালা—কি ভাগ্য যে তারই ভিতর দিয়ে পথের আলোর খানিকটা এসে পড়ে। স্যাঁতসেঁতে ঘর, দুর্গন্ধভরা—চারিদিকে তামার পয়সার মত পুরু ধূলো জমেছে। ঘর জুড়ে এক নড়বড়ে তক্তপোশ; খুশির মনে হোলো এখানে শুলে মাথাটা যদি বা তক্তপোশের উপরে থাকে, পা দুটো দেয়ালে তুলে দিতে হবে। পা দুটো দেয়াল থেকে নামিয়ে রাখলে, আধো বসা অবস্থায় ঘুমাতে হবে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে ঘুমানও অসম্ভব। তাই সে বহুক্ষণ ভেবে তক্তপোশটাকে ঘরের ভিতরে আড়াআড়ি পাতল। ঘরের এক কোণে মাথা আর এক কোণে পা দিয়ে দিব্যি ঘুমোন যাবে। পা অবশ্য একটু ঝুলে থাকবেই—তা আর কি করা যায়? এমনিভাবেই রাতটা কাটাতে হবে।

বিছানা এনে পেতে সে শুয়ে পড়ল। পা ঝুলিয়ে ঘুমোবার অভ্যেস নেই—ঘুম এল না। জোর করে চোখ বুজে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল—ঘুমো না, কাল তো আবার ভোরেই উঠতে হবে। কত কষ্টই তো সহ্য করেছিস, এও তেমনি সহ্য করে গেলেই হয়। শক্ত কাজ, খারাপ খাওয়া-দাওয়া এসব ভাবলে কি চলে? সুবিধেও তো হতে পারে। হয় তো, মাচিয়াঙ খেলবার জন্য রোজই ওদের এখানে ভিড় হয়, তাহলে কি আর কিছু উপরি মিলবে না! কর্তা আর গিন্নীরা বাইরে কোথাও ভোজ খেতে গেলেও তো আরো কিছু পাওয়া যাবে। কি জন্য এখানে এসেছিস্? টাকা রোজগারের জন্যই তো? টাকা যদি পাওয়া যায়, তাহলে সব কিছুই সইতে হবে।

এমনিধারা ভেবে তার মন হালকা হয়ে গেল। ঘরের ভিতরের দুর্গন্ধও আর নাকে লাগল না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল, দুর্গন্ধময় একটা পোকা ফর ফর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। নাকে লাগছে এসে দুর্গন্ধ, কিন্তু তাকে ধরবার জন্য কষ্ট স্বীকারটুকুও সে করতে রাজি নয়।

দুতিন দিন কেটে গেল। খুশির বুক তখন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে: আশা আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে গেছে। চার দিনের দিন বাড়িতে এলেন কয়েকজন

মহিলা অতিথি, চ্যাঙ মা তাড়াতাড়ি তাস খেলার টেবিল এনে পাতল। মনে হোলো ছোট্ট হৃদয়ের জমাট-বাঁধা বরফে বসন্তের হাওয়া এসে লাগছে।

ছেলেমেয়েদের চাকরের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে মনিবের দুই বৌ মাচিয়াঙ খেলতে বসে গেল। চ্যাঙ্‌মা সিগারেট, চা আর গরম তোয়ালে জোগাচ্ছে বলে তার উপর পড়ল এই খুদে বাঁদরদের ভার। সে এদের মোটেই দেখতে পারে না, কিন্তু ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখল, বড় বৌ চাকরদের জন্য প্রতি বাজিতেই কিছু পয়সা সরিয়ে রাখছে। যাক্ বড় বৌ কড়া হলেও বোকা নয়। চাকর-চাকরানীদের মুফোত বকশিস্ দেওয়ার এমন সুযোগ সে কি আর ছেড়ে দেবে? খুদে বাঁদরগুলির অত্যাচার সে বকশিসের লোভে মুখ বুজে সয়ে গেল।

খেলা শেষ হয়ে গেল। বড় বৌ তাকে ডেকে অতিথিদের বাড়ি পৌছে দিতে বললেন। মহিলা দুজন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার জন্য ব্যস্ত; এক রিক্সায় গেলে পৌছতে দেরি হবে বলে খুশি আর একখানা রিক্সা ডেকে নিয়ে এল। বড় বৌ ট্যাঁকে গোঁজা পয়সা ভাড়া দেওয়ার জন্য বার করতে গেলেন। মহিলাটি কয়েকবার আপত্তিও করলেন কিন্তু বড় বৌ এমন চিৎকার করে উঠলেন, মনে হোলো তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। সে কি বোন! তুমি এলে আমার বাড়িতে, আর রিক্সা ভাড়া দেবে তুমি? না, না, তা হবে না। নাও, নাও, উঠে পড়।

দশ সেণ্ট বার করে তিনি মহিলাটির হাতে গুঁজে দিলেন। খুশি দেখতে পেল, বড় বৌয়ের হাত কাঁপছে।

অতিথিদের বাড়ি পৌছে দিয়ে ফিরে এসে তাসের টেবিল সরিয়ে ঘর গোছানোয় সে সাহায্য করতে লেগে গেল। বড় বৌ দাঁড়িয়ে থেকে সব করালেন। খুশি ঘর গোছাতে গোছাতে একবার বড় বৌয়ের দিকে তাকাল। বড় বউ চ্যাঙ্ মাকে চায়ের জন্য গরম জল আনতে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দশসেণ্ট খুশির হাতে গুঁজে দিলেন।

এই নাও, অমন কটমট করে তাকিও না বাপু!

খুশির মুখখানা রাগে লাল হয়ে গেল। মনে হোলো, এখনি সে বড় বৌয়ের মুখের উপর দশ সেণ্ট ছুঁড়ে মারবে।

আমার চারদিনের মাইনে চুকিয়ে দিন!

কি হোলো? বড় বৌ খুশিকে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর কোনো কথা না বলে তার মাইনে চুকিয়ে দিলেন। বিছানা নিয়ে সদর ফটক পেরিয়ে আসতে না আসতেই সে শুনতে পেল পিছনে গালাগাল শুরু হয়েছে।···

ছয়

শরতের রাত, এখনো গভীর হয়নি। উজ্জ্বল চাঁদের আলো। গাছের পাতা প্রায় ঝরে গেছে, যে-কটা বাকি আছে তাদের ছায়া পড়েছে মাটিতে। মৃদু হাওয়া একবার বইছে, চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে ফিরে আসছে। খুশি মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল। মাথার উপরে বহু দূরে স্বর্গের নদী বয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘনিশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। এমন প্রাণ-জুড়ানো সন্ধ্যা, তার বুকের ছাতিখানাও তো বেশ চওড়া, কিন্তু মনে হচ্ছে তাতে হাওয়া ঢুকছে না, দুঃখের ভারে পিষে যাচ্ছে বুক, বসে পড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে তার ইচ্ছে হোলো। এমন লম্বাচওড়া চেহারা আর শান্ত স্বভাব তার, কিন্তু কি হোলো। সে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকে তার সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করেছে, সে চাকরীতে পর্যন্ত বেশিদিন টিকতে পারল না। শুধু ইয়াঙ্‌পরিবারকে গালাগাল দিয়েই সে ক্ষান্ত হোলো না; তার দুঃখ নিয়ে এল হতাশা আর ভয়—সে বুঝি জীবনে আর কিছুই করতে পারবে না, বিছানা পিঠে নিয়ে সে চলতে লাগল, কিন্তু পায়ে যেন আর জোর নেই। এখুনই বুঝি ভেঙে পড়বে। আট দশ লি যে অক্লেশে দৌড়তে পারত, সে-খুশি বুঝি আর নেই।

বড় রাস্তায় যখন এসে সে পৌঁছল, তখন অনেক রাত হয়েছে। পথে দু-একজন লোক চলছে; শুধু উজ্জ্বল আলোর সার নিশব্দে জ্বলছে। কোথায় যাবে জানে না। এক মানবমিলনে যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যাওয়া মুশ্‌কিল, খুশি অস্বস্তি বোধ করল। সে যে করে হোক একখানা রিক্সা কিনতে চেয়েছিল—তার জন্য নিজের আত্মসম্মানবোধ সে বিকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কি হোলো? সাড়ে তিন দিনের বেশি চাকরীতে টিকে থাকতে পারল না। এখন মানবমিলন রিক্সার আড্ডায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখানই ভার হবে। সবাই হেসে বলবে, দেখো দেখো, তিন দিনেই খুশির চাকরী খতম হয়ে গেল।

কিন্তু মানবমিলনে না গিয়ে সে কোথায় যাবে? সে আর ভাবতে পারল না, তাড়াতাড়ি রিক্সার আড্ডার দিকে চলতে লাগল।

একতলা দালান, তিনটে বড় বড় ঘর সুমুখে, মাঝের ঘরটায় অফিস; রিক্সাওয়ালরা এখানে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে বা ব্যবসা সম্পর্কে কথা বলার জন্য ঢুকতে পারে, কিন্তু বিনাকারণে ঢোকবার হুকুম নেই। দুপাশের দুটি ঘরের একটিতে থাকে বুড়ো, আর একটিতে তার মেয়ে। পশ্চিম দিকের ঘরের পাশেই ফটক, ফটকের

সুমুখে শেড-ছাড়া একটা জোরাল ইলেকট্রিক বালব; তারই নিচে একখানা ফলকে সোনার অক্ষরে খোদাই করা 'মানবমিলন রিক্সার আস্তানা।' এই ফটক দিয়েই সবাই রিক্সা নিয়ে আসা-যাওয়া করে। ফটকের ভিতরে ঢুকেই একটা সবুজ রংকরা দরজা দেখা যায়—সেটি ঠেলে ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে সারি সারি রিক্সা, কোনোটা বা হলদে, কোনোটা বা লাল বা কালো রঙের—সবগুলিই বেশ ঝক্‌ঝকে, বসবার আসনটির ঢাকনাটি পর্যন্ত বরফের মতো ধবধবে সাদা। রিক্সাওয়ালারাও অন্যান্য রিক্সাওয়ালাদের থেকে ঢের বেশি ফিটফাট, তার জন্য গর্বেরও তাদের সীমা নেই।' রিক্সাওয়ালা গোষ্ঠীর মধ্যে তারা নিজেদের অভিজাত বলেই মনে করে।

এগারোটা বেজে গেছে, খুশি এসে মানবমিলনের ফটকে পৌছল। আলোটা ফটকের উপরে ঠিক তেমনি জ্বলছে, তেমনি নিসঙ্গ আর অদ্ভুত। ভিতরে সব অন্ধকার; অফিস বা পুবের ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে বাইরে পড়ছে না। শুধু পশ্চিমের ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। ঘরটা বাঘিনীর; সে এখনো ঘুমোয়নি। খুশি চোরের মতো পা টিপে টিপে চলতে লাগল; কি জানি বাঘিনী যদি দেখে ফেলে। বাঘিনীর তার উপরে বেশ উঁচু ধারণাই আছে, ব্যর্থতার প্রথম সাক্ষী তাকে সে করতে চায় না। রিক্সা নিয়ে বাঘিনীর জানালার নিচে দিয়ে নিঃশব্দে সে এগিয়ে চলল। কিন্তু বেশি দূর সে এগোতে পারল না। বাঘিনী এসে জানালায় দাঁড়িয়েছে।

কে গা; খুশি না? তারপর···বাঘিনী কি যেন বলতে গেল, কিন্তু খুশির মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে গেল। মুখে তার হতাশার ছোপ লেগেছে, তার উপরে রিক্সার ভিতরে গুটোনো বিছানা—একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছেই।

যা আপনি ভয় করবেন, তা ঘটবেই—এই পৃথিবীর নিয়ম। খুশির নিরাশা আর ভয় জমে যেন বরফের তাল হয়ে গেছে। একটা কথা মুখ দিয়ে তার বেরুল না। বাঘিনীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আজ রাতে বাঘিনী যেন বদলে গেছে। জোরালো আলোরই কারসাজি, না মুখে খুব পাউডার ঘষেছে তাই বা কে বলবে, কিন্তু রংটা বেশ ফরসাই দেখাচ্ছে, আর তার দরুন মুখের সয়তানি ভাবটাও ঢাকা পড়ে গেছে। হাঁ, রুজ মেখেছে বইকি ঠোঁটে! নইলে অমন মন কেড়ে নেওয়া চটক আসবে কোত্থেকে। খুশি অবাক হয়ে গেল। দিনের পর দিন বাঘিনীকে সে দেখেছে, কখনো তাকে মেয়ে মানুষ বলেই তার মনে হয়নি। কিন্তু আজ রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুটি দেখে একটু লজ্জিতই হয়েছে। পোশাকেও বেশ বাহার দেখা দিয়েছে। হাল্কা সবুজ রঙের খাটো কাঁচুলি তার গায়ে, পরনে ক্রেপ সিল্কের ঢিলে পায়জামা।

আলো এসে পড়েছে সবুজ কাঁচুলির উপর, জেল্লা ধরিয়ে দিয়েছে। সব

মিলিয়ে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ইসারা। কাঁচুলিটা খুবই খাটো, পায়জামার সাদা ফিতেটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; কালো ক্রেপ সিল্কের ঢিলে পায়জামা রাতের হাওয়া লেগে ফুলে ফুলে উঠছে—এক অপদেবতা যেন বার বার তাকে দুলিয়ে দিচ্ছে, এই উজ্জ্বল আলো থেকে তাকে রাতের অন্ধকারে যেন সে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

খুশি বেশিক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না, মাথা নিচু করল। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিলে কি হবে, সবুজ কাঁচুলি তখন তার মনের ভিতরে পিলপেগাড়ি করেছে। কতদিন ধরে তো সে বাঘিনীকে দেখেছে, কিন্তু এমনটি তো কখনো দেখেনি। এমন সাজ-পোশাক, টুকটুকে ল্যাল ঠোঁট—সত্যিই বাঘিনীকে সে এমন বেশে কখনো দেখেনি। লিউ-এর টাকাকড়ি বিস্তর। ইচ্ছে করলে বাঘিনী রোজ এমনি সিল্ক আর সাটিন পরতে পারে, কিন্তু সে কোনোদিন ওসবের ধার ধারেনি। রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করেই দিন কাটিয়েছে, সাধারণ জামা-কাপড়ই পরেছে। কখনো কখনো রংচঙে কাপড় জামাও পরেছে, কিন্তু চোখে পড়বার মতো নয়। খুশির মনে হোলো, এ এক নতুন আবির্ভাব, কিন্তু বহু পরিচয়ের আমেজ লেগে আছে। কি জানি সে ভুল করেনি তো! হয়ত ভুল রাস্তায়, ভুল ঠিকানায়ই সে ঢুকে পড়েছে!

একে তো মনটা বেশ ভারী হয়ে আছে, তার উপরে এই নতুন বিস্ময়—এখন সে কি করবে? সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে, কিছুই ভাবতে পারছে না। খুশি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মেয়েটাই বা ঘরে চলে যাচ্ছে না কেন? ওকে একটা হুকুম দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ছুটে চলে যেতে পারে। অসহ্য হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি, নিজের দুঃখ-দুর্দশার উপরে এ আর এক অনুভূতি—এর জাত আলাদা। কিন্তু এর দাহ শতগুণ বেশি।

বাঘিনী দু-এক পা এগিয়ে কাছে এসে নিচু স্বরে বলল, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? যাও, রিক্সা রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে এস। কয়েকটা কথা তোমাকে বলব। আমার ঘরেই এস, বুঝলে?

বাঘিনীকে সে রিক্সার আড্ডা চালানোয় সাহায্য করেছে, তার হুকুম তামিল করেছে। আজও তাই করবে। কিন্তু আজ যেন সে-বাঘিনী আর নেই, একেবারে নতুন;—খোলস বদলে এসেছে। আজ একটু ভাবনার বিষয় আছে বইকি! খুশি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করল—কিন্তু মগজটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, কিছুই থিতোতে চায় না।

কি আর করবে? রিক্সা ঠেলে শেডে নিয়ে এল। তাদের ঘর অন্ধকার। হয়তো, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ হয়তো এখনো ফেরেইনি। রিক্সাখানা

জায়গা মতো রেখে সে বেরিয়ে এসে বাঘিনীর দরজার সুমুখে দাঁড়াল। বুকের ভিতরে তোলপাড় চলেছে।

ভিতরে এসো! আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। বাঘিনী ভিতর থেকে বলল। তার ঠোঁটের কোণে ছেনালি হাসি, চটুল ভঙ্গী।

খুশি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। টেবিলে কয়েকটা পিয়ার পড়ে আছে। এখনো ঘন সবুজরঙে লাল আভাস লাগেনি; একধারে মদের বোতল, তার পাশে তিনটে ধবধবে সাদা চীনেমাটির পেয়ালা। একখানা বড় থালায় সয়াবীনের ঝোল আর আধখানা মুরগী ও আরো নানা খাবার সাজানো।

দেখ, বাঘিনী তাকে চেয়ারে বসতে বলল, আজ একটু ভালো খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর মাঝে মাঝে ভালো মন্দ না খেলে চলবে কেন? তা একা খেয়ে কি সুখ আছে, তাই তোমাকে ডাকলাম।

এক পেয়ালা মদ সে পেয়ালায় ঢালল, কাওলিয়াঙ থেকে এই মদ তৈরী। সয়ার ঝোলের গন্ধের সঙ্গে মদের উগ্র গন্ধ মিশে গেছে, নাকে এসে ঢুকছে।

চটপট শেষ কর। মুরগীটা খেয়ে ফেল। আমি খেয়ে নিয়েছি, আমার জন্য ভেব না। কিছুক্ষণ আগে ডোমিনো খেলে ভাগ্য পরীক্ষা করছিলাম, তখনই জানি তুমি ফিরে আসছ। শুনে খুব অবাক হচ্ছ তো?

আমি তো মদ খাই না। খুশি পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বলল, তার মন চিন্তার উষর মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে, মরুমায়ায় পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

মদই যদি না খাবে তো, এখান থেকে সরে পড়। ভালো ভেবে ডেকে আনলুম, মদ দিলুম, উনি খাবেন না! বোকা উট, কত আর বুদ্ধি হবে! খাও, খাও, ঐ এক ফোঁটা মদ খেলে তুমি মরে যাবে না! আমি যে মেয়েমানুষ, আমিও তিন-চার পেয়ালা শেষ করে দিতে পারি। ওঃ বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? দেখ, এক চুমুকেই পেয়ালা শেষ করে দিচ্ছি।

খুশির কাছ থেকে পেয়ালা নিয়ে চোখ বুজে প্রায় অর্ধেকটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর পেয়ালাটা খুশির হাতে ফিরিয়ে দিলে।

নাও, শেষ করে ফেল! শেষ না করলে কান ধরে গলায় সবখানি ঢেলে দেব।

খুশি বহু অত্যাচার অবিচার সয়েছে, তার বুকে পাথরের মতো তারা চেপে বসে আছে—কথার উত্তাপে তাদের গলিয়ে দিতে সে পারেনি। আজও সে মেয়েটার ঢলানি দেখে রেগে উঠল: এমন মেয়েকে সায়েস্তা করবার কৌশল সে জানে; একবার চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলেই ওর চটুলতা উবে যাবে। কিন্তু সে তা পারবে না। বাঘিনী তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করে এসেছে। সকলের সঙ্গেই ও অমনি করে কথা কয়—ওই ওর স্বভাব। ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার

করতে তার ইচ্ছে নেই। তার চাইতে ওর কাছে সব কথা খুলে বললে কেমন হয়? এতদিন সে মুখ ফুটে কিছু বলতে চায়নি, কিন্তু আজ রাতে হাজারটা কথা। দশহাজারটা কথা মনের বিষণ্ণতার আড়ালে জটলা পাকিয়েছে; বেরুতে পথ পাচ্ছে না। তাদের বের করে দিতে না পারলে সে তো কখনো সুখী হতে পারবে না। তারা যে মনকে আরো ভারী করে তুলেছে।

এমনি ধারা ভাবতে ভাবতে মনে হোলো—না না, বাঘিনী তাকে ঠাট্টা করছে না, বরং সে তাকে ভালোবাসে, তাকে রক্ষা করতেই সে চায়। বাঘিনীর হাত থেকে পেয়ালা নিয়ে এক চুমুকে সে নিঃশেষ করে দিল।

ধীরে ধীরে পানসে মদ দেহের ভিতরে পথ করে চলেছে, জ্বলছে গলা, পাকস্থলীতে অনুভব করছে তার তীব্রতা। পেটে মোচড় দিচ্ছে, শরীরে লাগছে ঝাঁকুনি।

বাঘিনী হো হো করে হেসে উঠল। খুশি ভয়ে ভয়ে পুবের ঘরখানার দিকে তাকাল। লিউ সেখানে থাকেন।

কেউ নেই গো, হাসি থামিয়ে বাঘিনী বলল, ঠোঁটের কোণে তখনো হাসির আমেজ লেগে আছে। বুড়ো তার বোনের জন্মদিনের নেমন্তন্নে গেছে, ফিরতে দু-তিন দিন হবে। কম দূর তো নয়। আমার পিশি নান ইউয়ানে থাকে। কথা বলতে বলতে সে আর এক পেয়ালা মদ ঢালল।

তার কথা শুনে খুশি কেমন সংকুচিত হয়ে গেল। তার মনে হোলো, কোথায় যেন ব্যাপারটার গলদ আছে। কিন্তু টেবিল ছেড়ে উঠে যেতেও মন চাইল না। বাঘিনীর মুখখানা তার মুখের এত কাছে, উজ্জ্বল তার পোশাক, টুকটুকে লাল দুটি ঠোঁট—সব মিশে গিয়ে তার মনের ভিতরে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এমন উত্তেজনা বুঝি কোনোদিন সে অনুভব করেনি। কিন্তু মেয়েটা বেহদ্দ কুৎসিত—এখনো তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে না। তবু এমন এক উদ্দামতা তাকে ঘিরে আছে, মনে হচ্ছে তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন আজ রাতে সজীব হয়ে উঠেছে—সে যেন বদলে গেছে, সত্যি বদলে গেছে। না, সে যা ছিল ঠিক তাই আছে, কিন্তু তার উপরে লেগেছে নতুন রং।

কেন এমন হোলো, খতিয়ে দেখবার তার সাহস নেই, এমন কি তার এই নতুন রূপ তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। তবু উঠে যেতে সে পারছে না, কেমন যেন ভালো লাগছে। লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ, পুড়ে যাচ্ছে এক অননুভূত উষ্ণতায়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে! সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, বাঘিনী এক চুমুকে পেয়ালাটা নিঃশেষ করে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। কি জানি ওরও হয়তো সাহস ফুরিয়ে গেছে, মদ খেয়ে আবার তাকে জাগিয়ে তুলছে।

কিছুক্ষণ আগে খুশি তাকে নিজের দুঃখদুর্দশার কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন সে সব ভুলে গেছে। অকারণে সে বার বার বাঘিনীর দিকে তাকাচ্ছে, বুকে উঠছে তুফান। বাঘিনীর নতুন রূপ যেন স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মদের মতই পানসে আর উগ্র সে-রূপ। তাকে অভিভূত করে ফেলেছে, জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আর সে যেন বাঘিনী নয়, তার কামনাময়ী আত্মা এক উত্তপ্ত লাভাসমুদ্র, তার ভিতরে তাকে ডুব দিতে হুকুম দিচ্ছে। লাভার সমুদ্র তার দেহের সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিয়ে তার শুষ্ক অস্থিপঞ্জর পারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে—একটুও মমতা বুঝি দেখাবে না।

খুশি নিজেকে নাড়া দিয়ে সজাগ করতে চাইল। তাকে সাবধান হতে হবে। কিন্তু ভীরুর মত পালিয়ে সে যাবে না, বীরের মত এই লাভাস্রোতকে সে রুখে দাঁড়াবে। পর পর তিন পেয়ালা মদ সে নিঃশেষ করে দিল। মদের উগ্র তারল্যে তলিয়ে গেল তার সাবধানতার সংকল্প। বাঘিনীর দিকে বিহ্বল চোখে তাকাল। এত সুখী, এত সাহসী সে। সাহস যেন উপচে পড়ছে; নতুন এক অভিজ্ঞতাকে সে যেন মুঠোয় চেপে ধরতে চাইছে, নিষ্পেষিত করতে চাইছে। বাঘিনীকে সে এমনি ভয় করে, কিন্তু আজ যেন ভয়ের আর লেশমাত্র নেই। কিসের ভয়?—ওতো সামান্য একটা মেয়ে। বরং তার ভিতরে যে পরিবর্তন এসেছে, যে সাহস এসেছে, তাকেই ও ভয় করবে। দেখ না, কেমন ছোট্ট বিড়ালছানার মতো মেয়েটা কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে আছে, ওর গায়ে হাত দিলে বিড়াল ছানার মতো'ই নরম লোম হাতে লাগবে, ও চোখ মুদবে আরামে, হয়তো ভয়েও।

বাঘিনীর কি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। ঠাট্টার তিক্ত হুল আর কথায় নেই, নেই ঘৃণার আমেজ; খুশির শক্তির কাছে সে যেন পোষ মেনেছে, তার বুকে সে আশ্রয় খুঁজছে। কখন যে বাঘিনী আলো নিভিয়ে দিয়ে তার পায়জামার ফিতে খুলে দিয়েছে, সে জানতে পারল না। অন্ধকারে বাঘিনীর সিল্কের জামা, আর নরম ক্রেপের পায়জামার দরকার কি? সব খসে পড়েছে, স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। আদিম মানব আর মানবী—পোশাক মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। খুশি বহুক্ষণ ভুলে গেছে বাঘিনীকে কেমন দেখতে, অন্ধকারে সে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না; শুধু অনুভব করছে তার উষ্ণ নিশ্বাস। বাঘিনী হাত দিয়ে এবার দেখিয়ে দিল, সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্থান। অমৃতলোভে সে উন্মুখ হয়ে আছে। খুশি সেখানে আরোপ করবে তার পুরুষত্ব, তাকে বিদ্ধ করবে নির্মম পৌরুষ দিয়ে। তার শক্তি, তার উত্তেজনার অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে, এমন কি তার বুকে অত্যাচারীর প্রতি আক্রোশের যে আগুন জ্বলছে, তারও বুঝি নিবৃত্তি সেখানে লুকিয়ে আছে।

··· বাইরের রাত জানলা দিয়ে ঘরে এসেছে, আকাশ কালোয় কালো। রুপোলী ধারায় বয়ে চলেছে স্বর্গের নদী। একটা গ্রহ খসে পড়ল, নিকষকালো আকাশের বুকে একটা রেখা—পুচ্ছের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, আকাশে বৃত্ত রচনা করছে। ওর ঝাঁকুনিতে গোটা পৃথিবীটা কেঁপে উঠছে, অন্ধকার খান খান হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আকাশ থেকে তারারা এক মহাবিস্ফোরণে খসে পড়ে হৈমন্তী রাতের শূন্যতা কাঁপিয়ে দেবে। হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে, নিবে যাবে, ছড়িয়ে যাবে, তারপর একদিন উঠবে আর এক নতুন গ্রহ, আকাশ ফুঁড়ে দিয়ে যাবে বহ্নিমান তীব্র জ্যোতি। কিন্তু তারও পালা একদিন শেষ হয়ে যাবে, রাতের অন্ধকার আসবে ঘিরে; তারারা ধীরে ধীরে ফিরে পাবে নিজেদের স্থান; হৈমন্তী রাতের বাতাস জুড়িয়ে যাওয়া গ্রহের দিকে তাকিয়ে হাসবে। ······

··· পরদিন খুশি খুব ভোরে উঠেই রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মাথাটা টিপটিপ করছে, গলা জ্বলছে, প্রথম মদ খেলে অমনিই হয়। বাইরের হাওয়া লাগলেই সেরে যাবে। মাথাধরা না হয় গেল, কিন্তু কালকের রাতের ব্যাপারটাতো অত তাড়াতাড়ি মিটবে না। খুশি একটা সরু গলির মুখে রিক্সা রেখে বসে পড়ল। সত্যিই অত সহজে ব্যাপারটা মিটবে না। নিজের কাছে নিজেকেই কেমন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া বিপদও আছে বইকি!

বাঘিনী কি ভেবেছে সেই জানে। খুশি কয়েকঘণ্টা আগেই জানতে পেরেছে, বাঘিনী কুমারিত্ব বহুদিন হোলো খুইয়েছে, সে-ই তার জীবনের প্রথম পুরুষ নয়। অথচ তার উপরে কি ভক্তিই না ছিল, কোনোদিন তার সম্বন্ধে কানাঘুষোও কিছু সে শোনেনি। সকলের সঙ্গেই বাঘিনী সহজভাবে মিশেছে। কেউ যদি তাকে গালাগালি দিয়েছে, সে নষ্ট মেয়ে বলে নয়, কড়া মনিব বলেই দিয়েছে। সত্যি, ওর সম্বন্ধে এমন ধারণাও কেউ করেনি। কিন্তু কাল রাতে কেন এমন হোলো?

কালকের রাতের ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে। খুশির কেমন সন্দেহ হয়েছে, হয়তো ভুলই সে করছে। কিন্তু মেয়েটা তো জানতো, সে অন্য জায়গায় চাকরী করছে। তাহলে ওর জন্যই বসে ছিল—একথা বলার মানে কি? ধর, এমনও তো হতে পারে, যে-কোনো লোকের জন্য বসেছিল—যে-কেউ হলেই ওর চলত। খুশি মাথায় হাত দিয়ে বসে অনেকক্ষণ ভাবল। গাঁ থেকে সে এসেছে, এখন পর্যন্ত যদিও বিয়ের কথা সে ভাববার ফুরসৎ পায়নি, তবু মনে মনে একটা আঁচ করে রেখেছে। ধর, যদি সে রিক্সা কিনে অবস্থাটা ফেরাতে পারে, তাহলে গ্রামে গিয়ে একটি সুন্দরী অল্পবয়সী কুমারী মেয়েকে বিয়ে করবে। সে মেয়ে দুঃখের জীবনে হবে সাথী, কাপড় কাচবে, ঘর গৃহস্থালীর কাজ করবে।

তার বয়েসী ছেলেরা তো হামেসাই 'সাদা বাড়িতে' হানা দিচ্ছে, কিন্তু খুশি কখনো

সেখানে যায়নি। প্রথমত সে তার অবস্থার উন্নতি করতে চায়, পয়সা নিয়ে যে সব মেয়ে তাদের দেহ বিক্রি করে, তাদের কাছে গিয়ে পয়সা ওড়াতে সে রাজি নয়। দ্বিতীয়ত উনিশ কুড়ি বছরের যেসব ছোকরা ওদের কাছে যায় তাদের অবস্থা সে দেখেছে। প্রস্রাব ক রতে গিয়ে কি কষ্ট! তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও আছে। সে বিয়ে করলে কুমারী মেয়েকেই বিয়ে করবে, অনাচার করলে তার সুমুখে সে দাঁড়াবে কি করে? তাই তার মন কখনো টলেনি।

কিন্তু এখন···এখন···বাঘিনী বন্ধু হিসেবে বেশ মেয়ে। কিন্তু বৌ হিসেবে বড়ই বে-মানান। একে তো কুৎসিত, তার উপরে মেজাজে খাণ্ডারনী। কাউকে রেহাই দেয় না।. যারা সুন্দর রিক্সাখানা কেড়ে নিয়ে গেছে, সেই বেজন্মা সৈন্যদের সঙ্গে বরং মিতালী করতে রাজী আছে, কিন্তু বাঘিনীকে বিয়ে করতে সে নারাজ। গ্রাম থেকে সে এসেছিল নিষ্পাপ, তার দেহে বাঘিনী আজ কলঙ্কের ছাপ মেরে দিয়েছে।

আরো একটা কথা: যদি ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে আর কর্তা লিউ-এর কানে যায়? সেতো আর জানে না, তার মেয়ে.বহুদিন থেকেই নষ্ট হয়ে আছে। তখন তো খুশির উপরে এসেই সব চাপ পড়বে! তখন তো লজ্জায় কালি-পড়া হাঁড়ির মতোই হবে তার অবস্থা। ধর, যদি এমন হয় যে, কর্তা তার মেয়ের ব্যাপার সব জেনে শুনেও তাকে শাসন করেননি, তাহলে কি হবে? বাবা আর মেয়ের শত ইচ্ছে থাকলেও অমন মেয়েকে সে বিয়ে করতে পারে না—তা বুড়ো লিউ-এর ছটা রিক্সাই থাক আর দুহাজার রিক্সাই থাক।

তার চাইতে মানবমিলন থেকে চলে গেলেই ভালো হয়, এক কোপে ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ সে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তার নিজের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, একখানা রিক্সা কেনা আর বিয়ে করার জন্য কারো উপর তাকে নির্ভর করতে হবে না। আর সেইখানেই তো তার আত্মসম্মান। খাঁটি লোক সে, কাউকে ডরায় না, তার কোনো ভাবনা চিন্তাও নেই। সে জানে, কাজ করে গেলে সে একদিন জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবেই।

কিন্তু বাঘিনী? যতোই খুশি তাকে ঘৃণা করুক, বাঘিনী তার থাবার দাগ রেখে গেছে। তার কথা সে ভাবতে চায় না, তবু তার কথাই বার বার মনে পড়ে। তার কুৎসিত রূপ নিয়ে নির্লজ্জ উলঙ্গতায় সে দেখা দেয়। মাঝে মাঝে তার হৃদয়ের কোমলতার কথাও তার মনে পড়ে।

একরাশ ভাঙা লোহার টুকরো যেন নিলামে চড়েছে! ভাঙা মরচে-ধরা তামা আর লোহার ভিড়ে দু-একটা উজ্জ্বল টুকরোর সন্ধান মিলেছে, না কিনে চলে যেতে তোমার ইচ্ছে হচ্ছে না। এর আগে সে কারো সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও

সে প্রতারিত হয়েছে, প্রলুব্ধ হয়েছে, তবু এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, অত সহজে তো তাকে ভুলে যাওয়া যায় না। তুমি যদি সে সম্পর্ক দূরে সরিয়ে রাখতে চাও, তোমার মন ছাড়বে কেন? সে দুলে উঠবে, টলিয়ে দেবে তোমার প্রতিজ্ঞা, ভাসিয়ে দেবে তোমার দৃঢ়তা। সম্পর্ক যে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে। এতো শুধু অভিজ্ঞতা নয়, এ যেন আরো কিছু—সব গোলমাল করে দিয়ে যায়, নিজের উপর মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। খুশিরও তাই হোলো। সে বুঝতে পারল না, কি সে করবে, কিন্তু পোকা যেমন করে মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ে তেমনি করে জড়িয়ে পড়ল। নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল, পারল না। সে সময় চলে গেছে।

কয়েকটা সোয়ারি সে পেল। জোরে সে ছুটল বটে, কিন্তু তখন মনে তোলপাড় উঠছে। ধোঁয়াটে চিন্তা—কোনো আকার নেই, নেই আদি আর অন্ত...শুধু অস্পষ্ট চিন্তা জমে উঠছে, মাঝে মাঝে পরিচিত ক্ষীণ স্বাদ আর গন্ধের রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে; কখন বা ভুস্ করে ভেসে উঠছে এলোমেলো ছেঁড়া খোঁড়া ভাবনা। অস্পষ্ট হলে কি হবে, নিষ্ঠুর বাস্তবের তীক্ষ্ণতা নিয়েই দেখা দিচ্ছে। তার ইচ্ছে হোলো কোথাও গিয়ে সে বোতলের পর বোতল শেষ করে দেয়, তাহলে আর সে কাউকে চিনতে পারবে না, কিছু মনে করতে পারবে না। হয়তো সে শান্তি পাবে। নইলে এ-জ্বালা যে আর সহ্য হয় না।

কিন্তু মদ খেতে সে সাহস করল না। ব্যাপারটা ঘটেছে বলেই কি এমন করে নিজের সর্বনাশ করতে হবে? এখনও রিক্সা কেনা বাকি। যদিও রিক্সার চিন্তার জায়গায় অন্য চিন্তা এসে জুড়ে বসেছে, তবুও রিক্সার কথা সে ভুলতে পারছে না। যে-রিক্সা সে কিনবে, তার ছবি আছে তার মনে—কালো মেঘ যেমন করে সূর্যকে ঢেকে দেয়, তেমনি করে এই চিন্তা তার মানস-রিক্সাকে ঢেকে দিচ্ছে।

সন্ধ্যে হয়ে এল, এবার আড্ডায় ফিরতে হবে। খুশির মনটা বিগড়ে গেল। আড্ডায় যেতে সে ভয় পাচ্ছে। তার সঙ্গে দেখা হলে কি হবে? খুশি শূন্য রিক্সা নিয়ে আনমনে পথে পথে ঘুরে বেড়াল। দু-তিনবার রিক্সার আড্ডার কাছে এসে সে আবার ফিরে গেল। এ যেন ছোট্ট ছেলে প্রথম স্কুল পালিয়ে বাড়ি ঢুকতে ভয় পাচ্ছে।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যতই সে বাঘিনীকে এড়াবার কথা ভাবল, ততই তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল। সন্ধ্যের আঁধার গাঢ় হয়ে এল, এবার দেখা হোক না, ক্ষতি কি? আর একবার...খুশি বুঝতে পারল, ভাবনা তার বিপথে চলেছে, কিন্তু চলুক। যখন সে ছোট ছিল, বোলতার চাকে লাঠি দিয়ে কত দিন সে খোঁচা মেরেছে! ভয় হোতো বইকি! কিন্তু খোঁচা মারবার আগে বুকটা

দুলে উঠত, চঞ্চল হয়ে উঠত—এও ঠিক তেমনি। কোন এক অপদেবতা তাকে যেন ঠেলে দিচ্ছে, সে কি করবে? প্রচণ্ড এক শক্তি তাকে যেন দলে চটকে একটা তাল বানিয়ে ফেলেছে, এবার শীগ্‌গিরই আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এমন শক্তি তার নেই।

সে বাঁক ঘুরল। দেরি করে কি হবে। সোজা সে গিয়ে অফিসে হাজির হবে, তাকে টেনে হিঁচড়ে আনবে ঘরে। এমন কেউ-কেটা কেউ নয়, একটা সামান্য মেয়ে। তার সারাদেহ গরম হয়ে উঠল। সে ছুটে চলল। এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, চল্লিশের উপর তার বয়স হবে। খুশি তাকে দেখেই চিনতে পারল কিন্তু কথা বলতে সাহস হোলো না। শুধু বলল, কত্তা, রিক্সা চাই?

ভদ্র লোকটি হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে, খুশি নয়?

হাঁ কত্তা, খুশি হাসল। আমি।

ভদ্রলোকটির নাম চাও।

তিনি হেসে বললেন, কোথাও যদি মাস মাইনের কাজ না নিয়ে থাক, আমার ওখানেই চলে এস না? এখন যে লোকটা আছে, একেবারে কুড়ের বেহদ্দ! রিক্সা ঘসা মাজা করে না, তবে ছোটে খুব জোরে। দেখ, আসবে নাকি?

কি বলছেন কত্তা। আপনি ডাকলে আমি না বলব? খুশি ছোট্ট তোয়ালেখানা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল। কবে আসব কত্তা?

চাও একটু ভেবে বললেন, পরশু এসো।

যে আজ্ঞে। কত্তা, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

না, দরকার হবে না। তোমার মনে আছে তো, আমি সাঙ্‌হাই চলে গিছলাম? ফিরে এসে বাসা বদলেছি। এখন আছি লঙ্‌ নর্থ স্ট্রীটে, রোজই সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেরুই, আজও বেরিয়েছি। এইটুকু পথ হেঁটেই চলে যাব। তাহলে পরশুই আসছ তো? চাও তাকে বাসার নম্বর বলে দিলেন। আমার নিজের রিক্সাই চালাবে, ভাড়া করতে হবে না।

চাও চলে গেলেন, খুশির এত আনন্দ হোলো, মনে হোলো তার যেন ডানা গজিয়েছে, উড়ে যেতে চাইছে সে। কদিনের দুশ্চিন্তা একেবারে উবে গেল।—প্রবল বৃষ্টিধারায় যেন ধুলো আর আবর্জনা ধুয়ে মুছে গেছে, মারবেল বাঁধান সড়কের সাদা পাথর দেখা দিয়েছে। শ্রীযুক্ত চাও তার পুরনো মনিব, এতদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি বটে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি টানটুকু ঠিকই আছে। চাও খুব চমৎকার লোক, তাছাড়া পরিবারও বড় নয়, স্ত্রী আর একটি বাচ্চা ছেলে।

খুশি রিক্সা নিয়ে একছুটে মানবমিলনে পৌছল। চারদিক অন্ধকার, শুধু বাঘিনীর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। সে থমকে দাঁড়াল, বহুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল।

কি সে করবে। অনেক ভেবে ভেবে সে ঠিক করল—হাঁ, বাঘিনীর সঙ্গে সে দেখা করবে। দেখা করে মাস-মাইনের চাকরী পাওয়ার কথা বলবে, আর জমানো টাকা চেয়ে নেবে। আর এই দুদিনের রোজগার অবিশ্যি তাকে সে দিয়ে আসবে তারপর সব শেষ—এ যেন ধারালো ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে দুভাগ করে দেওয়া হোলো, এক ভাগের সঙ্গে আর এক ভাগের কোনো সম্পর্কই রইল না। অবিশ্যি মুখ ফুটে সব কথা সে বলতে পারবে না, কিন্তু বাঘিনী চালাক মেয়ে। ঠিক বুঝতে পারবে।

শেডে রিক্সা রেখে খুশি বেরিয়ে এল। বাঘিনীর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে, জানলা দিয়ে উঠোনে এসে পড়ছে। সাহসে ভর করে সে ডাকল।

এস, ভিতরে এস!

দরজা ঠেলে ভিতরে সে ঢুকে পড়ল। বিছানায় শুয়ে আছে বাঘিনী, পরনে সাদাসিধে জামা, পায়ে জুতা নেই। বাঘিনী ওকে দেখে উঠে বসল না, তেমনি শুয়েই রইল।

কি গো ক্ষুদে খোকা? আরো মধু খাবার ইচ্ছে আছে নাকি? কেমন লাগল আমার মধু—খুব ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই?

খুশির মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, সে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না, তারপর আমতা আমতা করে বলল, চাকরী পেয়েছি, পরশু যেতে হবে, ওদের নিজেদের রিক্সা আছে।

বাঘিনী বিছানায় উঠে বসল। বোকা ছেলে কোথাকার! নিজের ভালো বুঝতে চায় না। খাবার দেব, ভালো কাপড়-চোপড় দেব পরতে, তবু মন উঠল না। ঘামের গন্ধ এত ভালো লাগে? শোন না, বুড়োর সাধ্যি কি আমাকে কিছু বলে। আর আমিই কি আজীবন বিধবা হয়েই থাকব নাকি! আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ নেই! বুড়ো যদি ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে হয়ে বাধা দেয়, তাতেই বা কি এমন হবে। আমার হাতে যা পয়সা আছে, দুজনের বেশ চলে যাবে। দুতিনখানা রিক্সা কিনে ভাড়া দেব। আশী সেন্ট, কি একডলার তো রোজ ভাড়াই পাব।—সারাদিন রিক্সা টেনে টেনে হয়রান হবার চাইতে তা ভালো নয়? কি, মুখে রা নেই যে? কেন, আমাকে বুঝি পছন্দ হয় না? অপছন্দের কি আছে—শুধু একটু যা তোমার চাইতে বয়েস বেশি। কিন্তু বিয়ে হলে কি আর এমনি বুড়ি থাকব? তাছাড়া তোমার ঘটে একরত্তি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। আমি না চালালে, কে তোমাকে চালাবে বল? কি গো ক্ষুদে খোকা, বল, চুপ করে রইলে যে?

আমি রিক্সাওয়ালা হতে চাই, তার বেশি কিছু আমি চাই না।

একফোটা বুদ্ধি তো নেই, মগজ না যেন এক কাঁই ময়দা। বোস না একটু।

তোমাকে তো আর কামড়ে দেব না। বাঘিনী হাসল, হাসলে দুটো দাঁত বেরিয়ে পড়ে—ঠিক নেকড়ের দাঁতের মত দুটো দাঁত।

খুশি ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। আমার জমানো টাকাটা ?

সে তো বুড়োর কাছে। ভয় নেই—সে-টাকা মারা যাবে না। এখন চাইতে যেও না, তার মেজাজ তো জান! যখন রিক্সা কেনবার মত টাকা হবে, তখন চেও। তামার পয়সাটি পর্যন্ত হিসেব করে ফেরৎ দেবে। এখন চাইলে গালাগাল দিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে। তোমার উপর কিন্তু বুড়ো খুব খুশি। ভয় নেই, টাকা মারা যাবে না। গেঁয়ো লোক আর কতই বা হবে!

খুশি মাথা নিচু করে বসে রইল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, দুদিনের রিক্সা ভাড়ার টাকা রয়েছে, কথায় কথায় দেওয়া হয়নি। সে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাড়াটা টেবিলের উপর রাখল।

এই দুদিনের ভাড়া। সে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, আবার কি মনে করে ফিরে এসে বলল, কাল আর আমি রিক্সা নেব না, কালকের দিনটা জিড়িয়ে নেব।

বাঘিনী তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভাড়ার টাকাটা খুশির পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, দুদিনের জন্য রিক্সা আর আমি, দুজনকেই মুফত পেলে, কোনোটারই ভাড়া দিতে হবে না। তোমার বরাত ফিরুক। ক্ষুদে খোকা আমার।

বাঘিনী দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সাত

খুশি চাও-পরিবারে কাজে লেগে গেল। বাঘিনীর ব্যাপারটা নিয়ে সে মনে মনে একটু লজ্জাও পেয়েছে। কিন্তু বাঘিনীই তো ফুসলিয়ে এই কাণ্ড বাধিয়েছে, ওর দোষ কি? তার টাকার উপর ওর লোভ নেই, সুতরাং এমন কিছু ঘটেনি যাতে তার মুখের দিকে তাকাতে ও লজ্জা পাবে। কিন্তু ন'কর্তার কাছে টাকা যে রয়ে গেল। অবশ্য এখন চাইতে পারে, কিন্তু ন'কর্তা যদি সন্দেহ করেন? এক হয়, কিছু দিন ডুব মেরে থাকা। কিন্তু তাতেও বিপদ আছে। যাওয়া আসা না করলে বাঘিনী যা মেয়ে, একদিন হয়তো ক্ষেপে গিয়ে ন'কর্তাকে সব বলে দেবে —তারপর? টাকা পাবার আশাই আর থাকবে না। ঝোলে যেমন সয়াবীন গলে যায়, তেমনি গলে যাবে টাকাগুলো। বুড়োর কাছে আরো টাকা রাখলে কেমন হয়? কিন্তু সেখানে বাঘিনী আছে, রোজ তার সঙ্গে দেখা হবে একথা ও ভাবতেই পারে না। এমনি ভেবে ভেবে খুশি অস্থির হয়ে উঠল।

শ্রীযুক্ত চাওকে ব্যাপারটা জানালে কেমন হয়? কিন্তু খুলে বলাও তো মুস্কিল। বাঘিনীর ব্যাপারটা কাউকেই সে বলতে পারবে না। এমন কি মনে মনেও সে যখন ভাবে, শিউরে উঠে। অন্যায় সে করে ফেলেছে, অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। তখন তো মনে হয়েছিল ধারাল ছুরি দিয়ে এক চোপে দড়ি কাটার মতোই সম্বন্ধ সে ছিন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু দড়ি কাটবার মতো সহজ ব্যাপার এটা নয়। অত সহজে ধুয়ে মুছে যায় না। মাংসের ভিতরে পচানধরা ক্ষতের মতোই জ্বলতে থাকে। রিক্সা সে হারিয়েছে, আর একখানা রিক্সা হবে, কিন্তু একি জালে সে জড়িয়ে পড়ল? এতদিন ধরে নিজের উন্নতি করতেই সে চেয়েছিল, কিন্তু কি তার পরিণাম হোলো? এ এক নিস্ফলা অভিযান, যেখানে সে ছিল ঘুরতে ঘুরতে সেইখানেই সে এসে পড়েছে, মনের উপর চেপেছে জগদ্দল পাথর।

অনেক ভাবল খুশি, একটার পর একটা উপায়—কিন্তু একটা পথই সে খুঁজে পেল। আত্মসম্মান যেটুকু ছিল, খুইয়ে বাঘিনীর কাছে বিয়ের প্রস্তাবই তাকে পাঠাতে হবে—তার টাকায় খান দু-তিনেক রিক্সা কিনে জাঁকিয়ে বসবে। যদি জাতই দিতে হয়, পেট ভরাবার চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু তার মন সায় দিল না। সময়ে হয়তো সায় দেবে। সে এখন ও-চিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে কাজ করে যাবে, তার পর যদি ভাগ্য মন্দ হয়, লটকে পড়তেই হবে। তার নিজের

উপরে আস্থাও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। তার শক্তি, লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা, চওড়া বুক—কোনো কাজেই এল না। একদিন জীবন ছিল তার নিজস্ব, এখন আর একজনের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়েছে। একটা মাদী কুত্তা তাকে নিয়ে খেলাচ্ছে। খুশি উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার মন বিষাক্ত হয়ে গেল।

এমন পরিবারে চাকরী পাওয়া ভাগ্যের কথা। মাইনে অন্যান্য জায়গার চাইতে বেশি নয়; পাল-পার্বন ছাড়া দস্তরীও মেলে না; কিন্তু মনিব আর তার স্ত্রী তাকে খুবই ভালোবাসেন। শুধু সে কেন, সবার সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করেন, মানুষ বলে গণ্য করেন। খুশি টাকা চায়, তার জীবনে অন্য কোনো কামনা নেই, কিন্তু তবু ঘুমোবার জন্য এমন 'একটা জায়গা' তার চাই—যেখানে ঘর বলে তার মনে হবে। পেটভরে তাকে খেতেও হবে। চাও-পরিবারের বাড়িখানি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। এমনকি চাকরদের ঘরগুলিতেও একটু ধুলো বা আবর্জনা জমতে পায় না। খাওয়াও ভালো—পেট পুরে খেতে পাবে। নিজেরা ভালো খেয়ে চাকরদের জন্য পচা খাবার তারা দেন না।

এইতো সে নিজেই একটা ঘর পেয়েছে; খাওয়া-দাওয়াও বেশ ভালোই হচ্ছে। মনিব তো চমৎকার লোক! এমন যে খুশি, টাকা ছাড়া যার অন্য চিন্তা নেই, সেও মনিবের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

আর একটা কথা, খাওয়া আর থাকার জায়গা যদি ভালো পাওয়া যায় তখন কাজের ক্লান্তি লাগে না। নিজের পুঁজি ভেঙে খেতে হলে কি আর এত ভালো খেতে পারত? এখন খাবার তৈরি থাকে; কাজও বেশি নয়, ছুটতে ছুটতে কোমরে ব্যথা ধরে যায় না। পুঁজি ভাঙিয়ে খেতে হয় না বলেই বেশি করে সে খায়। খাবে না কেন? এমন ভালো খাওয়ার সুযোগ মেলাই তো ভার!

চাও-পরিবারে মেচিয়াং খেলার রেওয়াজ নেই, অতিথিও বড় একটা আসে না। তাই উপরি পাওনাটা এখানে খুবই কম। কিন্তু বিশেষ কোনো কাজে পাঠালে দশ-বিশ সেণ্ট সে পায়। মনিবানী হয়তো ডাক্তারখানায় খোকার জন্য কুইনিনের বড়ি আনতে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে আরো দশ সেণ্ট দিয়ে বললেন, রিক্সা করে গিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে এস। তিনি জানেন, সে রিক্সা করে কখনো যাবে না। ওটা বকশিশেরই সামিল। এমনি বকশিশ সে মাঝে মাঝে পায়। খুব বেশি নয়, তবু মনিব আর মনিবানীর মনের পরিচয় তো এই বকশিশ। সে বুঝতে পারে—তারা তার সম্বন্ধে ভাবেন, তাকে মানুষ বলে মনে করেন। তাতে উপকারও যে না হয়েছে তা নয়। মনের এতদিনকার বন্ধ দরজাটা খুলে গেছে, আসছে আলোর জোয়ার।

একটা দুটো নয়, বহু মনিবই সে দেখেছে। তাদের দশজনের ভিতরে

'জন একদিন দেরি করে মাইনে দিতে পারলে বেঁচে যায়—মোটে না দিতে লে তারা খুশিই হয়। চাকরতো তাদের কাছে বেড়াল কুকুরের সামিল—বোধ হয় তাদের থেকেও নিকৃষ্ট জীব।

চাও-পরিবারে কিন্তু এ-রীতি নেই। তাই তার ভালো লাগল। সে উঠোন নিকোনো, ফুলগাছে জল দেওয়া, আরো টুকিটাকি কাজ করে, কিন্তু তাকে কেউ এসব কাজ করতে ফরমায়েস করেনি। যখনই তারা এসব কাজ করতে দেখেন, প্রশংসা করেন, ছেড়া জামা-কাপড় তাকে দেন, সে তার বদলে দু-এক বাক্স দেশলাই পেতে পারে। তারা জানেন, ওগুলোর বদলে সে দেশলাই নেবে না, নিজেই ব্যবহার করবে। খুশি এদের ব্যবহারে মানুষের দয়ামায়ার খোঁজ পেল।

ন'কর্তা লিউকে দেখে তার মনে হয়, সেই পুরনো হান রাজত্বের অত্যাচারী ডাকাত সর্দার—চাখানায় সে এসব গল্প কত শুনেছে—একরত্তি একটা ছেলে পর্যন্ত ও গল্প জানে। ডাকাত সর্দার হলে কি হবে, খুব মায়া দয়া ছিল তার। আর একজনের উপরও তার খুব ভক্তি। তিনি ঋষি কনফ্যুসি। তাঁর সম্বন্ধে বহু গল্প সে শুনেছে, কিন্তু কেমন লোক তিনি ছিলেন, সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। কাগজের উপর কালি দিয়ে হরপ তিনি লিখতে পারতেন, তা ছাড়া খুব বুঝদার লোকও ছিলেন তিনি। খুশি বহু বাড়িতে চাকরি করেছে, কেউ বা সেনা বিভাগে কাজ করেন, কেউ বা কলম পিষে খান। সেনা বিভাগের লোকের ভিতরে ন'কর্তার মতো না হোক, কাছাকাছি যায় এমন লোক সে দেখতে পেয়েছে; কিন্তু কলেজের অধ্যাপক কি সরকারী অফিসের কেরানীদের মধ্যে ভালো লোক সে দেখেনি। তারা হরফ ফাঁদতে পারেন বটে কিন্তু বুঝদার নন মোটেও। মনিব যদিও বা একটু আধটু চাকরদের দুঃখ বুঝতে চান, কিন্তু মনিবানী আর তার মেয়ে একেবারে অবুঝ।

কিন্তু শ্রীযুক্ত চাও সেদিক দিয়ে চমৎকার লোক! অত লেখাপড়া জানেন, অথচ মস্ত বুঝদার। শ্রীমতী চাও-এর স্বভাবটিও নিখুঁত। একটা কড়া কথা কন না। তার মনে হোলো, এতদিনে তাহলে ঋষি কনফ্যুসির মতো লোক খুঁজে পেয়েছে। কনফ্যুসি কেমন দেখতে ছিলেন সে জানে না, কিন্তু কনফ্যুসির কথা মনে পড়লেই শ্রীযুক্ত চাও-এর চেহারা চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। খুশি তাইই মনে করে, ঋষি তাতে আপত্তি করলেও ক্ষতি নেই।

আসলে শ্রীযুক্ত চাও ঋষি-পর্যায়ে ওঠবার মতো লোক নন। সাধারণ সাদাসিধে মানুষ, স্কুল-মাষ্টারি থেকে শুরু করে জীবনে বহু কাজই তিনি করেছেন। নিজেকে সোশালিস্ট এবং কলাবিদ মনে করেন। তিনি উইলিয়াম মরিস নামে একজন ইংরেজের লেখা একটু-আধটু পড়েছেন, এবং তারই প্রভাব পড়েছে তার উপর।

সরকার বা শিল্পী সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান তার নেই বটে, কিন্তু যেটুকু বোঝেন, সেটুকু তিনি কাজে খাটাতে চেষ্টা করেন। তিনি জানেন, লোককে চমকে দেওয়ার মতো ক্ষমতা তার নেই, স্বর্গ মর্ত কাঁপিয়ে দিতে তিনি পারবেন না। কিন্তু সোশালিজম্ বা শিল্পের মূল সূত্রগুলি নিজের জীবনে তো পরখ করে দেখতে পারেন। আর সেই চেষ্টাই তিনি করছেন। সমাজব্যবস্থায় তাতে অবশ্য কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি, কিন্তু তাঁর উপকার হয়েছে। তিনি যখন যেমন, তখন তেমন বলেন না; ভণ্ডামি থেকেও তিনি রেহাই পেয়েছেন। এই জন্য ছোটখাটো ব্যাপারেও তিনি উদাসীন নন। তিনি মনে করেন, নিজের পরিবারের পরিবর্তন তো তিনি এনেছেন, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সাধ্য তার নেই, মাঝে মাঝে লজ্জিতও হন। কিন্তু আত্ম-প্রসাদও তার কম নয়। চারদিকে বালির সমুদ্র ধূধূ করছে। তাঁরই মাঝে তার এই সবুজ পাতা ঢাকা দ্বীপ—যে সে-দ্বীপে এসে আশ্রয় নেবে, তাকে তিনি দেবেন পানীয়, তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন—কিন্তু তার বেশি তাঁর সাধ্য নেই।

ভাগ্যক্রমে খুশি এই শ্যামল দ্বীপে এসে ঠিকরে পড়েছে; এতদিন মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে সে হয়রান হয়ে গিছল, এবার সে পেয়েছে আশ্রয়। এ এক পরম আশ্চর্য তার কাছে। শ্রীযুক্ত চাও-এর মত লোক সে দেখেনি। তাই কনফ্যুসি বলে গ্রহণ করতেও তার বাধেনি। হয়তো তার অভিজ্ঞতা নেই, নয়তো চাও-এর মতো লোকও পৃথিবীতে বিরল বলেই তার একথা মনে হয়েছে। যখন সে তাকে রিক্সায় নিয়ে যায় তখন সে বার বার তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। পরিষ্কার ধবধবে পোশাক, একটু আড়ম্বর নেই। সৌম্য, প্রশান্ত মুখ। এমন লোককে সোয়ারি করেও সুখ আছে বইকি। মনে গর্বই হয়।

বাড়িতে এক কণা ধুলো বা জঞ্জাল জমতে পায় না। একটু হল্লা-হুল্লোড় নেই, চারদিকে কেমন একটা শান্তির ছোঁয়াচ। খুশির মনেও তার ছোঁয়া লেগেছে। গ্রামে থাকতে সে হৈমন্তের সন্ধ্যায় বসে বসে চুপ করে বুড়োদের তামাক টানতে দেখেছে, সে তখন একেবারে ছোট। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে, ওদের মতো চুপটি করে বসে তামাক টানে। হয়তো ওরই ভিতরে লুকিয়ে আছে শান্তি। এখন সে শহরে এসেছে বটে, কিন্তু চাও-পরিবার দেখে গ্রামের কথাই বার বার তার মনে পড়ছে। একটা পাইপ পেলে সেও নিরালায় বসে তামাক টানবে, শান্তি পাবে।

কিন্তু শান্তি কোথায়? বাঘিনী আর লিউ-এর কাছে গচ্ছিত টাকা তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তার মন যেন একটা সতেজ সবুজ পাতা—গুটি পোকা তাকে সূক্ষ্ম রেশমের সুতার জালে ঘিরে ধরেছে। না, লিউ পরিবার তাকে সুখে শান্তিতে থাকতে দেবে না। কেমন আনমনা হয়ে গেছে। অন্য লোক দূরে থাক, মনিবের প্রশ্নেরই সে অসংলগ্ন জবাব দেয়। মনে মনে লজ্জিতও হয়।

চাও-পরিবারের সবাই রাত নটায় ঘুমিয়ে পড়ে। খুশি বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে।

কখনো কখনো তার মনে হয়, বিয়ে করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়, বাঘিনীর চিন্তা আর তাকে হানা দিতে পারবে না। কিন্তু রিক্সাওয়ালার রোজগারে সে কি বিয়ে করে চালাতে পারবে? সে তো তার বিবাহিত সঙ্গীদের অবস্থা জানে। বস্তিতে তারা থাকে। পুরুষরা রিক্সা চালায় আর মেয়েরা নানা কাজ করে। ছেলেপুলেরা রাস্তায় খেলা করে, লুটোপুটি খায়। গ্রীষ্মে ডাস্টবীন থেকে তরমুজের খোলা তুলে নিয়ে চিবোয়, শীতকালে অন্নসত্রে গিয়ে ফেনাভাত খায়। এই তো তাদের জীবন! খুশি সে জীবন চায় না, সত্যিই চায় না।

তার পর বিয়েই না হয় সে করল, ন'কর্তা তখন যদি টাকা না দেন। বাঘিনী তখন তো টাকা আদায় করে দিতে চেষ্টা করবে না। তার হকের টাকা সে ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

এক বছর আগে, হেমন্তে সে রিক্সা কিনেছিল। একবছর চলে গেছে, আজ তার কোনো সম্বলই নেই: শুধু তিরিশটা ডলার আছে, কিন্তু তাও ফিরে পাবার উপায় নেই। খুশি ভেবে ভেবে কেমন মুষড়ে পড়ল।

হৈমন্তিক উৎসবের আর দশদিন বাকি। শীত পড়তে শুরু করেছে। খুশি খতিয়ে দেখল, কিছু শীত-কাপড় কিনতে হবে। টাকার দরকার। শীত-কাপড় কিনলে কিছুই জমবে না—রিক্সা কেনাও হবে না। তারপর এমনিধারা মাস-মাইনের কাজ করলেই তো চলবে না। জীবনটাই এমনি করে কেটে যাবে যে!

সেদিন একটু রাত করেই শ্রীযুক্ত চাওকে নিয়ে 'স্বর্গের শান্তি'র ফটকের ভিতর দিয়ে খুশি বাড়ি ফিরছিল। সোজা চওড়া সড়ক—লোকজন নেই। গলি ঘুঁজির খানা-খন্দ এড়াবার জন্যেই সে এই রাস্তায় এসেছে। হাওয়া বইছে, শীতের আমেজ হাওয়ায়। পথে পথে স্নিগ্ধ আলোর সার। খুশি যেন কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করল, হালকা হয়ে গেল তার মন। সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কামিজের বোতাম সে খুলে দিল। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বুকে বিঁধছে, সিড় সিড় করে উঠছে বুক, কেমন একটা আনন্দে দুলে দুলে উঠছে মন। পায়ের শব্দ, রিক্সার টুং টাং সঙ্গত করছে তারই সঙ্গে। তার মনে হোলো, এমনি করে সে অনন্তকাল ধরে ছুটতে পারে। এমনি সোজা সড়ক দিয়ে ছুটতে ছুটতে রাতের আঁধার পার হয়ে সে চলে যাবে এক অজানা দেশে। মৃত্যুরই সে দেশ। কিন্তু তাকে সে ভয় পাবে না, তার রহস্যের কুয়াশা তখন কেটে যাবে—দেখা দেবে মৃত্যুর সত্য স্বরূপ।

জোরে, আরো জোরে সে ছুটে চলল। সুমুখে রিক্সা চলেছে, সে হাঁক দিয়ে

সরে পথ করে দিতে বলছে। কিছুক্ষণের ভিতরেই খুশি 'স্বর্গের শান্তি' ফটকে এসে পৌঁছল। পায়ে যেন সে ইস্পাতের স্প্রিং মুড়ে নিয়েছে; পা মাটিতে পড়তেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে; রিক্সার চাকা এত জোরে ঘুরছে, দেখাই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, সোয়ারি শুদ্ধু রিক্সা আর রিক্সাওয়ালাকে কোনো এক জীন যেন শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ছুটতে ছুটতে খুশি ভাবল, ঘামে শরীর ভিজে জবজবে হয়ে উঠলে সে আজ রাতে ভাল করে ঘুমতে পারবে। দুশ্চিন্তা হানা দেবে না। গতি সে বাড়িয়ে দিল।

লঙ্ নর্থ স্ট্রীটের কাছে তারা এসে পড়ল। এবার বাঁক ঘুরতে হবে, গাছপালায় চারদিক অন্ধকার। খুশি রিক্সার গতি কমিয়ে আনবার জন্য পা ফেলতে যাবে, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল। তার পা যেন কিসের উপর পড়ল। সে পিছলে পথের কাঁকরের উপর পড়ে গেল। শুনতে পেল, রিক্সার কি যেন মটমট করে ভাঙছে।

কি, কি হোলো? শ্রীযুক্ত-চাও চেঁচিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ছিটকে এসে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। খুশি উঠে দাঁড়াল এবার। শ্রীযুক্ত চাও উঠে বসলেন।

কি, হোলো কি?

খুশি পিছন ফিরে তাকাল। রাস্তার ধারে কতকগুলো পাথর স্তূপ করা রয়েছে, রাস্তা মেরামত হবে। কিন্তু লাল আলো জ্বালিয়ে না রেখেই এই বিপত্তি বাঁধিয়েছে। কত্তা, খুব লেগেছে বুঝি? খুশি জিজ্ঞেস করল।

না। আমি হেঁটেই ফিরব। তুমি রিক্সা নিয়ে পরে এস। শ্রীযুক্ত চাও ঠিকই আছেন। তিনি পকেট থেকে কিছু পড়েছে কিনা দেখে নিলেন।

খুশি রিক্সার ভাঙা জায়গাটায় হাত বুলিয়ে বলল, তেমন কিছু হয়নি। আপনি উঠে বসুন কত্তা, আমি টেনে নিয়ে যেতে পারব। পাথরের ভিতর থেকে সে রিক্সাখানা টেনে বার করল। আপনি উঠে বসুন কত্তা।

শ্রীযুক্ত চাও-এর রিক্সা চড়তে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তার মনে হোলো, খুশি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি আর আপত্তি করলেন না, উঠে বসলেন। তারা এবার লঙ্ নর্থ স্ট্রীটের মুখে এসে পড়ল। জোরাল ইলেকট্রিক আলোয় শ্রীযুক্ত চাও দেখলেন, তার বাঁ হাতটা ছড়ে গেছে।

খুশি, একটু রাখ।

খুশি ফিরে তাকাল। তার মুখ রক্তে ভরে গেছে।

শ্রীযুক্ত চাও চমকে উঠলেন, জলদি জলদি।

খুশির মনে হোলো মনিব বুঝি তাকে জোরে চালাতে হুকুম দিচ্ছেন। সে এক ছুটে বাড়ি এসে পৌঁছল।

রিক্সা নামিয়ে রেখে সে মনিবের হাতের রক্ত দেখতে পেল। তখনই সে ছুটল মনিবানীর কাছ থেকে ওষুধ আনতে।

শ্রীযুক্ত চাও তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমার জন্য ভেব না। নিজে ওষুধ লাগাও!

খুশি এবার নিজের দিকে তাকাবার ফুরসুৎ পেল। সারা গা ব্যথা করছে, হাঁটু আর কনুই ছড়ে গিয়ে মাংস বেরিয়ে পড়েছে। মুখে হাত দিয়ে দেখল, রক্ত ঝরছে। সে কিন্তু ভেবেছিল ঘাম। সে ঝুপ করে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। ফ্যাল ফ্যাল করে ভাঙা রিক্সাখানার দিকে তাকাল। কালো রং করা নতুন রিক্সাখানা ভেঙে গেছে, সাদা লোহা বেরিয়ে পড়েছে। খুব অন্যায় সে করেছে আর এখন বোকার মত তাকিয়ে আছে রিক্সাখানার দিকে।

খুশি! কাও-মা ডাকছে। চাও পরিবারের ঝি সে।

খুশি সাড়া দিল না।

খুশি! খুশি, কোথায় গেলে? ওমা কেমন ধারা লোক গা! মুখে রা নেই, এখানে লুকিয়ে আছে। ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আর কি! কত্তা ডাকছেন, যাও শুনে এস!

কাও-মার একটা বদ অভ্যাস, বেশি কথা বলে। কিন্তু বড় ভালো মানুষ। বছর বত্রিশেক বয়েস হবে। খুব চটপটেও বটে। অন্য কোথাও এমন লোক হয়তো বেশি দিন টিকতে পারত না, কিন্তু চাও পরিবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকের খুব কদর। তারা কাও-মার ছোটখাট দোষগুলোর দিকে নজরও দেন না। দুতিন বছর সে এখানে কাজ করছে। চাও পরিবার বাইরে কোথাও গেলে সেও তাদের সঙ্গেই যায়।

মনিব ডাকছেন যে! খুশি উঠে দাঁড়াল। কাও-মা তার রক্তমাখা মুখ দেখে চিৎকার করে উঠল; ওমা! কাণ্ড দেখ। এখানে ভূতের মত চুপ করে বসে আছ! এর উপরে ঠাণ্ডা লাগলে আর দেখতে হবে না। যাও, তাড়াতাড়ি যাও, কত্তার কাছে ওষুধ আছে, দেবেনখন।

খুশি কাও-মার পিছনে পিছনে লাইব্রেরী ঘরে এসে ঢুকল। এরই মধ্যে কাও-মা গালাগাল যা দেবার দিয়ে নিয়েছে। লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে সে দেখতে পেল, কর্ত্রী কর্তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন, খুশিকে দেখে কর্ত্রী চমকে উঠলেন।

দেখুন তো কি ভীষণ কেটে গেছে! কাও-মা কর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন। কর্ত্রী ঠাণ্ডা জল গামলায় ঢালতে ঢালতে বললেন, আগেই জানি একদিন এমনি ঘটবেই। রাস্তায় যখন ছোটে তখন ওর হুঁস থাকে না। তখন জ্যান্ত না মরা লোক বোঝাই দায়।

এ আর কি হয়েছে? ছুটতে ছুটতে একদিন রাস্তায় কি কাণ্ড হয় দেখো। ওমা, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে? তাড়াতাড়ি রক্ত ধুয়ে ফেল, ওষুধ লাগিয়ে দেবখন।

খুশি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লাইব্রেরী ঘরখানা একেবারে ঝকঝক করছে। কোথাও এতটুকু ধুলো নেই, আসবাবপত্র পরিপাটি করে সাজান। বইগুলো তাকে ঝলমল করছে। শুধু সেই একমাত্র বেমানান। ঢ্যাঙা চেহারা, ধুলো কাদা মাখা পোশাক, মুখ আর হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। সত্যিই তাকে এখানে মানায় না। এমন কি কাও-মাও সে কথা বুঝতে পেরেছে।

কত্তা, খুশি মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, কত্তা আপনি আর একজন লোক খুঁজে নিন। আমার একমাসের মাইনে দিয়ে রিক্সাখানা সারিয়ে নেবেন। বেশ জখম হয়েছে রিক্সাখানা, লম্পোর কাঁচখানা ভেঙে গেছে, চাকা দুখানাও গেছে।

ওসব কথা এখন থাক। আগে মুখ ধুয়ে ওষুধ লাগাও। ইস্, কিরকম রক্ত ঝরছে! সেদিকে খেয়াল নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবেখন। শ্রীযুক্ত চাও তার নিজের হাতখানার দিকে তাকালেন। তার স্ত্রী হাতখানা ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছেন।

যাও, যাও, মুখ ধুয়ে এস! হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাও-মা বলল।

খুশি তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ধোয়ার দরকার নেই, এখনই রক্ত থেমে যাবে। আর যে রিক্সাওয়ালা মনিবকে ফেলে দেয়, রিক্সা ভেঙে ফেলে, তার……খুশি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কথায় সে প্রকাশ করতে পারছে না, তার বুকের আবেগ কথাকে পিষে মারছে, কান্না হয়ে গলে গলে পড়ছে। চাকরীতে ইস্তফা আর এক মাসের মাইনে তার কাছে আত্মহত্যারই সামিল·কিন্তু আত্মসম্মান রক্ষা করতে হলে তাও করতে হবে বইকি! নিজের সম্মান খুইয়ে বেঁচে থাকতেও সে রাজি নয়।

অন্য লোক হলেও বা কথা ছিল, তার অমন মনিব শ্রীযুক্ত চাওকে সে ফেলে দিয়েছে—এ অপরাধের যে ক্ষমা নেই। ধর, সে যদি ইয়াঙ-গোষ্ঠীর বড় বউ-টাকে কাদায় ফেলে দিত! হাঁ, একটা কাজের মতো কাজ হোতো বটে! খুব জব্দ হোতো বেটি! বড় বৌকে সে দুচোখে দেখতে পারে না, কাদায় তাকে শুয়োরের মতো হুটোপুটি খেতে দেখলে ও হাততালি দিত, হাসত। কেনই বা হাসবে না, বড় বউটা তো তাকে আর মানুষ বলে গ্রাহ্য করত না! তার কাছে নম্র হয়ে লাভ কি? সেখানে টাকাটাই ছিল সব, আত্মসম্মানের কোনো কথাই উঠত না। ঠিকই হোতো।

কিন্তু, এখানকার ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। শ্রীযুক্ত চাও-এর মতো

মনিব হাজারে একজন মেলে কিনা সন্দেহ। আর মনিবের মতো তার ব্যবহারই নয়। কখন চোখ রাঙান না, একটা ধমক পর্যন্ত দেন না। সেখানে আত্মসম্মানের কথাতো উঠবেই। টাকা বরবাদ হয়ে গেলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আত্মসম্মান বাঁচাতেই হবে। বরাত খারাপ, তাই চাও পরিবারে সে টিকতে পারল না। কি হয়েছিল তার? কাঁধে অপদেবতা ভর করেছিল নাকি? নিজের জীবনের না হয় কানাকড়ি দাম নেই—যে কোনো মুহূর্তে দেয়ালে মাথা ঠুকে জীবন শেষ করে দিতে পারে, কিন্তু অন্যের জীবন সম্বন্ধে তো সাবধান হতে হয়? ধর, আজ যদি কর্তার একটা কিছু হোতো, কি হোতো তাহলে?

আগে খুশি এসব কথা কখনো ভাবেনি। আজ মনিব চাওকে ফেলে দেওয়ায় এমনিধারা নানা ভাবনা তাকে পেয়ে বসল, ছেঁকে ধরল। হাঁ হাঁ, ভাবনার আছে বই কি!. ঘোড়া বা গাধার মতো শুধু রিক্সা টানলেই হয় না। সে ঠিক করল, একমাসের মাইনে তো ছেড়েই দেবে, তাছাড়া রিক্সা আর জীবনে চালাবে না; অন্যের জীবন পিঠে বইবার মতো সামর্থ, আর সাবধানতা তার নেই। অথচ, রিক্সাওয়ালা হবে এই ছিল তার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—আজ সেই আশা, আকাঙ্ক্ষা তাকে জলাঞ্জলি দিতে হোলো। আর কোনো উদ্দেশ্যই রইল না। এখন সে জীবনের পথে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে চলবে, আলো যাবে দূরে—আরো দূরে সরে। রিক্সাওয়ালা হবার আশা তার নির্মূল হয়ে গেছে। বৃথা হয়ে গেছে তার শক্তি, তার স্বাস্থ্য।

যখন সে রাস্তায় রাস্তায় ছুটো সোয়ারি টেনে বেড়াত, তখন কত অন্যায়ই না করেছে। অন্যের কাছ থেকে সোয়ারি ভাঙিয়ে নিতেও দ্বিধা করেনি। ভাই বেরাদাররা গালাগালও দিয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করেনি—নিজের রিক্সা কেনবার জন্য গালাগাল সে মুখ বুজে সয়ে গেছে। মনে কোনোদিন এতটুকু অনুতাপ হয়নি। কিন্তু মাস মাইনেয় রিক্সা টানতে এসে এমন বিপদ হবে একথা কে জানত? এর তো কোনো কৈফিয়ৎও নেই। আর কানা-ঘুষোয় যদি কথাটা ছড়িয়ে পড়ে তার ভাই বেরাদাররাই বা কি-ভাববে? গেল, রিক্সাওয়ালা হিসেবে তার সুনামটুকুও গেল!

খুশির আর কোনো পথই রইল না। মনিব তাকে কখন বরখাস্ত করবেন সেজন্যে বসে থাকলেও তার চলবে না। তার বরখাস্ত করবার আগেই সে চলে যাবে।

খুশি, মুখ আর হাত ধুয়ে ফেল। ইস্তফা দেওয়ার কথাই উঠতে পারে না। তোমার কোনো দোষই নেই। ওরা পাথরের ঢিবি করে রেখেছে, অথচ লাল আলো জেলে রাখেনি—দোষ তো ওদের! যাক ওকথা নিয়ে আলোচনা করে আর কি হবে। মুখ ধুয়ে ওষুধ লাগাও!

হাঁগো, তাই কর—কাও-মা কথা বলবার সুযোগ ছাড়বার পাত্রী নয়, সে মনিবের কথায় সায় দিল। জানেন কত্তা, আপনাকে ফেলে দিয়েছে, একথা খুশি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। (তারপর খুশির দিকে তাকিয়ে) তা তোমারই বা বাছা অত ভাবনায় কাজ কি? মনিব তো বলে দিলেন, তোমার কোনো দোষ নেই। এমন লম্বা-চওড়া জোয়ান, অথচ একেবারে ছেলেমানুষের ব্যাভার। কর্ত্রী ঠাকরুন, আপনি দু-একটা মিষ্টিকথা বলুন না, বেচারীর মনের ভার কমুক। কাও-মার কথা যেন ফোনোগ্রাফের রেকর্ডের মতো। কথার স্রোত ঘুরতে ঘুরতে চলেছে, কিন্তু কোথায় শুরু কোথায় শেষ, বোঝা দায়।

যাও, ধুয়ে ফেলগে। কর্ত্রী বললেন। ওমা দেখে যে ভয় লাগছে।

খুশির মনে গোলমাল চলছিল, ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে। এবার কর্ত্রীর কথায় সে খেই খুঁজে পেল। তাড়াতাড়ি গামলাটা নিয়ে বাইরে এসে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। কাও-মা দরজায় দাঁড়িয়ে রইল ওষুধ নিয়ে।

মুখ ধোয়া শেষ হতেই কাও-মা তার মুখে, গলায় ওষুধ লাগিয়ে দিল। হাত আর পায়েও লাগাতে হবে নাকি?

খুশি মাথা নাড়ল। না—দরকার নেই।

ওষুধের শিশি রেখে সে বলল, কিছুক্ষণ বাদে আবার ওষুধ দিও। এই শিশি রইল। আর দেখো, ওসব ব্যাপার নিয়ে অতো ভেবো না। আমার সোয়ামি যখন বেঁচে ছিল, ঝগড়া করে কতো কাজ ছেড়ে দিয়েছি। কি বদমেজাজই ছিল আমার! তার অবিশ্যি কারণও ছিল। আমি খেটে খেটে হয়রান হয়ে যেতাম, আর আমার বুড়ো কত্তাটি চুপচাপ বসে বসে ঝিমোতো। একটা কাজ তাকে দিয়ে করানো যেত না। কার না রাগ হয় বল? তাছাড়া বয়েসটাও তখন কাঁচা, কেউ কিছু বললে সামলাতে পারতুম না। মুখের উপর দুকথা শুনিয়ে দিয়ে কাজে ইস্তফা দিতুম। কি বলতুম জানো? গতর খাটিয়ে পয়সা রোজগার করতে এসেছি বলেইতো আর কেনা বাঁদী নই। পয়সার গরব দেখিও না। তোমার মতো বুড়ী মাগীর মুখঝামটা সইতে পারব না বলে দিচ্ছি! একটার পর একটা চাকরী এমনি করে ছেড়ে দিলাম। এখন কিন্তু বেশ আছি। সোয়ামি মারা গেছে, এখন আর তার জন্যে ভাবতে হয় না। মেজাজও একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। এই ধরনা, এই বাড়িতেই প্রায় তিন বচ্ছর কেটে গেল। ন'য়ুই সেপ্টেম্বর কাজ করতে এসেছিনু। উপরি পাওনা এখানে নেইই, তবে কত্তা আর তার পরিবার লোক ভালো। একটা কথা বলতে পারঃ মিষ্টি কথায় কি পেট ভরে! ভরে না জানি, কিন্তু কথায় কথায় হুট করে যদি কাজ ছেড়ে দাও, বছরে ছ'মাস বেকার থাকতে হবে। যা টাকা আসছিল, তাও আর আসবে না। তার চেয়ে

ভালো মনিব পেলে সেখানে টিকে থাকাই ভালো। মাইনে কম হোক, উপরি পাওনা নাই থাকুক—কিন্তু আখেরে ভালোই তাতে হবে।

আজকের ব্যাপারটাই ধর না। কর্তা কিছুই বললে না, ব্যাপারটাও চুকেবুকে গেল। তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখি বলেই বলছি। এখন তেজ দেখিয়ে যদি কাজ ছেড়ে দাও, কার কি এলো গেলো? নিজেরই ক্ষতি। তেজ দেখিয়ে খালি পেটে ঘুরে বেড়ালে তো আর চলবে না। তোমার মতো অমন শক্ত সোমখ ছেলে, দুচার দিন এখানে টিকেই থাক না। সারা আকাশে উড়ে উড়ে মাছ ধরবার চেষ্টায় হয়রান হবার চেয়ে তা বোধ হয় অনেক ভালো; একা তোমার জন্মেই বলছি ভেবো না, দুজনে মিলে মিশে কাজ করতে পারব বলেই বলছি।

একটু হাঁপ ছেড়ে নিয়ে আবার সে বলল, আচ্ছা, কাল ভোরে আবার দেখা হবে। এখন লক্ষ্মি ছেলেটির মতো ঘুমিয়ে পড়। একগুঁয়ে ষাঁড়ের মতো মাটিতে পা দাপালে কিছুই হবে না। আমি যা বলি, ঠিক বলি।

খুশি বাঁ হাতের ব্যথায় আর্ধেক রাত ঘুমোতে পারল না। এলোমেলো ভাবনা এসে জুড়ে বসল মনে। আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা সে খতিয়ে দেখল। কাও-মার বুদ্ধি আছে, সে ঠিকই বলেছে। পৃথিবীতে সবই মিথ্যা, টাকাটাই একমাত্র সত্যি। টাকা জমিয়ে আবার সে রিক্সা কিনবে, তেজ দিয়ে কি হবে? তেজ ভাঙিয়ে তো আর খাওয়া চলবে না। ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আট

শ্রীযুক্ত চাও রিক্সাখানা সারিয়ে নিলেন। খুশির মাইনে থেকে সারাবার খরচ কাটলেন না। চাও-গিন্নী হুটো বড়ি তাকে খেতে দিলেন। বড়ি খেলেই তার ব্যথা সেরে যাবে। খুশি বড়ি খেল না, এমনিই সেরে উঠল। এখন তার বুদ্ধি হয়েছে, কাজে ইস্তফা দেওয়ার কথাও আর তোলে না। কাও-মার কথায় কাজ হয়েছে। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়; এটা ঠিক হোলো না—না, মোটেও ঠিক হোলো না! কহপ্তা এমনি করে কেটে গেল। তারপর ঘটনাটাই একেবারে মন থেকে মুছে গেল। নিজের কোটে সে আবার ফিরে এল, ধাতস্থ হোলো খুশি।

শুধু তাই-ই নয়, পুরনো আশা-আকাঙ্ক্ষা আবার কুঁড়ি মেলল তার মনে। এখন সে নির্জনে বসে আবার রিক্সা কেনার চিন্তা করে, সারাদেহে উত্তেজনা আসে। কত খতিয়ে দেখে, কদিনে কমাসে, কবছরে রিক্সা সে কিনতে পারবে; বিড় বিড় করে হিসেব করে। রোগী যেন প্রলাপ বকছে আর কি! হিসেবপত্র করতে সে জানেই না, কিন্তু মনে তার গানের ধুয়োর মত একই কথা বার বার ঘুরে ঘুরে আসে; ছ'-এ ছ'-এ ছত্রিশ, তার পুঁজির সঙ্গে এই অঙ্কটার কোনো সম্বন্ধই নেই—এ'যেন জপমন্ত্র, টাকা বাড়াবার জপমন্ত্র। বার বার সে ঐ কথাই বিড় বিড় করে বলে, বুক ভরে ওঠে।

কাও-মার উপর তার খুব ভক্তি। অনেক মরদের থেকে কাও-মা বেশি বুদ্ধি রাখে, অনেক জানে শোনে। ভাসা ভাসা কথা সে বলে না; একেবারে ব্যাপারটার তলিয়ে দেখতে চায়। সবসময়ে অবিশ্যি, তার কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়া যায় না। তার কত কাজ! একদণ্ড ফুরসৎ নেই। দোর-গোড়ায় কি উঠোনে যখনই তার সঙ্গে দেখা হয়, কাও-মা দু-একটা কথা বলে। খুশির বুকটা দুলে ওঠে, আনন্দে নেচে ওঠে। অর কথা নিয়ে ভেবে ভেবে সে কতদিন সারা দুপুর কাটিয়ে দিয়েছে। তাই. আজকাল দেখা হলেই খুশি বোকার মত হেসে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। কাও-মাও খুব খুশি হয়। বেশি কথা বলার সময় না পেলে দুএকটা কথা বলে খুশিকে চাঙা করে তোলে।

কিন্তু টাকাকড়ি জমাবার ব্যাপারে সে কাও-মার কথা শোনে না। নিজের মত মতোই চলে। কাও-মার বুদ্ধিটা মন্দ নয়। বিধবা হবার পর থেকে, টাকা জমিয়ে সে তেজারতি কারবারে খাটায়। একডলার হয় তো জমেছে, হাতে না রেখে

এক ডলারই কাউকে ধার দিল। ধার নেবার লোকের অভাব নেই। চাকর বাকর, পুলিশ, ছোটখাট দোকানি—এরা তো ধার নেবার জন্যে মুখিয়েই আছে। সুদের হার শতকরা তিনটাকা তো বটেই—বছরে কিন্তু নয়, মাসে; হপ্তা হিসেবেও সে টাকা খাটায়। যারা ধার নেয়, তারা এমন এক জাতের লোক; এক ডলারের ভাবনায়ও তারা পাগল। তাদের মগজে জাঁতার মত পাক খেতে থাকে ভাবনা, কি করে তারা জোটাবে এক ডলার। কেউ যদি তখন এক ডলার দিয়ে বলে, দুহপ্তার ভিতরে দুডলার ফেরৎ দিতে হবে, তাতেও তারা রাজি হয়ে হাত পাতে। টাকার সঙ্গে যে বিষটুকু মেশানো আছে, তারা বুঝেও বুঝতে চায় না; তারা জানে চড়া শুদে টাকা নেওয়া মানে হচ্ছে, নিজেকে সর্বস্বান্ত করা—কিন্তু তবু না নিয়ে উপায় নেই। কদিন তো শান্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচা যাবে। এমনি করেই তাদের জীবন চলে, তারপর একদিন আর নিঃশ্বাস ছাড়বার উপায় থাকে না। কিন্তু ওসব ভাবলে কি চলে? আজকের বিপদের হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল, কালকের বিপদের কথা কাল তখন ভাবা যাবে। এই তাদের রীতি—বদলাবার কোনো উপায়ই নেই—উপায় খুঁজতেও তারা চায় না।

কাও-মা তার স্বামী বেঁচে থাকতে এ ব্যাপারে বহু ভুগেছে। তার স্বামী মাতাল হয়ে এসে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে। টাকা না পেলে তার মনিবের বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভাষায় কাও-মাকে গালাগালি দিতেও ছাড়েনি; হল্লা শুরু করেছে। কাও-মাকে বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে হয়েছে। যত চড়া সুদে হোক না কেন, টাকা ধার করে এনে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে সে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই টাকা খাটাবার অন্ধিসন্ধি সে জেনেছে। না, প্রতিশোধের স্পৃহা তার নেই, টাকা ধার নিলে সুদ তো দিতেই হবে! সে একদিন দিয়েছে আজ তাকে দেবার পালা। আর তা ছাড়া এ এক-রকম দয়া-দাক্ষিণ্যও বটে। লোকের অভাবের সময় তাকে বাঁচানো। তোমার টাকা আছে, ধার দিতে চাইছ, অন্যদিকে ধার করার লোকও আছে—এ যেন 'তিন রাজ্য' বইয়ের চোউ আর হোয়াঙ্‌কাইর গল্প। যেন তার প্রাণের বন্ধু হোয়াঙ্‌কে চাবুক মেরে কোউ শত্রু-সেনাপতি জানিয়ে দিল, তারা আর বন্ধু নয়। লোকে যাইই ভাবুক না, তাতে কি আসে যায়।

বিবেকের দাঁত ফোটাবার সাধ্য নাই কাও-মার নীতিতে। সে তো আর টাকা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য রোজগার করে না। সে টাকা কারো অভাবের সময় ধার দেয়, আবার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতেও ছাড়ে না। তেজারতি ব্যাপারে একটু সাবধান হতে হয় বৈকি। না হলেই বিপদ, চোর জোচ্চর তো বাজের মত ছোঁ মারবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। সুবিধে পেলেই নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।

ব্যাঙ্কের মালিকের মতই ধার দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকি মাথায় নেয়। ব্যাঙ্কের মালিকের থেকেও ঝুঁকি তার একটু বেশিই। মূলধন কম আর বেশি হোক, পুঁজির ব্যবসায়ের পথ এক। আমাদের সমাজ ধনতান্ত্রিক—এ যেন বিরাট এক ফুঁদেল, সূক্ষ্ম জাল দিয়ে ঘেরা। উপর থেকে টাকা ঝরে পড়তে থাকে, যত নিচে যায় ততই ঝুঁকি বাড়তে থাকে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক নীতি ঠিকই থাকে—সে তো আর টাকা নয় যে ফুঁদেল গলিয়ে পড়ে যাবে।

সবাই বলে কাও-মা বড় পাকা লোক। সে নিজেও স্বীকার করে। দারিদ্র্যের হাতুড়ী আর জাঁতায় ছেঁচে পিশে সে বেশ কঠোর হয়েই উঠেছে। যখনই তার দারিদ্র্যের কথা মনে পড়ে, স্বামীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কথা মনে পড়ে, সে তার দাঁতে দাঁত চেপে আরো কঠোর হয়ে ওঠে। তাই বলে দয়ামায়া তার নেই যে তা নয়। কিন্তু এই নচ্ছার পৃথিবীতে বাঁচতে হলে কঠোর হওয়া ছাড়া উপায় কি?

সে খুশিকে টাকা ধারে খাটাতে পরামর্শ দিল। এ কথাও বলল, সে তাকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করতেও রাজি আছে।

দেখ ভালো মানুষের ছেলে টাকা পকেটে রেখে দিলে কোনো কাজেই আসে না। যা ছিল তাইই থাকে, আর খরচা হওয়ার ভয় আছে। তার চেয়ে টাকা ধার দিয়ে দেখ, টাকা ডিম পাড়বে। এতে কোনো ভুল নেইগো, ভুল নেই। তবে হাঁ, বলতে পার, ঝক্কি পোয়াতে হয়। তা চোখের মাথা তো আর খেয়ে বসনি। কেউ ধার চাইতে এলে একবার ভালো করে চোখ চেয়ে দেখে নেবে। যে ঈগলের পালক ঝরে গেছে তুমি তার লেজ হাতের মুঠোয় চেপে রাখতে পারবে না, তা জানি। কিন্তু এই পুলিশের কথাই ধর না। যদি সময় মত সুদ বা আসল না দেয়, তাহলে তার উপরওয়ালাকে খুঁজে বার করতে হবে, তখন আর টাকা না শোধ করে পালাবে কোথায়? টাকা ধার দিতে হলে বুঝে শুনেই দিতে হবে। নইলে যাকে তাকে দিলে সে টাকা তো তলিয়ে যাবেই। আমি তোমাকে বলছি, টাকা সুদে খাটাও, কোনো ভয় নেই, সব ঠিক করে দেব।

খুশি কাও-মার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বুদ্ধি আছে বটে কাও-মার। কিন্তু টাকা ছাড়তে তার মন সরছে না, টাকা হাতে রাখাই ভালো। হাতে রাখলে মরা টাকা আর দুগুণ কি তিনগুণ হবে না, ডিমও পাড়বে না বটে, কিন্তু হারাবার কোনো ভয় নেই। সে তার পকেট থেকে এই কমাসের রোজগার বার করল। সব টাকা—নোট একখানাও নেই। হাত দিয়ে নাড়তেও ভালো লাগে। টুংটাং মিষ্টি বোল—কেমন যেন ভালো লাগে, আবার ভয়ও হয়। ঝলমল করছে দেখ না। না, কাও-মার বুদ্ধিতে টাকাগুলো সে হাতছাড়া করতে

পারবে না। সময় হলে সে যখন রিক্সা কিনবে, তখন হাতছাড়া করা যাবে। কাও-মার বুদ্ধি তার নিজেরই থাক। আর খুশির নিজেরও বুদ্ধি আছে। ধারে সে খাটাবে না, খাটাতে পারবে না।

এক সময়ে ফেঙপরিবারে সে কাজ করত। তখন দেখেছে, বাড়ির কর্তা থেকে শুরু করে ঝি-চাকর পর্যন্ত সবাই পোস্ট অফিসের বইয়ে টাকা রাখে, ফেঙ্ গিন্নি একদিন সে কথা ওকে বলেও ছিলেন!

এক ডলার দিয়েই পাস বই খোলা যায়। তুমি একখানা করছ না কেন? কথায় বলে না, রোদের দিনে যদি বর্ষার কথা না ভাব, তাহলে মুশকিলে পড়তেই হবে। তখন হায় হায় করলেও দিন আর ফিরে আসবে না। তোমার বয়েস এখন কম, এখন যদি দুচার টাকা না জমাও, কবে জমাবে? বছরে তিনশ ষাট করে দিন, এই তিনশো ষাট দিনই তো আর একরকম যাবে না। আর এতে টাকা মারা যাবার কোনো ভয়ই নেই। তাছাড়া কিছু সুদও পাবে। দরকার পড়লে কিছু তুলেও নিতে পারবে। এর চাইতে সুবিধে আর হয় না। যাও, গিয়ে একটা ফর্ম নিয়ে এস, আমি তোমার হয়ে ঘরগুলোয় যা লেখবার লিখে দেব। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।

খুশি জানত ফেঙ্-গিন্নী তার ভালোর জন্যেই বলেছেন। সে রাঁধুনী ওয়াঙ আর বাচ্চা খোকা চিনমার পাস বইও দেখেছিল। এই নিয়ে সে কদিন ধরে ভাবল। একদিন ফেঙদের বড়মেয়ে পাশ বইতে দশ ডলার রাখতে পোস্ট অফিশে পাঠাল। পথে যেতে যেতে পাস বইখানা নেড়ে চেড়ে সে দেখল। কতকগুলি হরফ, লাল কালিতে তার উপর সিল মারা—এই তো পাস বই! পোস্ট অফিশের খুপরি দিয়ে এইখানা আর টাকা এগিয়ে দিতেই ওরা কি যেন লিখে আবার লাল কালিতে সিল মেরে দিল। এযদি জোচ্চুরি না হয় তো জোচ্চুরি কাকে বলে। টাটকা ফুলের মতো একমুঠো টাকা তুমি খুপরি দিয়ে গলিয়ে কি পেলে তার বদলে? পাঁচ ছত্তর লেখা, একটা লাল সিল—ব্যস্ লেন দেনের ব্যাপার শেষ!

না, খুশি অমন জোচ্চুরির ভিতরে সেঁধোতে রাজি নয়। ফেঙ পরিবার আর পোস্ট অফিসের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আছে—দুজনে মিলে লোক-ঠকান ব্যবসা খুলেছে। কিন্তু চার দিকেই পোস্ট অফিস সে দেখেছে—ব্যবসা তাহলে বেশ ফলাও করেই ফেঁদেছে। ফেঙদের নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে, নইলে টাকা জমা দেওয়ার জন্যে অতো ঝুলোঝুলি করবে কেন? পোস্ট অফিস জোচ্চুরির ব্যবসা না হলেই বা কি? হাতের টাকা পরের হাতে তুলে দিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারবে না। টাকার বদলে কয়েকটা হরফ আর লাল সিল দেখে মন তার অস্থির হয়ে উঠবে, ঘুম হবে না রাতে।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তার ধারণা নেই। সোয়ারি পাবার লোভে সেখানে সে প্রায়ই যায় বটে, কিন্তু রাস্তার পুলিশটা বড় হুজ্জুত করে, কিছুতেই রিক্সা রাখতে দেবে না। কিছু ঘুষ দিয়ে মাঝে মাঝে রিক্সা রাখে, সোয়ারিও পায়। ব্যাঙ্কের ভিতরে কি হয়, সে জানে না—টাকাকড়ির লেনদেন হয় নিশ্চয়ই। অত বড় বাড়ি, অত লোকজন তা আর হবে না। কিন্তু কেন যে লোকে টাকা রাখতে ওখানে যায় সে তা বোঝে না। অন্য লোক যদি টাকা মেরে দেয়? তা ছাড়া ব্যাঙ্কে রাখবার মত টাকা তার কোনো দিনই হবে না—তা নিয়ে তাই সে মাথাও ঘামায় না।

শহরের অনেক জিনিসই সে বুঝতে পারে না। চাখানায় বন্ধুদের কাছে অনেক আজগুবি কথাই শোনে। তারা চিৎকার করে টেবিল চাপড়ে তর্কেও মেতে ওঠে, কিন্তু যোগ দেওয়া তো দূরের কথা মাথামুণ্ডু কিছুই সে বোঝে না, মনে হয়, শহরে এসে সে বুঝি একেবারে বোকা বনে গেছে। তর্ক তারা করে, ঝগড়াও মাঝে মাঝে হয়—আসল ব্যাপারটা চাপা পড়েই যায়, কেউ পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে না। তার এসব ভালো লাগে না। কি হবে ছাই ওসব শুনে? তবে একটা কথা সে বুঝেছে, যদি ডাকাতি করতে হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক হচ্ছে ঠিক জায়গা। বুঝেই বা লাভ কি? সে তো আর ডাকাতি করতে যাবে না। তার চাইতে টাকা নিজের কাছে রেখে মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দেখলেও আরাম আছে। আর সে করবেও তাই।

কাও-মা জানে যে, খুশি একখানা রিক্সা কিনতে চায়। তাই সে একদিন ওর কাছে প্রস্তাব করল খুশি, আমি জানি, টাকা তুমি সুদে খাটাতে রাজি নও। কিন্তু ওতে রিক্সা কেনার তাড়াতাড়ি একটা সুরাহা হোতো। আমি যদি পুরুষ হতাম, আর রিক্সা চালাতাম, নিজের রিক্সাই চালাতাম। কারো কাছে এক কানাকড়ি সাহায্যও চাইতাম না। স্বাধীনভাবে খেটে রোজগার করতাম, গান গাইতাম, জেলার হাকিমের থেকেও সুখী হতাম আমি। কেউ যদি বলতো, পুলিশে ভরতি হয়ে যাও না, অমন সুখের চাকরী আর নেই। তাও যেতাম না। অমন একঘেয়ে চাকরী কি আর দুটো আছে? শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো; মাইনেও খুব কম, তার উপর উপর-ওয়ালার চোখ রাঙানি। এমনকি ইচ্ছে হোলো, গোঁপ রাখবে—উপরওয়ালার পছন্দ হোলো না—অমনি বরখাস্ত করবে। তার চেয়ে নিজের গতর খাটিয়ে রিক্সাটানা ঢের ঢের ভালো।

তাইকি বলছিলাম শোনো—নিজের যদি রিক্সা কিনতে চাও, এক কাজ কর, একটা সভা কর—সেই সভায় দশজন থেকে বিশজন লোক থাকবে—প্রতি লোকটা মাসে দুডলার করে দেবে। প্রথম মাসে যে চাঁদা উঠবে তা তুমি নেবে—

তাহলে হবে তোমার চল্লিশ ডলার। এমনি করে শীগগিরই তোমার রিক্সা কেনার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। চমৎকার ফন্দি—তাই না? রিক্সা কিনে সভাটাকে তখন লটারি সভা করে ফেলা হবে। এক পয়সা সুদ দিতে হবে না। দেখ, সভা তৈরী করবে নাকি? আমি চাঁদা দেবখন। কি, চুপ করে রইলে যে বাছা।

প্রস্তাবটা খুশির কাছে খারাপ লাগল না, বরং বুকটা তার আশায় দুলে উঠল। এমনি চাঁদা করে যদি তিরিশ কি চল্লিশ ডলার উঠে, তার সঙ্গে ন'কর্তার কাছে গচ্ছিত তিরিশ ডলার তো আছেই—সেও ইদানীং কিছু জমিয়েছে—তা সব মিলিয়ে আশী ডলারের উপরেই হবে। অবিশ্যি, ওতে একেবারে দশভাগই নতুন রিক্সা কেনা হবে না—অন্তত আটভাগ নতুন একখানা তো কিনতে পারবেই। আরো একটা সুবিধেও সে পাবে, ন'কর্তার কাছে গচ্ছিত টাকাটা আদায় করা হবে। আটভাগ নতুন রিক্সা নিশ্চয়ই খুব খারাপ হবে না। আর খারাপ হলেই বা কি, কিছু টাকা হাতে জমলেই বদলে নিতে কতক্ষণ?

কিন্তু বিশজন লোক সে কোথায় পাবে? তাও না হয় জোগাড় হোলো, তারপর কি হবে? সে তো তাদের চাঁদার টাকায় রিক্সা কিনে বসল, তারপর আজ বাদে কাল যখন তাদের টাকার দরকার হবে তখন? অন্তত চক্ষু-লজ্জার খাতিরেও তো তাকে চাঁদা দিতে হবে। তখন জমানো টাকাগুলো সব উড়ে যাবে। না, সে তা করবে না, হানের বংশধর সে, কারো সাহায্যে তার প্রয়োজন নেই। তার যদি ভাগ্যে থাকে, সে নিজের রোজগারেই রিক্সা কিনবে। কারো সাহায্য সে চায় না।

কাও-মাও বুঝতে পারল, এ-ছেলে সহজে টলে না। ঠাট্টা করে তাকে চটিয়ে দেওয়ার তার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু খুশির আত্মবিশ্বাস দেখে সে অবাক বনে গেল। এ ছেলে ছল ছুতো খুঁজবে না, যা করবে সহজ সরল উপায়েই করবে। ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। কাও-মা হাল ছেড়ে দিল।

তোমার মতো লোক আমি জন্মে দেখিনি বাপু! সে বলল, রিক্সা কেনার চাইতে একদল শুয়োর পোষ না! ওরা বাঁকা পথের ধার ধারে না, সোজা গোঁ মেরে চলে যায়, আবার সোজা ফিরে আসে। তোমার বাপু শুয়োর পোষাই ভালো।

খুশি কোনো কথা বলল না। কাও-মা চলে গেলে সে অনেক ভেবে দেখল। না, কাও-মার কথা সে শুনবে না, তার নিজের পথই ঠিক। হাতের মুঠোয় শক্ত করে টাকা ধরে থাকার মতো সম্মানের কাজ আর নেই। আর সে তাই করছে, ভবিষ্যতে করবেও। খুশি উল্লসিত হয়ে উঠল।

আবহাওয়া এরই মধ্যে বদলাতে শুরু করেছে। শীত শুরু হয়েছে, ফেরিওয়ালারা

হেঁকে যাচ্ছে, চাই নকলদানা—টাটকা নকলদানা। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, *চাই চীনে মাটির বাসন !*

খুশি বাসনওয়ালাকে ডেকে ঠিক কুমড়োর মতো দেখতে একটা ঘটি কিনে ফেলল। ঘটিটার উপরে ঢাকনি দেওয়া। এই তার প্রথম বউনি, ফেরিওয়ালা তাকে টাকার ভাঙানি দিতে পারল না—ঘটিটা চমৎকার দেখতে। ঘন সবজে রং—ঠিক যেন একটা কাঁচা কুমড়ো।

ভাঙানির জন্যে ভেব না, আর একটা কিছু নিচ্ছি।

আর একটা ছোট সবজে রঙের ঘটি কিনে নিয়ে সে বাড়ির ভিতরে এল।

ওগো ক্ষুদে মনিব আমার, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি? তোমার জন্যে কেমন খেল্‌না এনেছি দেখ! চাও-গিন্নী আর কাও-মা খোকাকে স্নান করাচ্ছিলেন, তারা তাকিয়ে দেখলেন, খুশি একটা সবজে রঙের ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওমা খেলনা এনেছে দেখ না! দুজনেই হাসলেন। শ্রীযুক্ত কাও বা তার স্ত্রী এবিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না। উপহার হিসেবে অদ্ভুত হলেও খুশির এই ভালোবাসার দান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তারা তাকে অপমানিত করতে চান না। তারা দুজনেই মৃদু হেসে খুশিকে ধন্যবাদ দিলেন।

কাও-মা কিন্তু চুপ করে থাকবার পাত্রী নয়। সে হেসে উঠল; ওমা খুশির বুদ্ধি আছে দেখছি! আমি তো ভেবেছিলাম অমন হোঁতকা জোয়ান, ওর মগজে এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই!

খোকা খেলনা পেয়ে খুবই খুশি হোলো। সে ঘটিতে জল ভরে খিল খিল করে হেসে উঠল—ছোট্ট ঘটি—কিন্তু হাঁ টা কি বড়!

সবাই হেসে উঠল, খুশি একটু লজ্জিত হয়ে বাইরে চলে এল। সত্যিই মন তার আনন্দে ভরে গেছে। ঘরের সবাই ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছে, একি কম কথা! এমনি ব্যবহার ওরা হোমরা-চোমরাদের সঙ্গেই করে থাকে। আগে তার এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। সে ঘরে এসে আপন মনে হেসে উঠলো, গেঁজে খুলে টাকা বের করে কুমড়োর মতো দেখতে সেই ঘটিটার ভিতর একটা একটা করে টাকা ফেলে দিল। টুং টাং শব্দ হোলো। বিড় বিড় করে সে বলল, এর থেকে ভালো জায়গা আর কোথায় পাব—এই খানেই একটা করে ডলার টুং করে পড়বে—ভরে উঠবে ঘট—তারপর যেদিন পুরো টাকাটা জমবে, সেদিন ঘটটাকে দেয়ালে ছুড়ে ভেঙে ফেলব। ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়বে, ঝলমল করে উঠবে।

সে ঠিক করল, কারো কাছে সে আর সাহায্য চাইবে না। কার কাছেই বা চাইবে? ন'কর্তা লিউ-এর মতো তো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, কিন্তু তার

উপরও সময় সময় বিরক্তি ধরে যায়। এই তো এতগুলো টাকা তার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, কবে যে বার করে আনতে পারবে কে জানে। টাকা অন্যের হাতে পড়লেই গেল। এ যেন সুন্দর একটা আঙটির মতো—নিজের আঙুলে পরলেই তো ভালো মানায়। এবার সে ধাতস্থ হোলো—বুকখানা তার আত্ম-প্রসাদে ফুলে উঠল।

শীত পড়েছে বটে! ঠাণ্ডা দিনগুলো। খুশির সেদিকে খেয়ালই নেই। মন সে শক্ত করে ফেলেছে, সংশয় এসে আর আবছা করে দিতে পারে না। তাই অন্ধকার, বিষণ্ণ দিনগুলোও তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা এসে আস্তিনের ভিতর দিয়ে গায়ে হুল ফুটিয়ে দিতে পারছে না। তার চোখের সুমুখে পাপড়ি মেলছে, উজ্জ্বল, খটেখটে পরিষ্কার দিন, দিনের পর দিন। বরফ পড়ছে। সবকিছু জমাট বেঁধে যাচ্ছে। মাটির কালো রং চলে গিয়ে দেখা দিয়েছে হলদে আভাস, ঠাণ্ডা হাওয়া টেনে নিয়ে শুকিয়ে ফেলছে মাটি। ভোরে যখন ট্রাকগুলো চলে, ধুলো ওড়ে বটে—কিন্তু তার সঙ্গে মিশে থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বরফের কণা। ভোরে হাওয়ায় মেঘ কেটে যায়—উড়ে যায়—তখন দেখা দেয় নীল আকাশ। খুশি সূর্য ওঠবার আগেই রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হাওয়া তার মুখের উপর ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে চলে যায়, কাঁপিয়ে দিয়ে যায় তার দেহ—মনে হয় এক পশলা বৃষ্টিই বুঝি হয়ে গেল। খুশির কিন্তু ভালোই লাগে, হাওয়ার মাতনের সঙ্গে গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছা করে। কখনো কখনো দমকা ঝোড়ো হাওয়া এসে চাবুকের মত মুখের উপর পড়ে—নিশ্বাস যেন ফুরিয়ে আসে—কিন্তু সে দমে যায় না। মাথা নিচু করে, দাঁতে দাঁত পিষে রিক্সা নিয়ে এগিয়ে যায়। মনে হয়, একটা বিরাট মাছ যেন স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরে চলেছে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরও প্রতিরোধ শক্তি বেড়ে যায়। খুশি যেন হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে মেতেছে। যে সে যুদ্ধ নয়—জীবন-যুদ্ধ।

দমকা হাওয়া যখন বয়ে যায়, তার নিশ্বাস ফুরিয়ে আসে, অনেকক্ষণ সে মুখ বুজে থাকে, সারা শরীরে ঝাঁকুনি—কোন দিকে হেলে পড়বে কে জানে। বর্শায় যেন একটা প্রকাণ্ড তিমি সে গেঁথেছে—টাল সামলাতে পারছে না; কিন্তু ঠিক সে সামলে নেয়, হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে করতেই সে পথে চলে। সে যেন রূপকথার এক বিরাট দৈত্য—পথের বাধা সে পায়ে থেঁতলে চলে যাবে।

ঘামও ঝরে বটে। ঘামে সারা শরীর যেন নেয়ে ওঠে। রিক্সা রেখে সে যখন জিরোয়, ঘনঘন তার নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। মুখের কোণে পথের সুড়কির কণা জমে উঠেছে, সেগুলো মুছে ফেলে, বুক ফুলিয়ে বার বার সিধে হয়ে

আলিসিা ভাঙে। দেখে মনে হয় তার জুড়ি মেলা ভার, আমি তারও তাই বিশ্বাস। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে হাওয়ার ঘূর্ণিতে ছাই আর কাঁকর পাক খেতে খেতে চলছে। খুশি মাথা নাড়ে। হাওয়া গাছপালা ধনুকের মত নুইয়ে দেয়, দোকানের লাল শালুর বিজ্ঞাপন গুলো ছিঁড়ে ফালি ফালি করে দিয়ে চলে যায়। দেয়ালে আঁটা বিজ্ঞাপনগুলোও আস্ত রাখে না—উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। হাওয়ার কি দাপট। এমন যে সূর্য তাকে পর্যন্ত মেঘে ঢেকে দেয়; আহত পশুর মতো গোঁ গোঁ করতে করতে তেড়ে আসে, স্বর্গ আর মর্ত কাঁপিয়ে দেয়—তারপর দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক নিষ্ঠুর দৈত্য যেন—সব কিছু উচ্ছন্নে দিতে চায়। ডালপালা ভেঙে ছিটকে পড়ে, টালি খসে পড়ে, টেলিফোনের তার টুকরো টুকরো করে ফেলে।

খুশির ভয়ডর নেই। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মজার আমেজ পায়। হাওয়ার সঙ্গেই সে যুদ্ধ করে এসেছে, তার আর ভয় কি! সে তো বিজয়ী বীর! অনুকূল হাওয়া পেলে তো সে খুব খুশি! রিক্সা নিয়ে দৌড়তে হয় না—হাতল দুটো ধরে থাকলেই হোলো। বন্ধুর মত হাওয়াই তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

সে অন্ধ নয়, তার চোখ দুটো খোলাই আছে। বুড়ো রিক্সাওয়ালাদের সে দেখেছে। হাওয়ায় তাদের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি করে দেয়, শীতে তারা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে জল ঝরে। কোনো সোয়ারি দেখলে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়, সে কি তুমুল ঝগড়া। এ বলে আমি আগে ডেকেছি, ও বলে, আমি আগে ডেকেছি। একটা ফয়সালা করে সোয়ারিকে রিক্সায় চড়িয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তারপর ছুট ছুট ছুট! ঘাম দর দর করে ঝরতে থাকে। ঝোড়ো হাওয়া হোলেই মুস্কিল। তখন আর পা চলে না—কোনো রকমে ঘাড় গুঁজে থাকে। সুমুখ দিয়ে হাওয়া এলে তবু রক্ষা, কিন্তু পিছন থেকে এলে আর উপায় নেই। তখন টাল সামলানো শক্ত। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করে না, আধমরা হয়ে সোয়ারিকে পৌছে দেয়। কিন্তু কত আর পায়? কয়েকটা তামার পয়সা। জীবনীশক্তি যে নষ্ট করছে সে খেয়াল তাদের নেই।

এমনি দিনে ভাড়া খেটে অবস্থাও যা দাঁড়ায় তা আর বলবার নয়। ধুলো হাওয়া এসে মুখে লাগে, ঘামের সঙ্গে মিশে সমস্ত মুখখানায় ছড়িয়ে পড়ে—মনে হয় কে যেন কাদা মেখে দিয়েছে। এই কাদার মুখোশের ভিতর দিয়ে কুতকুতে দুটি চোখ আর মুখখানা যা চমৎকার দেখায়! শীতের দিনগুলি খুব ছোট—পথে লোকজনও তেমন চলে না। সোয়ারির আশায় সারাদিন বসে থেকে হয় তো একটা কি দুটো জোটে—কোনো দিন বা তাও না। তারপর সন্ধ্যাবেলা অনেকখানি

জীবনীশক্তি ক্ষয় করে তারা ঘরে ফেরে। পেট পুরে একবেলা খাবার মতো রোজগারও হয়তো হয়নি। কিন্তু বাড়িতে অনেকগুলো পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। বুড়ো হয়েছে যখন, একটি বুড়ী স্ত্রী, গোটা কয়েক ছেলে মেয়ে তো আছেই; তা ছাড়া বাপ মা ভাই বোনও থাকতে পারে। সত্যি, শীতকালটায় বুড়োদের ভারি কষ্ট। ভূতের মতই খাটতে হয়, একটু জিরোবার অবসর নেই। শয়তানও এত মেহনৎ করতে পারত কিনা সন্দেহ। শুধু রাস্তার কুকুরছানাগুলোর মত মরলেই তাদের হাড় জুড়োয়, আসে শান্তি।

হাঁ, খুশি তাদের দেখেছে বইকি! কিন্তু তাদের দুর্দশা নিয়ে কখনো সে মাথা ঘামায়নি। তার সময়ই বা কোথায়? তাগ্‌ড়া জোয়ান, শরীরখানিও বেশ মজবুত—শীতকে সে ডরায় না! তার উপর রাতে শোয়ার একটা আস্তানা ঠিক আছে, পরনের কাপড় জামাও পরিচ্ছন্ন।—ওদের সঙ্গে তার ঢের তফাৎ; যদিও একই ব্যবসা করে, কিন্তু সে পরিশ্রম করতে পারে, ওরা পারে না। আর সে ওদের মতো দুর্দশায় পড়তেও রাজি নয়। ভবিষ্যতের কথা সে ভেবেছে, বুড়ো হলে সে আর ঝরঝরে রিক্সা টানবে না। ক্ষিধে আর শীতেও সে কষ্ট পাবে না। এখন সে যেরকম খাটছে, ভবিষ্যতে সে জিতবেই।

হাওয়া-গাড়ি যারা চালায়, তাদের সঙ্গে তার মিল আছে। তারা অবিশ্যি, রিক্সাওয়ালা বলে তাকে হেনস্তাই করে; ভাবে, রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথা বললে বুঝি তাদের জাত যাবে। ও যেমন বুড়ো রিক্সাওয়ালাদের করুণা করে, তারাও ঠিক ওকে সেই চোখেই দেখে। কিন্তু কেন যে এমন হয়? একই নরকে তো ওরা সবাই পচছে—শুধু একটু বেশি আর কম এই যা! তারা কখনো এক কাঠ্ঠা হওয়ার কথা ভাবে না, নিজের নিজের পথে চলে। তারা আশায় অন্ধ হয়ে ভাবে, এমনি করেই বুঝি নিজের নিজের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলবে। জীবনযুদ্ধে একা ঝাঁপিয়ে পড়ে, ক্ষতবিক্ষত হয়—অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়ায়—কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে জানে না। খুশিও এদেরই সগোত্র। সে কারো কথা ভাবে না। কারো দিকে তাকিয়েও দেখে না। শুধু নিজের টাকা আর ভবিষ্যতের ভাবনায়ই সে মশগুল। কি হবে ভেবে? মরুক না ওরা—সে বাঁচবে, ভালো করে বাঁচবে।

বছর শেষ হয়ে এল। খটখটে শুকনো দিন—উজ্জ্বল দিন। দমকা ঝোড়ো হাওয়া নেই। দোকানে দোকানে নতুন বছরের ছবি, রঙীন কাগজের লণ্ঠন, সাদা লাল মোমবাতি, মেয়েদের চুলে পরবার জন্যে সিল্কের ফুল, দেবদূতের মূর্তি থরে থরে সাজানো। দেবদূতের ছোট ছোট মূর্তি বিক্রির এই মরশুম। সবাই কিনে নিয়ে কুলুঙ্গীতে রেখে দেয়, মধু দেয় তার মুখে। একবছর ধরে পৃথিবীতে যত অনাচার অবিচার হয়েছে, সেকথা যদি দেবদূত ভগবানকে বলে দেয়—

তাহলে তো সর্বনাশ! তাই মধু দিয়ে মুখ মিষ্টি করে রাখে—বলতে চাইলেও দেবদূত সবকথা বলতে পারবে না। বহু পুরনো কাল থেকে এই রীতি চলে আসছে।

নতুন জীবনের সাড়া পড়ে গেছে। কিন্তু একটু আধটু অশান্তিও মনের কোণে জমে উঠছে বইকি। নতুন বছর এল, আমোদ-প্রমোদে কিছু খরচ তো হবেই। কিন্তু খরচ করবে কোত্থেকে। খুশির ওসব বালাই নেই। বরং মন তার আহ্লাদে ভরে উঠল। চাও পরিবার থেকে মোটা বকশিস সে পাবেই। নিশ্চয়ই নানা বন্ধুবান্ধবকে উপহার তারা পাঠাবেন—আর ওকেই দিয়ে আসতে হবে সে সব উপহার। ফি বারে যদি তিরিশ সেণ্ট—না হয় বিশ সেণ্ট করেই পায়—তাহলেও রোজগার মন্দ হবে না। তাছাড়া কত লোক তো মনিবের সঙ্গে দেখা করতেই আসবে, তাদের বাড়ি পৌঁছে দিলেও সে কিছু বকশিস পাবে। সব মিলিয়ে বেশ মোটাই হবে রোজগার। সব রোজগার সে চীনে মাটির ঘটে রেখে দেবে। তারপর অনেক রাতে শুয়ে শুয়ে ঘটের দিকে তাকিয়ে থাকবে। পয়সা রাখবার ফন্দিটা সে ভালোই ঠাউরেছে। পোস্ট অফিসের বই, টাকা সুদে খাটানো—ওসব জোচ্চুরি ছাড়া কিছুই নয়। তার চেয়ে ঘটই ভালো। পয়সা সে মোটা পেটের ভিতরে গিলে ফেলবে বটে, কিন্তু উগরে কখনো দেবে না। এমনি করে গিলতে গিলতে যখন পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে, তখন বার করে নিলেই চলবে। এখন থাক, যত খুশি থাক না!

নতুন বছরের উৎসবের দিন এগিয়ে এল। চারদিকে তোড়জোড় চলেছে। সবাই নতুন বছরে কি করতে হবে, তারই খসড়া করছে, পুরনো খাতা ঠিক করছে। এখনো চব্বিশ ঘণ্টায়ই দিন কাবার হয়, কিন্তু বছরের অন্য দিনগুলির মতো অকাজে ফুস্ করে উড়ে যায় না। নিজের খেয়াল খুশিতে উড়িয়ে দেওয়ারও উপায় নেই। এ পুরনো বছরের হিসেব নিকেশ করতে হবে—তবে তো নতুন বছরের আনন্দ চুনিয়ে উপভোগ করা যাবে। গোঁজামিল দিলে চলবে না। সময়েরও যেন চেতনা ফিরে এসেছে, উদ্দিপনাময় হয়ে উঠেছে—সবাইকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে, খুশি কাজ করিয়েদের দলে। আনন্দে সে যেন ফেটে পড়ছে। পথে পথে লোকের ভীড়, ফেরিওয়ালার হাঁকডাক—নতুন বছর এলো বলে। উৎসবের ভালো খাবার খাবে, নতুন পোশাক পরবে—এই আনন্দে সে খুদে খোকার মতোই নেচে উঠল।

সে ঠিক করল, আটসেণ্ট কি একডলার খরচ করে ন'কর্তা লিউর জন্যে একটা উপহার কিনে আনবে: 'সামান্য এই উপহার, কিন্তু ভালোবাসা এতে জড়িয়ে আছে'। হাঁ, একটা কিছু কিনতে হবেই। এতদিন ন'কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যায়নি বলে লজ্জা করছে। তা উপহার নিয়ে গেলে লজ্জাও খানিকটা কমবে, তাছাড়া বুড়োর কাছে গচ্ছিত তিরিশ ডলারেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে, এই ভেবে

সে চীনেমাটির ঘটটা কানের কাছে নিয়ে নাড়ল। ঝনঝন শব্দ হচ্ছে, ওর পেটে তিরিশটা ডলার পড়লে আরো মিষ্টি শব্দ বেরুবে। একবার টাকাটা ফিরে পেলে হয়, তাহলে আর দুশ্চিন্তা থেকে মন হালকা হয়ে যাবে। রোজই সে এমনি করে ঘটটা নেড়েচেড়ে দেখে।

সেদিন সন্ধ্যেয় সে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ঘটটা নিয়ে নাড়ছিল। এমন সময় কাও-মা এসে খবর দিল।

খুশি, একটা ছুঁড়ী তোমার খোঁজ করছে। ফটকের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

খুশি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাও-মা ধীরে ধীরে বলল—কি ছিরিই ছুঁড়ীর—একটা প্রকাণ্ড কালো প্যাগোডা—মাগো, দেখলে ভয় লাগে!

খুশির মুখখানা লাল হয়ে উঠল, যেন আগুন ধরে গেছে মুখে। সে বুঝতে পারল, কে এসেছে দেখা করতে। আর উপায় নেই, এত আশা, আকাঙ্ক্ষা সব ভেস্তে গেল।

খুশি উঠোন পার হয়ে চলল। চলবারও যেন শক্তি তার ফুরিয়ে গেছে ? এই মাথা ঘুরছে, কোনো রকমে সে ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। বাঘিনীকে এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। পথের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে বোধ হয় খুব পাউডার ঘষেছে। আলো পড়ে রংটা কেমন ধূসর দেখাচ্ছে—যেন পচা, শুকিয়ে কালো হয়ে যাওয়া পাতার উপর পড়েছে সাদা বরফের আস্তরন। খুশির কেমন ভয় হোলো। চোখ তুলে বাঘিনীর মুখের দিকে সে তাকাতে পারল না।

বাঘিনীর ভাবখানাও বোঝা দায়। চোখে খুশিকে দেখার আনন্দ ঝলসে উঠছে; ঠোঁটে হাসি, ন'কর্তা একটু কুঁচকে আছে—হয়তো তার মতো সম্ভ্রান্ত মেয়েকে খুশির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বলেই এই অবজ্ঞা, চোখের তারা দুটি জ্বল জ্বল করছে; মুখে একগাদা পাউডার বরফের গুঁড়োর মতো লেগে আছে, কেমন একটা মাদকতা যেন জড়িয়ে আছে। কিন্তু শয়তানি ভরা মুখ, ঠোঁটে দৃঢ়তা, কি একটা ব্যাপারে হেস্তনেস্ত করতেই সে এসেছে।

খুশিকে দেখে তার ঠোঁট দুটো চিরে হাসির ঝলক বেরিয়ে এল। একটু ঢোক গিলে সে ঠাট্টা করেই বলল: ভালো লোক যাহোক! একতাল মাংস নিয়ে কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিলাম, কুকুরটা কিন্তু পালিয়ে গেল, আর ফিরে এল না! তেমনি উত্তেজিত, কর্কশ তার স্বর। রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে পাওনা নিয়ে বচসা করবার সময় এমনি স্বরই খুশি শুনেছে। কথাটা বলে বাঘিনী চুপ করল। মুখের হাসি নিবে গেছে, নিজেকে সস্তা করে ফেলছে বলেই বুঝি লজ্জিত হচ্ছে। বাঘিনী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে গেল।

দোহাই তোমার, চেঁচিয়ো না! খুশি তার সমস্ত শক্তি উজাড় করেই বুঝি বলল। আস্তেই সে বলল, কিন্তু বেশ রূঢ়া শোনাল।

হাঁ! ভয় পাইয়ে দিলে যে। বাঘিনী হাসল, তারপর নিচুস্বরে বলল, তা এখন তো এড়াতে চেষ্টা করবেই—এখানে বোধ হয় আর একটা জুটিয়েছ। আমি আগেই জানি, তুমি খেলার পুতুলটি নও। ওই বোকা বোকা চেহারা নিয়ে আর যার চোখেই ধুলো দাও, আমার চোখে ধুলো দিতে পারনি বাছা। গলা তার ধাপে ধাপে চড়তে লাগল।

চেঁচিয়ো না বলছি! খুশির ভয় হোলো, কাও-মা বোধ হয় দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছে। চেঁচিয়ো না, চলো যেতে যেতে কথা হবে'খন।

ওঃ, ভয়েই মলাম! অতো ভয় আমার নেই। আমি জোরেই কথা বলি, অমন ইনিয়েবিনিয়ে বলতে পারিনে! বাঘিনী ওর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

ওরা বড় সড়ক ছাড়িয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। গলির গায়েই পার্কের লাল দেয়াল। খুশি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করল: কি জন্য এসেছ?

কি জন্য এসেছ? ওঃ সোহাগে একেবারে গলিয়ে দিলে দেখ না! কারণ আছে বইকি, নইলে তোমার মতো মিনসের কাছে ধরনা দেব কেন? তখুনি তাকিয়ে দেখল বাঘিনী পেটে হাত দিয়েছে। পোশাকের ভেতর দিয়ে ধনুকের মত বেঁকে আছে পেট। বাঘিনী চোখ নিচু করে কি যেন ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, খুশি, বড় জরুরী ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

অমন মিষ্টি 'খুশি' ডাক সে কখনো শোনেনি, তার রাগ গলে জল হয়ে গেল। সে বাঘিনীর দিকে তাকিয়ে দেখল। বাঘিনীর এমন কিছু দেহ সৌষ্ঠব নেই, সে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু কানে এখনো ঘুরছে সেই মিষ্টি ডাক—অমন ডাক সে আগে যেন কোথায় শুনেছে। এ যেন এক অন্ধ বাঁধন—ছিঁড়তে ইচ্ছে করলেও ছেঁড়া যায় না, মন চায় না। খুশি জিজ্ঞেস করল। তার স্বর এখনো নিচু, কিন্তু ভাবাবেগে ...।

কি ব্যাপার, বল?

খুশি। বাঘিনী তার কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়াল, খুশি, আমার—

কি হয়েছে তোমার?

এই যে। বাঘিনী পেটে হাত দিয়ে দেখাল, বলে দাও, এখন আমি কি করব? খুশির মাথায় হাত দিল, তার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। সে সব বুঝতে পেরেছে। হাজার হাজার এলোমেলো ভাবনা উড়ে আসছে তার চেতনায়—এত দ্রুত তাদের গতি, এত বিশৃঙ্খল তারা যে বুকে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড আলোড়ন স যেন কেমন হয়ে গেছে। একতাল শুভ্র শূন্যতা—না, তার চাইতে বেশি কিছু নয়। একটা ছায়াছবির পর্দা যেন, ছবি হঠাৎ মিলিয়ে গিয়ে শূন্যতা ফুটে উঠেছে। পথ জনশূন্য, উপরে আকাশে চাঁদ ধূসর মেঘে ঢাকা, শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে জোরে বইছে হাওয়া। বিড়ালের কান্না ভেসে আসছে, অশুভ কান্না।

খুশির মন একেবারে ফাঁকা—তার চারধারে প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাথা হেঁট করে চিবুক ধরে সে অনেকক্ষণ বসে রইল। মাটি যেন দুলে দুলে উঠছে। কিছুই সে ভাবতে পারছে না, ভাবতে চাইছে না। এই একটি মুহূর্তের উপরই

নির্ভর করছে তার জীবন, এর পিছনে শুধু শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

এখানে বসে থেকে কি হবে! ওঠ! বাঘিনীরও বুঝি ঠাণ্ডা লেগেছে, সে পথ চলতে চায়।

খুশি উঠে পড়ল। বাঘিনীর স্বরে ঠাট্টার আমেজ সে সইতে পারছে না। দুজনে চলতে লাগল উত্তর দিকে। কি সে বলবে, ভেবে পেল না। সারা দেহ যেন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। কোনো ব্যবস্থাই তুমি করবে না খুশি? বাঘিনী খুশির মুখের পানে তাকাল। তার স্বরে ভালোবাসা ঝরে পড়ছে।

খুশি চুপ করে রইল, কিছু বলতে পারল না।

সাতাশে তারিখ আসছে, সেদিন বুড়োর জন্মদিন। তুমি অবিশ্যি অবিশ্যি, এসো কিন্তু—

তখন যে ভারী ব্যস্ত থাকব, নতুন বছর আসছে না? খুশির সব গোলমাল হয়ে গেলেও আসলে সে ঠিকই আছে। নিজের কাজের কথা সে ভুলতে পারেনি।

তা আসবে কেন—আদর করে নেমন্তন্ন করলুম কিনা! গালাগাল না দিলে তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যাবে না। বাঘিনীর স্বর আবার কর্কশ হয়ে উঠল। রাতের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। খুশির মনে হোলো, এ তো স্বর নয়, পাগলের চিৎকার।

ভেবেছ আমি ভয় পেয়েছি। এখন যা বলবে, মুখ বুজে সব সয়ে যাব? আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি বাপু। আমার কথা না শুনলে, কি হয় দেখো। এ-বাড়িতেই কি টিকতে পারবে ভেবেছ! তিনদিন তিন রাত্তির গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব না। না না, আমি তর্ক-বিতর্ক করব না—কার দোষে ব্যাপারটা ঘটেছে খতিয়ে দেখতেও যাবো না।

না চেঁচিয়ে কথা বলতে পারো না? খুশি একটু দূরে সরে গিয়ে বলল।

ওঃ, আবার ধমক দিচ্ছেন! আমার চেঁচানো আজকে তো ভালোই লাগবে না, কিন্তু সেদিন তো ওসব কথা মনেই ছিল না, তখন মুফোত পেয়েছিলে? আজ আমি চেঁচিয়ে কথা বলি, আমার গায়ের গন্ধ অসহ্য হবেই। তারমানে পেটের কাঁটা আমিই বয়ে বেড়াব, তোমার গায়ে কোনো আঁচই লাগবে না। চোখের মাথা কি খেয়েছ, একবার তাকিয়েই দেখ না ছাই।

বেশ, তোমার যা বলবার আছে বলে যাও। খুশি এতক্ষণ বাঘিনীর কথা শুনছিল বটে, কিন্তু উত্তেজনা বোধ করেনি। এবার সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রতি রোমকূপ দিয়ে যেন গরম চুইয়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে গেছে, মাথাটা ঘুরছে।

ব্যাপারটা এইখেনেই শেষ হবে না। শুধু শুধু ঘোরালো করে করে লাভ কি বল? বাঘিনী হাসল, ওর নেকড়ে-দাঁত ফুটো বেরিয়ে পড়েছে। আমাকে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। আর তাছাড়া তোমার ভালোর জনেই তো বলছি বাপু! ষাঁড়ের মতো গর্দান ফুলিয়ে থাকলে কোনো ফলই হবে না—একথা বলে দিচ্ছি।

দেখো—খুশি বলতে চাইলে, আমার গালে থাবড়া কষিয়ে দিয়ে তারপর বারবার হাত বুলিয়ে দিলেও কোনো লাভই হবে না, কিন্তু পুরো কথাটা মনে করতে পারল না। পিকিঙ্-এ প্রচলিত অপভাষা সে একটু-আধটু জানে, কিন্তু বলতে গেলে কেমন গোলমাল হয়ে যায়। অন্য কেউ বললে সে বুঝতে পারে, কিন্তু নিজে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না।

কি বলবে বল? বাঘিনী রুখে দাঁড়াল।

না না, আমি কিছু বলতে চাই না, তুমিই বল?

দেখ, আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। বাঘিনী ওর কাছে এসে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল; তুমি মামুলি প্রথামতো ঘটক পাঠিয়ে বাবার কাছে প্রস্তাব কর, বুড়ো ঠিক অমত করবে। সে বহুরিক্সার মালিক, আর তুমি একজন সামান্য রিক্সাওয়ালা—সে অতো নিচে নেমে তোমাকে জামাই করতে রাজি হবে না। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা—আমি ওসব কেয়ার করি না। তোমাকে ভালোবাসি, সেই তো যথেষ্ট। তুমি কি কর না কর তা দিয়ে আমার কি দরকার?

কিন্তু বুড়ো ভারী সেয়ানা। নানা ফেঁকড়া তুলতে ওস্তাদ। আগে তো দেখেছি, যখনই কেউ আমার বিয়ের কথা পেড়েছে, বুড়ো তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। তার ভারী ভয়, আমাকে বিয়ে দিলেই খানকয়েক রিক্সা বেহাত হয়ে যাবে। তোমার চাইতে ঢের ঢের বড়োলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে, ভেঙে গেছে, আমার যেমন বরাত, আইবুড়োই রয়ে গেলাম। তাই এবার ঠিক করেছি, নিজেই একটা সোয়ামী যোগাড় করে নেব, তা তোমাকেই আমার পছন্দ। তাছাড়া তুমি তো আমার সর্বনাশ করে ছেড়েছ—এখন তো আর ছেড়ে পালাতে পারবে না!

কিন্তু তাই বলে এখুনি তোমার হাত ধরে বাপের বাড়িতে গিয়ে ঢুকছি না। বুড়োর আজকাল ভীমরতি ধরেছে। কোনো রকমে ব্যাপারটা টের পেলে, কি জানি হয়তো একটা ছুঁড়ীকেই বিয়ে করে বসবে। তখন তো একুল ওকুল দুইই যাবে। সত্তর বছর বয়েস হলে কি হবে, এখনো বেশ শক্ত। বিয়ে করলে এখনো দু-তিনটে ছেলে মেয়ের জন্ম দিতে পারে—একথা আমি তোমাকে হলফ করে বলতে পারি।

চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি, খুশি দেখতে পেল বীটের পাহারাওয়ালাটা আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।

না, এইখানেই কথা বলব। কে বাধা দেয় দেখি? এবার পাহারাওয়ালার দিকে তার নজর পড়ল। কি হয়েছে? তুমি তো আর এখন 'রিক্সা চালাচ্ছ না যে ওকে ভয় করতে হবে? বিনা কারণে ও এসে আমাদের কামড়ে দেবে না। যা বলছিলাম শোনো, মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

এখন আমার ফন্দিটা তোমাকে বলি। বুড়োর জন্মদিন সাতাশে তারিখে, সে দিন তুমি অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে। নতুন বছরের দিনও গিয়ে একবার দেখা করে আসবে। 'তোমার উপর এমনিই বুড়ো খুশি, আরো খুশি হয়ে যাবে। আমিও থাকব, সুযোগ বুঝে বুড়োকে কয়েক পেয়ালা মদ খাইয়ে দেবখন, বুড়ো মদ খেলে একেবারে গলে জল হয়ে যায়। তুমি তখন কথা পাড়বে যে, তোমার বাবা নেই, সে-ই তোমার ধর্মবাপ।

তারপর কয়েকদিন গেলে আমি ব্যাপারটা ভেঙে বলব। বুড়ো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করবে? আমি গল্পের সেই জেনারেল চাও-এর কাছে বন্দী করে আনা সেনাপতির মতোই ভাণ করব। প্রথমটায় এমন চুপ করব, যেন লজ্জায় কোনো কথাই বলতে পাচ্ছি না, তখন বুড়ো নিশ্চয়ই খেপে যাবে। তখন চিয়াওর নাম বলব। দিন কয়েক হোলো সে মারা গেছে। তার আত্মীয় স্বজনও নেই, বুড়ো তাকে আর ধরবে কোত্থেকে?

বুড়ো ভেবে কুলকিনারা করতে পারবে না, ঠিক এমনি সময় হাওয়াটা তোমার দিকে বইয়ে দেব, যাতে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার। তার পথও তখন খানিকটা তৈরী হয়ে গেছে, বুড়োকে তুমি ধর্মবাপ ডেকেছ, তোমাকে জামাই করতে দোষ কি! এমনি করেই এই বিচ্ছিরী ব্যাপারটার সুরাহা হবে। কি, ফন্দিটা মনে ধরেছে তো?

খুশি কোনো কথা বলল না, চুপ করে রইল।

বাঘিনী কথা শেষ করে উত্তর দিকে চলতে শুরু করল। মাথা নিচু করেই সে চলছে, মনে মনে নিজের অভিনয়ের নিজেই তারিফ করছে। খুশি তার পেছনে।

হঠাৎ হাওয়া ধূসর মেঘের আস্তরণে ফাটল ধরিয়ে দিল, চাঁদের আলো চলকে পড়ল পথের উপর। নিষিদ্ধ নগরী। চারদিক নির্জন, কোথাও একটি টু শব্দ নেই—অন্ধকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীর, প্যাগোডার চুড়া দেখা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় তারা যেন স্বর্গীয় কোনো বাণীর প্রতিধ্বনির শেষ রেশটুকু শুনবার জন্য কান পেতে উন্মুখ হয়ে আছে। দেয়ালের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেল, নিষিদ্ধ নগরীর কন্দরে কন্দরে তারই সাড়া জাগল। কি বলছে

বাতাস কে জানে? হয়তো কোনো পুরনো দিনের রূপকথাই ফিস ফিস করে বলে গেল।

বাঘিনী পশ্চিম দিকে চলেছে, তাকে অনুসরণ করছে খুশি। মর্মর সেতু নির্জন—পথিকের পদধ্বনির শব্দ উঠছে না। রাতের আলো-আঁধারে সেতুর দুপাশে বরফের বিরাট বিস্তৃতি জ্যোৎস্নায় ঝলসে উঠছে। পথিককে যেন সে বলছে, ওরে তুই একা, একা। খুশি শিউরে উঠল, এগুবার আর তার সাহস নেই।

যখন সে রিক্সা নিয়ে সেতুর উপর দিয়ে চলে যায়, পা পিছলে যাওয়ার ভয়ে দুপাশে তাকিয়ে দেখে না। কিন্তু আজ চারিদিকে সে তাকিয়ে দেখল। দুপাশে ছড়িয়ে আছে বরফ—চাঁদের আলো এসে পড়েছে—সুন্দর বটে কিন্তু ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বরফ; গাছের ছায়া দুলে দুলে উঠছে, বিষণ্ণ শুভ্রতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট প্যাগোডা—সবই যেন কেমন নিঃসঙ্গ। খুশির ভয় হোলো, এখুনি হয়তো ওরা চিৎকার করে উঠবে, পাগলের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কি সাদা সেতুটাও যেন অপরিচিত, নিতান্ত অবাস্তব; পথের আলোগুলোর চাউনি কি করুণ। সে আর এক পা নড়বে না, চারদিকে তাকাবেও না। বাঘিনীর সঙ্গে যেতে তার ইচ্ছে নেই। কিন্তু কি সে করবে? খুশি ভেবে শিউরে উঠল। সেতুর উপর থেকে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, বরফের ভিতরে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে চায়, প্রকাণ্ড মরা মাছের মত বরফে জমে যেতে চায়।

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কাল দেখা হবে। তারপর জোরে চলতে লাগল। খুশি, সাতাশে আসছ তো? বাঘিনী ছুড়ে মারলে কথাটা। তারপর প্যাগোডার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করল।

খুশি একবার ফিরেও তাকাল না। তার পাশে পাশে যেন সয়তান চলছে, হঠাৎ একটা দেয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল। সে কাঠের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

খুশি, খুশি, এদিকে এস। আবার বাঘিনীর স্বর। কয়েক পা সে এগিয়ে গেল, বাঘিনীও ফিরে এসেছে।

একটা জিনিস দেবার জন্যেই ফিরে এলাম। বাঘিনী তার কাছে এসে দাঁড়াল। তোমার সেই কিছু দিয়ে পুরোপুরি তিরিশ ডলার করে দিয়েছি। এই যে নাও। এবার ভেবে দেখ, আমি ভালো না মন্দ। সত্যি তোমার কথাই তো সারাক্ষণ ভাবি, তোমার জন্যে আমার ভাবনার অন্ত নেই। যাক মুখে বলে আর কি হবে, কিন্তু সময়কালে এই উপকারটুকু ভুলে যেও না। এই নাও, এখন হারালেও আর আমাকে দুষতে পারবে না।

খুশি নোটগুলি নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কথা বলতে সে বুঝি ভুলে গেছে।

যাক্ সাতাশে তো দেখা হচ্ছেই—দেখা না হলেও তোমাকে সহজে ছাড়ছিনে। বাঘিনী হাসল। তা তুমিতো বাপু জিতে যাচ্ছ। ভালো করে ভেবে দেখ, বুঝতে পারবে। বাঘিনী চলতে শুরু করলে।

নোটের তাড়া নিয়ে খুশি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বাঘিনীকে আর দেখা যায় না, সেতুর আড়ালে পড়ে গেছে। ধূসর মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে, উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে পথের আলোর সার; সেতুটা আরো সাদা, আরো শূন্য দেখাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। বাড়ির ফটকে এসেও মনে হোলো, সেই ঠাণ্ডা সাদা সেতুটা যেন তার কাঁধে চেপে বসেছে, চোখ ফেরালেই তাকে সে দেখতে পাবে।

নিজের ঘরে গিয়ে সে নোটগুলি গুনে দেখল। তিন তিনবার গুনল, মাথার ঘাম নোটের উপর ঝরে পড়ল, চটচটে হয়ে উঠল নোটের তাড়া, কিন্তু তবু গুনতিতে ভুল হতে লাগল। গোনা শেষ করে চীনেমাটির ঘটে নোটগুলি গুঁজে রাখল। চিন্তা সে করল না। টাকা যখন আছে, পথ একটা সে হবেই। সব সমস্যার সমাধান করে দেবে তার সঞ্চয়। ভেবে কি হবে। সাদা প্যাগোডা, মর্মর সেতু, বাঘিনী, তার প্রকাণ্ড পেট—ও সব কিছু নয়, স্বপ্ন। স্বপ্ন ভেঙে গেলে তার চীনামাটির ব্যাঙ্কের সাঁইত্রিশ ডলার সত্য হয়ে থাকবে।

ঘটটা সে লুকিয়ে রাখল। এবার ঘুমানো দরকার। বিপদ তোমার যত বেশিই হোক, ঘুম ঠিক সময় মত পাবেই। আজ সে ঘুমিয়ে নেবে, ও সব নিয়ে আলোচনা করবার সময় তো বহু পড়ে আছে।

খুশি বিছানায় শুয়ে পড়ল, চোখে ঘুম এল না। বোলতার চাক যেন মনটা—ভাবনা আসছে যাচ্ছে। কিন্তু হুল ফুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঠিক।

না, ভাবতে সে চায় না, আর ভাববারও কিছু নেই। বাঘিনী সমস্ত পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাত থেকে পালানো মুশকিল।

সবচেয়ে ভালো হয়, সে যদি শহর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু খুশি শহর ছাড়তে পারবে না। কেউ যদি বলেন, শহরে থাকতে হলে সাদা প্যাগোডা দিন রাত্রি পাহারা দিতে হবে, সে তাতেও রাজি, তবু শহর ছেড়ে একপাও নড়বে না। গাঁয়ে সে যাবেই না। অন্য শহরে যাবে? পিকিঙের মতো শহর আছে না কি? সে পিকিঙ-এ আজীবন থাকবে, এখানেই সে মরবে।

ছেড়েই যখন যেতে মন নেই, তখন ওসব ভেবে লাভ কি? বাঘিনী যখন যেতে বলেছে, যেতেই হবে। তার কথা মতো না চললে, এই ব্যাপার নিয়ে সোরগোল না তুলে ছাড়বে না। পিকিঙ-এ থাকলে বাঘিনী তাকে খুঁজে বার

করবেই। ওর হাত এড়াবার কথাই ওঠে না। ওকে চটালে হয়তো ন'কর্তাকেই সবকথা বলে দেবে। তার তাঁবে আবার সেরা গুণ্ডার দল আছে—যে কোনো সময়ে খুশির দফা রফা করে দেবে।

খুশি আগাগোড়া ব্যাপারটা খতিয়ে দেখল, সে ফাঁদে পড়েছে; হাত পা যেন ইস্পাতের বেড়ি দিয়ে বাঁধা—বাঘিনীর জালে সে জড়িয়ে পড়েছে, ছোট্ট মাছের মতো ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে পড়বে—সে উপায়ও নেই।

বাঘিনী তার বিরুদ্ধে ফন্দি এঁটেছে বটে! ভাবতে গেলেই মাথা ঘুরে যায়। মনে হয়, হাজার মণ ভারী পাথর যেন তার কাঁধে চেপে বসেছে, তাকে পলে পলে পিষে মারতে চাইছে। প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। তা রিক্সাওয়ালার বরাত আর কতোই বা ভালো হবে? রিক্সা টেনে টেনেই জান দিতে হবে, অন্য কিছু করবার কাজ নেই। এমনকি একটা মেয়ে তাকে ঠকিয়ে গেল! এখন তাই নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছে। ন'কর্তা দশগণ্ডা রিক্সার মালিক, আর তার মেয়ে তো পয়লা নম্বর ধড়িবাজ। কেমন জোচ্চুরীর কল পেতেছে! খুশির কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে তবে সে খুশি হবে।

না, ভেবেও লাভ নেই। আচ্ছা, ওর কথা মতোই যদি সে কাজ করে? ন'কর্তার কাছে গিয়ে তাকে ধর্মবাপ ডাকবে, তারপর ঐ শয়তানটাকে বিয়ে করে ফেলবে—কেমন হয় তাহলে? আর তাছাড়া উপায়ও নেই—বাঘিনী ওকে সহজে ছেড়ে দেবে না। এ যে বিয়ে করলেও সর্বনাশ, না করলেও সর্বনাশ।

সে যেন তোমার একটা কুকুর, মার খাওয়াই যার অভ্যাস। আশেপাশের ছেলেমেয়েরাও অকারণে তাকে লাঠিপেটা করে যায়। এই তো বরাত—ভেবে আর কি হবে? সে গুঁড়িয়ে যাবে, রেণু রেণু হয়ে যাবে—এই যখন তার বরাত তখন আর পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। যা আছে বরাতে তাইই হোক।

ঘুমুতে সে পারল না। কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসল। এখন মদ চাই, চোঁ চোঁ করে এক বোতল মদ খেয়ে সে এই ভাবনা তলিয়ে দেবে, মাতাল হবে। তাহলে বুঝি সব ভাবনা চিন্তা, রীতি নীতি সে জলাঞ্জলি দিতে পারে। হাঁ হাঁ, মাতাল হবে, বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকবে! সাতাশে তারিখ? না না, সে কারো পায়ে মাথা খুঁড়তে যাবে না, কাউকে ধর্মবাপ বলতেও পারবে না, তা সে সাতাশে কি আটাশে যে তারিখই আসুক না। দেখি তাকে দিয়ে কেমন করে বাপ বলায়?

কামিজটা গলিয়ে হাতে চায়ের বাটি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

হাওয়া আরো জোরে বইছে; আকাশে এক চিলতে মেঘ নেই; সব হাওয়ায় উড়ে গেছে। চাঁদ আকাশের এক টেরে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কেমন মরাচাউনি যেন। কনকনে ঠাণ্ডা। সবে সে গরম বিছানা থেকে উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা যেন

কামিজ ফুঁড়ে শরীরে ঢুকছে, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে। পথে একজন লোকও চলছে না, একধারে খানকয়েক রিক্সা থেমে আছে। রিক্সাওয়ালারা জোরে হেঁটে গা গরম করে নিচ্ছে, কান হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

এক ছুটে খুশি দক্ষিণ দিকের দোকানটায় ঢুকে পড়ল। জানলা দরজা বন্ধ, একটা ছোট ফোঁকর তার ভিতর দিয়েই বেচাকেনা চলছে। খুশি কিছু বাদাম আর মদ কিনল। তার পর পেয়ালাটা নিয়ে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

মদের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রয়েছে, পানসে গন্ধে ভরে গেছে ঘর। খেতে ইচ্ছে করছে না।

অনেকক্ষণ সে চুপ করে শুয়ে রইল। মদের পেয়ালাটা টেবিলের পাশে রয়েছে। হাত বাড়িয়ে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিলেই হোলো। না, সে নিজের সর্বনাশ করতে পারবে না। জড়িয়ে পড়েছে তো কি হয়েছে? মদ সে ছোঁবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল—সে প্রতিজ্ঞা ভাঙবার তার সাধ্য নেই। ব্যাপারটা খুবই ঘোরাল বটে, কিন্তু এতটুকু একটা ছেঁদাও কি মিলবে না, যার ভিতর দিয়ে সে বেরিয়ে আসতে পারে? আর বেরিয়ে আসতে না পারলেও, মদ খেয়ে সে আরো সর্বনাশ টেনে আনতে চায় না—একটা গর্ত থেকে বাঁচতে গিয়ে আর একটা গর্তে পড়তে সে রাজি নয়। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়?

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল, এইভাবে কিছুক্ষণ থাকলেই ঘুম পাবে। কিন্তু ঘুম এল না। কম্বল ছুড়ে ফেলে উঠে বসল। চাঁদের আলো কাগজের শার্সির উপর আবছা হয়ে এসেছে, শীগ্‌গিরই ভোর হবে। নাকের ডগা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মদের গন্ধ উঠছে, ক্ষীন গন্ধ। হঠাৎ সে হাত জড়িয়ে পেয়ালাটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিল।

দশ

লড়িয়ে ফড়িঙ লড়াইয়ে তার গোদা গোদা ঠ্যাঙ-এর সাহায্যে কোনোরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে—খুশির হোলো ঠিক সেই দশা। জীবনের কোনো মানেই সে আর খুঁজে পেল না। এখন দিনের পর দিন কোনোরকমে কাটিয়ে দিলেই হোলো। জীবনের লক্ষ্য সে হারিয়ে বসে আছে, লাফিয়ে চলার পথে পড়েছে বাধা। এ যেন ঠ্যাঙ হারানো ফড়িঙ। একদিন সাহস ছিল, ছিল শক্তি; আজ আর কিছুই নেই।

সাতাশে তারিখের এখনো দশ দিন বাকি—কিন্তু এরই মধ্যে ঐ দিনটার ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, আর কিছু সে ভাবতে পারে না, বিড়বিড় করে সে শুধু ঐ নামটাই উচ্চারণ করছে, সাতাশে তারিখেরই স্বপ্ন দেখছে। কোনো রকমে ঐ সর্বনেশে দিনটা যদি সে পার হয়ে যেতে পারে, সে উদ্ধার পাবে, জীবনের পথ সহজ সরল হয়ে যাবে। কিন্তু উদ্ধার কি পাবে? সে তো জানে, উদ্ধার পাবার তার কোনো উপায়ই নেই।

আচ্ছা, যদি এখান থেকে দূরে চলে যায়? যে কটা টাকা হাতে আছে নিয়ে সে সরে পড়তে পারে, টিয়েণ্টসিনে যেতে পারে? সেখানে গিয়ে রিক্সা টানা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করবে—ভাগ্যে থাকলে ফেঁপেও উঠতে পারে। আচ্ছা, বাঘিনী যদি সেখানেও ধাওয়া করে? দূর—অত দূর সে আর যাবে না। খুশির বিশ্বাস, ট্রেণে দূরের পথেই যেতে হয়, বাঘিনী অতদুর যেতে সাহসই করবে না।

ফন্দিটা চমৎকার বটে! কোনো উপায় না থাকলে টিয়েণ্টসিনেই সে পালাবে। কিন্তু পিকিঙ-এ থাকতেই তার ইচ্ছে। কোনো রকমেই কি এখানে থাকা যায় না। অনেক সে ভাবল, ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল। সাতাশে তারিখ এগিয়ে আসছে। কোনো রকমে সে যদি এড়িয়ে যেতে পারে তাহলে বেঁচে গেল। আর যদি তা সম্ভবও না হয়, সাতাশে তারিখ তাড়াতাড়ি চলে গেলেই ভালো, যা হবার হবে। এই অস্বস্তি সে আর পোয়াতে পারে না। তারিখটা চলে গেলে আর তো ফিরে আসবে না!

কিন্তু কি করে সে এই তারিখটাকে পাশ কাটিয়ে যাবে? দুটো ফন্দি তার মাথায় ঘুরছে। এক হয়, বুড়োর জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যদি সে না যায়। আর একটা উপায়ও আছে। তেমন তেমন বুঝলে বাঘিনীর কথামতোই সে

কাজ করবে। দুটো ফন্দি যদিও একেবারেই আলাদা, কিন্তু ফল বোধ হয় একই হবে। সে নিমন্ত্রণ রাখতে না গেলে ব্যাপারটার যুতসই কোনো ফয়সালাই হবে না; আর গেলে তো কথাই নেই। বাঘিনী ছেড়ে দেবে না, শাস্তি তাকে দেবেই।

তার মনে আছে, যখন প্রথম রিক্সা চালাতে শুরু করে, অন্য রিক্সাওয়ালাদের সে নকল করত। গলি ঘুঁজি দেখলেই সে রিক্সা নিয়ে ঢুকে পড়ত—ভাবতো এতে পথ অনেকখানি সোজাই বুঝি হবে। একবার মুশকিলেও পড়েছিল। গলির গোলক ধাঁধায় পড়ে হয়রান হয়েছিল। সে এক মজার ব্যাপার। যতোই সে ছোটে, দেখে সেই একই জায়গায় বার বার এসে পড়ছে। এমনি একটা গোলক ধাঁধায়ই সে পড়েছে। যেদিকেই সে ছুটুক, একই জায়গায় তাকে ফিরে আসতে হবে।

অন্য কোনো সমাধান খুঁজে না পেয়ে, ব্যাপারটার ভালো দিকটাও ভেবে দেখেছে। ধর, বাঘিনীকে বিয়ে করে সে যদি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে? আর তা করবেই বা না কেন? কিন্তু যতবার সে এইদিক দিয়ে ব্যাপারটা ভেবেছে, সব গোলমাল হয়ে গেছে। দম বন্ধ হয়ে এসেছে, মেয়েটার স্বভাব, তার চাউনি, তার ধরন-ধারণ—উহুঁ মোটেই তার পছন্দ হয় না। চেহারার কথা চুলোয় যাক—ওর স্বভাবের জন্যেই ওকে বিয়ে করা চলে না!

তার মতো ছেলে, কত আশা আকাঙ্ক্ষা তার, তাছাড়া এমনিই বেশ শান্তশিষ্ট—সে কিনা—নিলামে কেনা মালের মতোই বহু হাত ঘোরা একটা মেয়েকে বিয়ে করবে। তাহলে যে কারো সঙ্গে আর চোখ তুলে কথা বলতে পারবে না। এমনকি মরবার পর বাপ-মার আত্মার কাছে মুখ দেখানোও শক্ত হবে। কে জানে, ওর পেটের সন্তান? হয়তো খুশিরই নয়। অবিশ্যি, কয়েকখানা রিক্সা সে যৌতুক হিসেবে পেতে পারে—কিন্তু তারই বা ঠিক কি? ন'কর্তাকে তো সে চেনে। হয়তো, মেয়েকে একগাছা ঝাঁটাও তিনি দেবেন না। আর যৌতুক পেলেই বা কি? অমন একটা ধাড়ী মাগিকে নিয়ে সে দিন কাটাবে কি করে?

বাঘিনীর সঙ্গে মিলে মিশে সংসার করা খুব সহজ নাকি? তার হুকুমে ছুটতে ছুটতেই তো বেচারার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মনটা বাঘিনীর বড় নীচু, তাছাড়া জিভেও খুব ধার। সংসার করতে হলে অমন বৌ নিয়ে চলে না! ওকে বিয়ে করলে দুদিনেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হবে।

নিজের উপর তার ঘেন্না হোলো। ছিঃ ছিঃ, সে একি কাণ্ড করে বসল। নিজের গাল নিজেই চড়াতে ইচ্ছে করছে। তা তারই বা এমন কি দোষ? সমস্ত ব্যাপারটা বাঘিনীর সাজানো। সে ফাঁদ পেতে খুশির জন্যেই বসেছিল। তার মনে

হোলো, সে ভালো মানুষ হয়েই গোল বেঁধেছে। ভালো মানুষরাই তো পদে পদে এমনি করে ঠকে।

সব চাইতে খারাপ লেগেছে: এমন একটা বিপদ, অথচ মুখ ফুটে কাউকে বলবার উপায় নেই। বললেও তো খানিকটা মনের ভার কমে। কিন্তু কে আছে তার? বাপ মা, বড় ভাই, ছোট ভাই, এমন কি একটা বন্ধু পর্যন্ত নেই—যার কাছে সে সব কথা খুলে বলতে পারে, পরামর্শ চাইতে পারে। অবিশ্যি, পরামর্শের এতদিন তার দরকার হয়নি। তাগড়াই চেহারা নিয়ে হানের বংশধর সে মাথা উঁচু করেই চলছে, কিছুই কেয়ার করেনি। কোনো বন্ধনই তার ছিল না। ছিল না কোনো উদ্বেগ। সে যেন ছিল রূপকথার এক দৈত্য—স্বর্গে ঠেকেছে মাথা—পা রয়েছে মাটিতে। আজ কিন্তু সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, কেউ একা থাকতে পারে না, সকলের সঙ্গে মিলে মিশেই থাকা উচিত।

তার ভাই-বেরাদার রিক্সাওয়ালারাও একেবারে ফেল্‌না নয়। তাদের মধ্যেও এমন জিনিস মেলে, যার জন্যে তাদের ভালোবাসা যায়, বন্ধু বলে কাছে টেনে নেওয়া যায়। ধর, সে যদি আগে তারই মত জোয়ান দু-একজন রিক্সাওয়ালার সঙ্গে মিতালি পাতাত, তা হলে আজ ভয়ে তাকে কুঁকড়ে যেতে হোতো না। অমন দুটো বাঘিনীকে সে দেখে নিত। তার বন্ধুরাই উপায় বাতলে দিত, এমন কি দরকার হলে সাহায্য করতেও পেছপা হোতো না। কিন্তু প্রথম থেকেই সে একা। এখন বিপদের সময় বন্ধু জোগাড় করাও সহজ নয়। খুশির কেমন ভয় হোলো। এমনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটালে ভয় তো হবেই। একা মানুষ কি করতে পারে? তাকে যে-কেউ ঠকাতে পারে, তার উপর হুকুম চালাতে পারে। আর বাঘিনী তো একা পেয়ে তাই‌ই করে গেল।

নিজের উপরও তার আর বিশ্বাস নেই। শীতের দিনে মনিব নিমন্ত্রণ খেতে বা অভিনয় দেখতে গেলে, পথে অপেক্ষা করতে হোতো। খুশি তখন কারবাইড বাতির নিচের জল রাখবার পাত্রটা খুলে এনে নিজের কামিজের উপর রাখত। কি জানি, শীতে যদি জল জমে বরফ হয়ে যায়, তাহলে বাতি আর জলবে না। জলের পাত্রটা কামিজের উপর রাখতেই কাঁপুনি লাগত তার শরীরে! কিন্তু খানিকক্ষণ পরে জলের পাত্রটা যখন একটু গায়ের গরমে গরম হয়ে উঠত, তখন সে ভাবত ঝরঝরে পুরনো রিক্সা টানে যারা, তাদের তো আর কারবাইড বাতি নেই।

কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে, একি ভুয়ো গর্ব। সে বুঝতে পারছে একটা কারবাইডের বাতিদানের সে যা মূল্য দিত, ততটুকু মূল্যও তার চওড়া ছাতিখানার নেই। প্রথম সে রিক্সাটানাকেই জীবনের একমাত্র আদর্শ করে নিয়েছে। সে একদিন

ব্যবসা ফেঁদে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারবে এই ছিল তার আশা। খুশি মাথা নাড়ল। সে আশা তার গুঁড়িয়ে গেছে। তার কাঁধে চেপেছে বাঘিনী। একটা টিনের বাতির যা দাম, সে দামও তার নেই।

বাঘিনী চলে যাওয়ার তিন দিন পরের কথা। শ্রীযুক্ত চাও বন্ধুদের নিয়ে রাতে সিনেমা দেখতে গেছেন। খুশি রিক্সা থামিয়ে একটা কারখানায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কারবাইডের পাত্রটা রইল তার কাছে। দুরন্ত শীত পড়েছে, কারখানার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। ভিতরে কয়লার ধোঁয়া, ঘামের গন্ধ আর সস্তা সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। শার্সিতে বরফ জমে উঠছে, ফুলের মতো সাদা বরফ।

চা-খানায় যাঁরা ভিড় করছে, তার মধ্যে বেশির ভাগই মাইনের রিক্সাওয়ালা। কেউ কেউ চেয়ার নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসছে। কারো হাতে মদ ভরতি পেয়ালা, আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে, ঠোঁট চাটছে, ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ছে। শীত তাড়াবার এ যেন এক অমোঘ ঔষধ। একজনের সুমুখে প্রকাণ্ড এক ডেলা কেক, ভেঙ্গে ভেঙ্গে মুখে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে গলায় বেঁধে যাচ্ছে, কে একজন নিজের কথা বলছে, অন্য সবাই কান খাড়া করে শুনছে। সেই ভোর থেকে এই পর্যন্ত তার পা একবারো জিরোয়নি, ঘাম ঝরে কতবার যে শুকিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। যারা খোশগল্প করছিল, তারাও ফিরে তাকাচ্ছে, চুপ করে গেছে। নিজের দুঃখের কথা মনে পড়ছে। এবার সবাই নিজের দুঃখের কথা বলতে লাগল। এক ঝাঁক পাখী যেন বাসা ভেঙে গেছে, পরস্পরকে দুঃখের কথা বলছে।

যে লোকটা কেক খাচ্ছিল, সে কেক উগরে ফেলে ওদের সঙ্গে এসে জুটেছে। কপালের শিরা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কেকের টুকরো গিলতে গিলতে কথা বলছে।

সেই ভোর থেকে ছুটছি তো ছুটছিই। এক বালতি জল তোলা বা এক হাঁড়ি ভাত রাঁধবার সময় হয়নি। বেটা বেজম্মার হুকুম—এ-ফটক থেকে সে-ফটকে ছুটে ছুটে হায়রান হয়ে গেছি সাঙাৎ! একেবারে জমে গেলাম ভাই।

শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে সে মাথা নাড়ল তারপর কেকের আর একটা ডেলা মুখে পুরে দিল।

এবার কথার মোড় ফিরল আবহাওয়ার দিকে, কিন্তু সেও দুঃখ-দুর্দশারই কথাকে কেন্দ্র করে।

খুশি দুঃখ বুঝে বসে রইল, শুধু কান রইল সজাগ! তাদের ভাষা আলাদা, স্বর আলাদা, দুঃখ-দুর্দশার কাহিনীও তাই—কিন্তু এই ভাগ্যের অসাম্যের বিরুদ্ধে তারা ফুঁসে উঠছে, এই অবিচারের জন্য দিচ্ছে অভিশাপ।

শুকনো খটখটে মাটি যেমন বৃষ্টিধারা শুষে নেয়, তেমনি করে খুশির বুকের

ক্ত কথাগুলো শুষে নিল। তার নিজের বুকেও যে অমনি জ্বালা ফুঁসে উঠছে, চাকে বার করে দেওয়ার পথ সে খুজে পাচ্ছে না। শুধু অন্যের কাহিনীর জ্বালা এসে তার বুকের জ্বলুনি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওরা সবাই নিপীড়িত, বিপন্ন; সেও ওদের একজন। ওদের জন্য আজ তার সহানুভূতি জেগেছে। নিজেকে আজ সে চিনেছে, চিনেছে নিজের জাতকে! ওদের কাহিনী শুনতে শুনতে তার চোখ ছলছল করে এসেছে, মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে গেছে উত্তেজনায়; হাসির কথায় তারও ঠোঁট চিরে বেরিয়েছে হাসি, সে এখন ওদেরই একজন—দুঃখ-দুর্দশা ওদের একসূত্রে বেঁধেছে। খুশি কোনো কথা বলল না, কিন্তু তার মনে হোলো—হাঁ ওদেরই একজন, সে ওদেরই একজন।

আগে আগে সে ভাবত, না, ওদের সঙ্গে মিশে কাজ নেই। ওরা শুধু গালাগাল আর দিনরাত নিজের দুঃখের ফিরিস্তি দিতেই জানে, ওরা কি কখনো অবস্থা ফেরাতে পারবে? সে ঘেন্নায় ওদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। আজ কিন্তু সেদিন আর নেই। আজ তার মনে হোলো, ওরা যেন সমস্বরে তার নিজের কথাই বলছে—সে কথা ওদেরও কথা, সত্তা তাদের এক হয়ে গেছে। তারা মিলিত সত্তা নিয়ে অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেল, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল। সবাই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, কে, কে দোর খুলল? উঠোনে একজন লোককে দেখা গেল। দেরি করেই ঘরে ঢোকবার ইচ্ছে তার। চা-খানার একটা লোক চিৎকার করে বলল, তাড়াতাড়ি ঢুকে পড় না খুড়ো! ঘরের গরমটুকু যে উবে গেল।

লোকটি এবার এসে ঘরে ঢুকল। সেও রিক্সাওয়ালা। পঞ্চাশ বছরের উপরে বয়েস হবে। গায়ে তুলোর কোর্তা, ছিঁড়ে বেতের ভাঙা বাক্সের মতোই হয়ে গেছে, ফাতার তুলো বেরিয়ে পড়েছে, মুখ দেখে মনে হয় বহুদিন স্নান হয়নি; গায়ের রং বোঝবারও উপায় নেই—শুধু কান দুখানা গাছপাকা আপেলের মতো টুকটুকে লাল হয়ে আছে। মাথায় ছোট্ট টুপি; তার চারপাশ দিয়ে পাকা চুল ঝুলে পড়েছে, দাড়িতে বরফের গুড়ো। ঘরে ঢুকেই একটা বেঞ্চের উপর চুপ করে বসে পড়ে বলল, এক পাত্তর চা নিয়ে এস!

এই চা-খানাটা মাস মাইনের রিক্সাওয়ালাদের আড্ডা। এখানে ছুটো রিক্সা-ওয়ালারা বড় কেউ বিশেষ কারণে ছাড়া আসে না। তাই সবাই নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল। অন্য সময় হলেই দুএকটা চ্যাংড়া ছোঁড়া হয়তো কিছু বলে বসত। ওদের জ্ঞানগম্যি বড় কম কি না! কিন্তু আজ রাতে তারাও চুপ করে রইল।

চা আনতে দেরি হচ্ছে। বুড়ো এরই মধ্যে ঝিমুতে শুরু করেছে নাকি! মাথাটা নুতে নুতে বেঞ্চের উপর মুখ নেমে এল, বুড়ো বেঞ্চি থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

সবাই উঠে দাঁড়াল। কি হোলো? কি হোলো? চারদিকে গোলমাল। সবাই বুড়োর কাছে ছুটে গেল।

ভিড় জমিওনা, যে যেখানে ছিলে সেইখানেই গিয়েই বোসো। চা-খানার মালিক ভিড় সরিয়ে দিয়ে নিজেই বুড়ো রিক্সাওয়ালাকে তুলে ধরে বসিয়ে দিলেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, জলদি চিনি মিশিয়ে খানিকটা জল নিয়ে এস!

তারপর তার বুকে কান পেতে কি শুনলেন। না, ঠিকই আছে।

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে, তারই ভিতর দিয়ে বুড়োকে দেখা যাচ্ছে, স্তূপের মতো পড়ে আছে; টুপি ঠিকরে পড়েছে ঘরের এক কোণে, পাকা চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তাদের মনে একই চিন্তা:

আমাদেরও তো এই দশাই হবে। যখন চুলে পাক ধরবে, জীবনে এমনি করেই নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে। কয়েকটা পয়সার জন্যে একদিন সোয়ারি নিয়ে ছুটতে ছুটতে পা হড়কে রিক্সাখানা আর প্রাণটা—দুইই চলে যাবে। এই তো জীবনের দাম।

চিনির জল মুখে দিতেই বুড়ো দুতিনবার নিশ্বাস ফেলল, গলায় ঘড় ঘড় করে শব্দ হোলো, বুড়ো হাত তুলল—কি হয়ে গেছে হাতখানা—কে যেন আল্‌কাতরার পোঁচ দিয়ে দিয়েছে।

বুড়ো, আর একটু জল খাও, চা-খানার মালিক তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন। বুড়ো চোখ খুলল। উঠে বসবার চেষ্টা করছে।

আগে এই জলটুকু খাও, অত তাড়া কিসের? মালিক বললেন।

সবাই এবার ছুটে এল তার কাছে।

বুড়ো বাটিটা নিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিল। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে চোখ তুলে বলল, তোমাদের সবাইকে খুব কষ্ট দিলাম। কথায় ফুটে উঠেছে ভদ্রতা, উষ্ণ অনুভূতি—

এমন কথা যে ঐ বেঁকে যাওয়া গুঁফো মুখ থেকে বেরুতে পারে একথা কি কেউ ভাবতে পারে! সে আবার উঠে বসতে চেষ্টা করল। তিন-চারজন তাকে সাহায্য করতে ছুটে এল। বুড়ো হেসে বলল, আমি নিজেই উঠতে পারব। এমন কিছু তো হয়নি। খিদে পেয়েছিল, ঠাণ্ডায় কালিয়ে গিছলাম। তাই মাথা ঘুরে পড়ে গেছি। ও আর এমন কি ব্যাপার!

মুখে তার সাতপুরু ময়লা পড়ে বটে, কিন্তু তার হাসি আর ব্যবহার কি চমৎকার। সবার মনে হোলো, ঐ ময়লার নিচে লুকিয়ে আছে খাঁটি মানুষ। সে উষ্ণ অনুভূতির ছোঁয়া এসে লাগছে, তাদের ভিতরে সংক্রামিত হচ্ছে।

সবাই যেন গলে গেল। আধাবয়েসী যে লোকটি মদ খাচ্ছিল, সে তার লাল চোখ তুলে তাকাল। চোখ জলে ভরে গেছে। ওহে, আমাকে আরো দুবোতল দিয়ে যাও। মদ আসবার আগেই ওরা বুড়োকে ধরে তার পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিল। আধাবয়েসী লোকটি একটু মাতাল হয়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে ভদ্রতা হারায়নি। বুড়োর সুমুখে বোতল রেখে সে তাকে অনুরোধ করল :

এস বুড়ো কর্তা, তোমার সঙ্গে বসে একটু মদ খাওয়া যাক। চল্লিশ বছর তো বয়েস হোলো, এখন আর নিজের চোখে নিজে ধুলো দিয়ে ভুলে থাকতে ইচ্ছে হয় না। জানি তো, মাসু মাইনের কাজও কি আর চিরদিন থাকবে? একটা বছর যাচ্ছে, আর পায়ের জোর কমে আসছে। তিন চার বছরেই তোমার মতো অবস্থা হবে। কত হোলো তোমার বয়েস? ষাট?

না, কম। পঞ্চান্ন হোলো। এক ঢোক মদ খেয়ে বুড়ো বলল। কি ঠাণ্ডাই পড়েছে ভাই। একটা সোয়ারি জোটেনি। পেটে একটা দানা পড়েনি। হাতে যে পয়সা ছিল মদ কিনে খেয়েছি। গরম না হলে ছুটবো কি করে? এখানে যখন এলাম, আর সইতে পারছিলাম না ভাই! কি জানি, ঘরটা গরম দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। এসে তোমাদের সব ফুর্তি মাটি করে দিলাম তো?

বুড়োর সাদা গোঁপ, কাদা মাথা মুখ, ছেঁড়া জামা আর টুপি সকলের কাছে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। এতো অনাদরের জিনিস নয়, এ যে সম্মানের শিরোপা। তার মুখ থেকে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। তুমি যেন ভাঙা দেউলের ভিতরে এক অনাদৃত বিগ্রহের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছ; ভেঙেচুরে গেছে বটে, কিন্তু ভগবান বুদ্ধের সে মহিমা এখনো তোমার শ্রদ্ধা জাগায়, মাথা নুইয়ে দেয়।

সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইল, মনে হোলো, সে চলে গেলে ওরা দুঃখিতই হবে। খুশিও চুপচাপ। কোনো কথাই সে বলেনি। বুড়োর খুব খিদে পেয়েছে শুনে সে ছুটে বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এল। হাতে তার প্রকাণ্ড একটা বাঁধাকপির পাতা, আট ন' টুকরো রান্না মাংস তাতে রয়েছে। বুড়োর সামনে এনে মাংস রেখে সে বলল, খাও বুড়ো কর্তা, খেয়ে নাও। এবার সে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসে পড়ল। মাথা নিচু করে সে বসে রইল। দুর্বলতায় সে যেন ভেঙে পড়ছে।

বুড়ো খুশি হয়ে চিৎকার করে বলল, আমারা সবাই ভাই ভাই, রিক্সা টানতে কতখানি মেহনত ওরা কি বুঝবে, তাই দুএকটা পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই ওরা ভাবে, খুব দিয়েছি।

বুড়ো উঠে দাঁড়াল।

না খেয়েই উঠে পড়লে যে? খেয়ে যাও! সবাই চিৎকার করে উঠল।

টাট্টুকে ডেকে আনতে যাচ্ছি। আমার নাতি। রিক্সা পাহারা দিচ্ছে।

আমি ডেকে আনছি। তুমি বোসো দেখি। আধাবয়েসী রিক্সাওয়ালা বলল, ভয় নেই, রিক্সা চুরি যাবে না, রাস্তার ওপাশে ফাঁড়ি, এখান থেকে চুরি করবে কার এমন বুকের পাটা গো কর্তা?

দরজাটা একটু খুলে বাইরে মুখ বাড়িয়ে আধাবয়েসী রিক্সাওয়ালা ডাকল, টাট্টু, টাট্টু, তোমার ঠাকুর্দা ডাকছে, রিক্সাখানা নিয়ে চলে এস।

বুড়ো বাঁধাকপির পাতাটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল, নাতি ঘরে ঢুকতেই তার সামনে এগিয়ে দিল। টাট্টু, খাও তো দাদা!

টাট্টুর বয়েস বার তের বছর হবে। মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। ছেঁড়া কাপড় জামা তার পরনে। নাক ঠাণ্ডায় লাল হয়ে উঠেছে, পোঁটা জমে আছে নাকে, বেয়ে বেয়ে ঠোঁটে এসে পড়ছে। বুড়োর কাছে এসে সে পাতা থেকে দুটুকরো মাংস তুলে মুখে পুরে দিল। এমনি ভাব—যেন এখুনি কেউ ছোঁ মেরে কেড়ে নেবে।

আস্তে খা! বুড়ো নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলল, নিজেও সে একখানা মুখে পুরে দিল, আমি মাত্র দুখানা খাব, আর সব তুই খেয়ে ফেল। খাওয়া-দাওয়া হলে রিক্সা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। আজ আর বেরুব না। কাল যদি ঠাণ্ডাটা কম পড়ে, তাহলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ব, কি বলিস টাট্টু, তাই ভালো।

টাট্টু দায় সারা গোছের একবার মাথা নাড়ল। চোখ তার মাংসের উপর। নাক টেনে বলল, না দাদু, তুমি তিনটে খাও, আমি আরগুলো খাবোখন। তারপর তুমি রিক্সায় চেপে বসবে, আমি তোমাকে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যাব।

নারে তার দরকার নেই। বুড়ো হাসল, আমরা দুজনেই হেঁটে বাড়ি ফিরব। এই ঠাণ্ডায় কি আর রিক্সা চাপতে ভালো লাগে? হাঁটলে গা গরম হবে।

বুড়ো নিজের ভাগটুকু খেয়ে মদটুকু একচুমুকে শেষ করে ফেলল, টাট্টু তখনো চিবুচ্ছে। বুড়ো একখানা ছেঁড়া কানি বার করে মুখ মুছে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, ছেলেটা তো সেই কবে লড়ায়ে গেছে, আজও ফিরল না।

দাদু, ফের তুমি— টাট্টু গোগ্রাসে খাবার গিলতে গিলতে চেঁচিয়ে উঠল। তার গাল দুটো টোপা পিঠের মতো ফুলে উঠেছে।

ওদের কাছে বলব না তো কার কাছে বলবরে ছোঁড়া—বুড়ো উত্তর দিল, ওরা আমার ভাই বেরাদার না? বুড়ো এবার গলার স্বর নামিয়ে বলল, নাতিটার মনে বড় লাগে, ওর খুব অভিমান আছে। বউটা চলে গেল—এই বুড়ো আর ঐ এক ফোঁট্টা ছেলেটাকে ফেলে, কি আর করি, কোনোরকমে রিক্সা টেনে দিন

চালাচ্ছি। রিক্সাখানাও গেছে। তবে একটা সুখ, ভাড়া গুনতে হয় না। কখনো বা
া, কখনো বা কম রোজগার হয়। কি আর করব, টেনে টুনে চলছে।
টাট্টুর খাওয়া প্রায় শেষ, সে বললে, দাদু, আরো কিছুক্ষণ রিক্সা টানতে হবে।
রে কয়লা নেই, কাল ভোরেই তো কয়লা চাই। হাতে তো একটা কানা কড়িও
নই। তোমারইতো দোষ, তখন সেই সোয়ারিটা নিলে না কেন?
ওরে, কয়লার জন্যে তোর আর ভাবনা নেই। একরকম চালিয়ে নোবখন।
চালিয়ে নেবে! কি করে চালাবে?
তোকে ভাবতে হবে না। তুই খেয়ে নে।
বুড়ো এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল; ভাই সব, আমরা এখন উঠি। এই বলে
ওর হাত ধরল। টাট্টুর খাওয়া শেষ হয়নি। একটুকরা মাংস তখনও পাতে পড়ে
ছে। সে তাড়াতাড়ি মাংসটুকরা মুখে পুরে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।
কেউ কেউ ওদের সঙ্গে বাইরে এল। খুশিও বাইরে এল। সে রিক্সাখানা
একবার দেখতে চায়।
এমন ভাঙা রিক্সা সে জীবনে দেখেনি। রং চটে গেছে, হাতলের লোহা দেখা
। একটা পুরনো বাতি, রিক্সার ছাউনিখানা ছেঁদায় ভরতি, বৃষ্টি হলে জল
সোয়ারিকে ভিজিয়ে দেয়!
টাট্টু একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বাতি ধরাল। বুড়ো হাতল দুটো তুলে
ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কাল আবার দেখা হবে।
খুশি দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, ওরা চলে যাচ্ছে। বুড়ো কি যেন বলতে বলতে
ছে। কালো রাত, ঘন আঁধার, রাস্তার দুপাশের বাতিগুলো থেকে আলো
রে পড়ছে। খুশির বুকখানা এক অব্যক্ত ব্যাথায় দুলে উঠল, নিজের জন্যেই
দিন সে ভেবে এসেছে, অন্যের কথা সে ভাবেনি। আজ কিন্তু না ভেবে
পারল না।
ঐ ছোট্ট ছেলেটা—টাট্টু না ওর নাম—ও যেন তার ছেলেবেলা, তার অতীত
ন। আর ভবিষ্যৎ সে দেখতে পেয়েছে বুড়োর মধ্যে। হাঁ, তারই ভবিষ্যৎ!
কোনোদিন নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া এক আধলাও খরচ করেনি। আজ তার
হোলো? বেশ কিছু খরচ করেই ওদের জন্য ছুটে মাংস কিনে নিয়ে এল,
এমন হোলো? কই, তার জন্যে তো তার একটুও আপশোষ হচ্ছে না! বরং
ন্দই হচ্ছে। খুশি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, ওরা দূরে, আরও দূরে চলে যাচ্ছে,
মিলিয়ে গেল। সে চা-খানার ভিতরে এসে ঢুকল। সবাই এবার হল্লা
দিয়েছে, খিস্তিখাস্তা করছে, কিন্তু তার ওসব ভালো লাগে না। দাম চুকিয়ে
সে বেরিয়ে এল। ছবিঘরের কাছে রিক্সা নিয়ে মনিবের অপেক্ষায় বসে রইল।

রাতটা সত্যিই ঠাণ্ডা। দমকা হাওয়া বইছে ধুলো উড়িয়ে—যেন পৃথিবীর উপর দিয়ে একদল সৈন্যের দাপাদাপি শুরু হয়েছে। আকাশে বড় তারাগুলোকেই দেখা যাচ্ছে, তারাও যেন শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে, হাওয়ায় বরফের রেশ। পথ বরফে ভরে গেছে, মাঝে মাঝে ফাটল ধরছে। মাটির রংও সাদা হয়ে গেছে।

ছবিঘরের সুমুখে বসে সে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু কারখানায় ফিরে যেতে আর তার মন চাইছে না। সে আজকের ব্যাপারটা নিরালায় বসে ভাবতে চায়। তার জীবনের একমাত্র আশা—বুড়ো আর তার নাতি গুঁড়িয়ে রেণু রেণু করে দিয়ে গেছে। বুড়ো নিজেই রিক্সার, মালিক। খুশির স্বপ্ন, সে নিজের রিক্সা নিজে টানবে। আজও সে স্বপ্ন স্বপ্নই আছে, সে না খেয়ে না দেয়ে টাকা জমাচ্ছে। সে ভাবছে, রিক্সা কিনলেই জীবনের বাঁকা পথটা সোজা হয়ে যাবে। পৃথিবীকে সে হাতের মুঠোয় পাবে, কিন্তু বুড়ো আজ তার সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে গেল।

এই রিক্সা কেনবার আশায়ই না সে বাঘিনীকে বিয়ে করতে চায় না? সে নিজে রিক্সার মালিক হবে, তারপর টাকা জমিয়ে গাঁয়ের একটি মেয়েকে বিয়ে করবে—এই না তার ইচ্ছে? কিন্তু টাট্টুর দিকে তাকিয়ে দেখ। কে বলতে পারে একদিন তার ছেলের ঐ টাট্টুর মত অবস্থা হবে না? না, না, তার আশা ভরসা যা ছিল, সব গুঁড়িয়ে গেছে। আর কিছুই নেই।

বাঘিনীর দাবী মেনে নিতেই বা ক্ষতি কি? কেনই বা সে তাকে ফিরিয়ে দেবে? এক দুষিত বৃত্তের মধ্যে সে পড়েছে, সেই বৃত্ত সংকুচিত হয়ে তাকে পিষে ফেলবে। নিষ্কৃতি তার নেই, তবে কেন সে বাঘিনীকে বিয়ে করবে না? বাঘিনী আর গাঁয়ের একটি নিষ্পাপ, সরলা কুমারী—তার কাছে কোনো প্রভেদ নেই। বরং দুতিনখানা রিক্সা সে যৌতুক হিসেবে পাবে, আর সেই বা ছাড়া কেন? জীবনের আশা ভরসাই যখন ফুরিয়ে গেল তখন যা পাওয়া যায় নিয়ে নেওয়াই ভালো। কাউকে ঘেন্না করারও কোনো মানে নাই। সে ঠিক করল বাঘিনীর হাতেই সে নিজেকে সঁপে দেবে।

খুশি হঠাৎ বদলে গেল। আশা-আকাঙ্ক্ষা তার নেই, কাজও সে আর মন দিয়ে করে না। কাজ করবে কি? সব সময়েই তার চোখের সুমুখে ভাসে বুড়ো আর টাট্টুর ছবি। তারা যেন তার আশা ভরসা ছিনিয়ে নিয়েছে। সে ঠিক করল ফুর্তি খুঁজে বেড়াবে। গোটা দিনটায় যতটুকু পারে ফুর্তি লুটে নেব, কালকের জন্যে ভাববে না। কি হবে দাঁতে দাঁত চেপে সারাদিন খেটে, আখেরের চিন্তা করেই বা লাভ কি? গরীবের ভাগ্য বাদামের খোলার মতো—দুদিকেই ধার। না খেতে পেয়ে মরতে মরতে যদি কোনোরকমে ছেলেবেলাটা কাটিয়ে দিলে তাহলেই যথেষ্ট। দশ হাজারে একটা লোকের পক্ষেই তা সম্ভব। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। আবার বুড়ো বয়েস আসছে যে! সে ধাক্কা সামলানোই দায়। শুধু এর মাঝখানকার সময়টা না একটু ভালো। বয়েসও তখন কম থাকে, খিদে তেষ্টারও তেমন বালাই থাকে না। কোনোরকমে তখন মানুষের মতো থাকা যায়, একটু আধটু গর্বও যে না হয় তা নয়। কিন্তু জীবনের এই সময়টা, যখন স্বাস্থ্য আর মন দুইই তাজা থাকে, তখন যদি তার সদ্ব্যবহার না করলে তাহলে মূর্খ ছাড়া আর কি বলা যায়। এ যেন ঘুরতে ঘুরতে তুমি একটা গ্রামে এসে পড়েছ, সেখানে চটি মিলেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেলে আর চটি মিলবে না। সুমুখে শুধু ধূধূ করবে পথরেখা, ধুঁকতে ধুঁকতেই চলতে হবে সেই পথ ধরে। খুশি ভেবে দেখল, এইই সময়। জীবনের ঠিক সে চটিতে এসে পৌঁছেচে, এখন যদি সে একটু ফুর্তি লুটে না নেয়—সারা জীবন এমনি করেই কেটে যাবে। বাঘিনীর কথা তার মনে পড়ল। দূর হোক, ওকথা সে ভাববে না। প্রতিটা মুহূর্ত সে বাঁচতে চায়, চায় আনন্দ; কালকের চিন্তা সে করবে না। দূর হোক বাঘিনী!

চীনে মাটির ঘটটার দিকে তাকালেই আবার চিন্তা মনে ঘুরপাক খায়। নিজের ফুর্তির কথা ভাবলেই কি চলবে? রিক্সা কেনবার জন্যে কটা টাকাই বা বাকি! নিজের এতদিনের পরিশ্রম সে এক নিমিষে পণ্ড করে দেবে না; প্রাণ ধরে ঘট থেকে টাকা নিয়ে সে মজা লুটতে পারবে না। টাকা জমানো চাট্টিখানি কথা নাকি? না, এখনো তাকে সংযমী হয়েই চলতে হবে। কিন্তু বাঘিনী? কোনো উপায়ই সে খুঁজে পেল না। এদিকে সাতাশে এগিয়ে আসছে।

আবার নিরাশা এসে তাকে ছেয়ে ফেলে, সাতাশে—সাতাশে তারিখ এগিয়ে

আসছে! উপায় নেই। চীনে মাটির ঘটটা বুকে নিয়ে ফিস ফিস করে বলে, ওরা যা খুশি তাই করুক না, আমার টাকা কটা তো ঠিক আছে! কেউ তো আর কেড়ে নিতে পারবে না। টাকা যখন আছে, কাকে ভয় করি? তেমন তেমন কিছু হলে পালিয়ে যাব। টাকা আছে, ভাবনা কি আমার!

উৎসবের দিন এগিয়ে আসছে। পথে ভিড়; উনুনের দেবতার পুজোর জন্যে দোকানীরা নানা মেঠাই মণ্ডা সাজিয়ে রেখেছে। ফেরিওয়ালারা হাঁকছে: চাই মিঠাই চাই, মণ্ডা চাই! খুশি এই নতুন বছর আসার আশায়ই এতদিন উন্মুখ হয়েছিল, কিন্তু এখন তার উৎসাহ একেবারে নিবে গেছে। দিন যাচ্ছে, আর পথে ভিড় বাড়ছে, সঙ্গে সাতাশের কথা তার মনে পড়ে। সাতাশে তারিখ কি হবে কে জানে! পথের ভিড়ের দিকে আর সে তাকিয়ে দেখে না, মুখের ক্ষত দাগটায় জ্বালা ধরে যায়।

আজকাল পথে ভিড় বলেই রিক্সা টানতে গিয়ে খুব সাবধান হতে হয়। তার উপর বরফ পড়ে পথও পিছল হয়ে গেছে! মনের ভাবনা আর পথ চলার সতর্কতা দুয়ে যেন লড়াই বেঁধেছে, সে আর যুঝতে পারে না। তার শক্তিও নেই। পথের দিকে নজর দিতে গিয়ে ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়, ভাবতে গেলে পথের কথা মনে থাকে না। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে চমক ভাঙে, এই তো তার অবস্থা, এমন করেই কেটে চলল দিন।

উনুনের দেবতার পুজোর দিন বিকেল থেকে পুবাল বাতাস ছাড়ল। আকাশে দেখা দিল কালো মেঘের মিছিল। কাগজের লণ্ঠন টাঙাবার দিন যতই এগিয়ে এল, বাতাসের জোর ততই কমে গেল। আকাশ থেকে বরফ ঝরা শুরু হোলো। দোকানীরা মেঠাই মণ্ডা সাজিয়ে বসেছিল, তারা এবার বিপদেই পড়ল। আবহাওয়ার মরজি বদলে গেছে। গরমে মিঠাই মণ্ডা গলে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে, তাই তারা সাদা বালি ছড়িয়ে দিল। বেশি বরফ ঝরছে না, কিন্তু পথঘাট সাদায় সাদা হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে সাতটায় ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে উৎসব শুরু হোলো। ধূপকাঠি জ্বলে উঠল, বাজি পুড়ল, অন্ধকার খান খান হয়ে গেল। বরফ তখনো ঝুর ঝুর করে পড়ছে। পরিবেশ হয়ে উঠেছে রহস্যময়। এই ক্ষণিকের উৎসবের এ যেন এক কালাতীত গভীর পটভূমিকা।

পথে রিক্সা, সেডানচেয়ার আর মোটরের আর মানুষের ভিড় লেগেছে, সবাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে, উৎসব শুরু হবার আগে বাড়ি ফিরবে। পথ ভিজে আর পিছল, ব্যস্ত হলে কি হবে, তারা এগুতে পারছে না। ছোটখাটো দোকানীরা মেঠাই মণ্ডা বিক্রি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছে। আজই বিক্রি করা চাই; কাল তখন উৎসব চলে গেলে কে কিনবে? সবই নষ্ট হয়ে যাবে। তারা হাঁক

ডাক শুরু করেছে, নিশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছে না। কিন্তু মজা এই যে তাদের হাঁকডাকে কেউ বিরক্ত হচ্ছে না, বরং ভালোই লাগছে।

নটার সময় খুশি মনিবকে নিয়ে বাড়ির পথে চলছিল। পথে বাজারের ভিড় কাটিয়ে ওরা এবার চিরশান্তির স্ট্রীটে এসে পড়ল। শহরের এই দিকটায় লোক চলাচল কম, গাড়িঘোড়ার ভিড়ও নেই। পিচের রাস্তার উপর বরফের পাতলা আস্তরণ জমে উঠেছে, চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার উপরে। কেমন যেন চোখ ধাঁধিয়েই দিচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা মোটর চলে যাচ্ছে, হেডলাইট রাতের বুকে আলো ছড়াতে ছড়াতে চলেছে; আলোয় বরফের কণাগুলো হলদে দেখাচ্ছে—মনে হচ্ছে অযুত সোনালী বালিকণা কে যেন ছড়িয়ে রেখেছে।

নতুন টানা ফটকের কাছে চওড়া রাস্তাটা বরফে ঢেকে গেছে। ধূ ধূ করছে সাদা পথ। চারদিকে কেমন এক সমাহিতভাব, এক গাঢ় প্রশান্তি। এমনি পথে চলতেও মনে খুশি ঘনিয়ে আসে, নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হয়। চিরশান্তির খিলান, নতুন চীন ফটক, বাইরে দেয়ালগুলিকে যেন শোকের সাদা টুপি পরিয়ে দিয়েছে। পথের আলোগুলি ঘোলাটে আলো ফেলে তাকিয়ে আছে। পুরনো নগরীর মহিমা সে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

এমনি সময়, এমনি জায়গায় এলে পিকিঙ-এর হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারবে। এ যেন দিনের আলোর সে পিকিঙ নয়। আজব এক শহর, জনমানব সেখানে নেই, শুধু বিরাট সৌধের সার চলে গেছে, উপরে জেগে আছে অনন্ত আকাশ। ফার গাছগুলো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে বরফ মুড়ে। সত্যিই এ যেন আর এক পিকিঙ। খুশি এই নির্জন শহরের ভিতর দিয়ে চলেছে। তার চার-পাশে সৌন্দর্যের এত সমারোহ আছে সে তা তাকিয়েও দেখছে না। সাদা পথ দেখে তার শুধু মনে হচ্ছে, কখন সে এই পথ পার হয়ে বাড়ি গিয়ে পৌছবে। সে পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু দৌড়তে সে পারল না। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল, বরফে বারবার পা পিছলে গেল। দেখতে দেখতে তার কাঁধে আর জামায় বরফ জমে গেল। খুশির কাছে এ কিছুই নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা হাড়ে ঢুকছে; কাঁপুনি শুরু হয়েছে।

এদিকটায় রাস্তার পাশে দোকানপাট তেমন নেই। দূর থেকে বাজি পোড়াবার আওয়াজ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে আকাশের অন্ধকারে আলোয় আলো করে দিয়ে হাউইয়ের ফুল ঝরে পড়ছে, এই হাউইগুলোকে কি যেন বলে? ওঃ হাঁ, পাঁচটা সয়তান শেষ বিকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আকাশ আবার আঁধার হয়ে এল, ঘন আঁধার। তাকাতেও কেমন গা ছমছম করে ওঠে। বাজিতে খুশির

বুকটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। সে ভাবল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু পা যে চলতে চায় না! কি ব্যাপার?

আরো একটা ব্যাপারে সে কেমন ঘাবড়ে গেছে। অনেকক্ষণ একটা সাইকেল পিছনে পিছনে আসছে। এতক্ষণ ছিল সন্দেহ, চিরশান্তি স্ট্রীটে পড়ে তার ধারণা দৃঢ় হোলো। হাঁ, লোকটা তাকেই অনুসরণ করছে, সাইকেলের চাকায় বরফ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, অস্পষ্ট শব্দ কানে এসে বাজছে। খুশি কান খাড়া করে শুনল।' অন্য রিক্সাওয়ালাদের মতোই সাইকেলের উপর সে হাড়ে হাড়ে চটা। মোটেরের উপরও তারা কম চটা নয়, কিন্তু মোটরের একটা গুণ আছে, দূর থেকে ভেঁপু বাজালে সরে যাওয়ার. সময় পাওয়া যায়। সাইকেলের কিন্তু ব্যাপার বোঝাই ভার, হেলে দুলে চলেছে, একবার যাচ্ছে পুবে, আর একবার পশ্চিমে। কখন যে হুড়মুড় করে গায়ে এসে পড়বে কে জানে!

সাইকেলের সঙ্গে যদি একবার রিক্সার ধাক্কা লেগে যায়, তাহলে তো মহা ফ্যাসাদ। লোকে সাইকেলওয়ালার কোনো দোষ খুঁজে পাবে না, বলবে, বেটা রিক্সাওয়ালারই যত দোষ। পুলিসগুলোও হয়েছে তেমনি! তারাও নানা ফ্যাকড়া তুলবে। তারা জানে, রিক্সাওয়ালাদের ধমক-ধামক দিলেই দুচার পয়সা পাওয়া যায়। খুশি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই। তার ইচ্ছে হোলো সাইকেলওয়ালাকে এক ধাক্কা মেরে সে পথে ফেলে দেয়। কিন্তু সাহস হোলো না। রিক্সাওয়ালা জাতটাই অমনি। অত্যাচার অবিচার সয়ে সয়ে সাহস তাদের উবে গেছে।

এবার তারা এসে পড়ল দক্ষিণ সমুদ্র ফটকের কাছে। সড়ক এখানে চওড়া হয়ে গেছে। সাইকেলটা তখনো পিছনে পিছনে আসছে, খুশি কেমন ক্ষেপে গেল। সে রিক্সা থামিয়ে কামিজের বরফ ঝেড়ে ফেলতে শুরু করল। সাইকেলওয়ালা পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখল। খুশি ইচ্ছে করে খানিকক্ষণ বসে রইল। এবার সাইকেলওয়ালা দূরে চলে গেছে; খুশি মাটিতে থুথু ফেলে আবার হাতলদুটো তুলে নিল।

শ্রীযুক্ত চাও একজন মানব সমাজের হিতৈষী ব্যক্তি। তিনি রিক্সায় পর্দানসীন হয়ে যেতে রাজি নন। খুব বৃষ্টি না হলে তিনি খুশিকে কখনো পর্দা ফেলে দিতে বলেন না। তিনি জানেন পর্দা ফেলে দিলে রিক্সাওয়ালাদের রিক্সা টানতে খুবই কষ্ট হয়। এমন কি উপরের ঢাকনা ফেলে দিয়েই তিনি রিক্সায় চলেন। তাছাড়া বরফ পড়া দেখতে তার ভালোই লাগে। রাতের বুকে ফুলের মতো ঝরছে বরফ—সৌন্দর্য তিনি চুনিয়ে চুনিয়ে উপভোগ করতে চান—হারাতে তিনি রাজি নন।

শ্রীযুক্ত চাও-ও সাইকেলওয়ালাকে দেখেছেন। খুশির কথা শুনে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, অনেকক্ষণ থেকে সাইকেলটা আমাদের পিছনে পিছনে আসছে। বাড়ির সামনে থেম না, কিছুটা গিয়ে শ্রীযুত চো-র বাড়ির কাছে রিক্সা রাখবে। ঘাবড়ে যেও না।

খুশি সত্যি ঘাবড়ে গেল। সাইকেল সে কোনোদিনই পছন্দ করে না, কিন্তু তার উপর মনিবের কথা শুনে তার ভয় হোলো, কি ব্যাপার? মনিব বাড়ি ফিরতে সাহস করছেন না! সাইকেলওয়ালাটা কে? এর পেছনে নিশ্চয়ই অনেক গোপন ব্যাপার আছে! খুশি চলতে শুরু করল। খানিক দূর গিয়েই সাইকেল-ওয়ালার সঙ্গে দেখা। সে তাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। খুশি রিক্সা নিয়ে এগিয়ে যেতেই সে পিছন পিছন চলতে লাগল।

খুশি পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখল। হুঁ, লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে। গোয়েন্দাই হবে। চা-খানায় প্রায়ই তো গোয়েন্দাদের সে দেখে। কথা না বললেও তাদের ধরনধারণ, তাদের পোশাক, হাবভাব দেখেই সে তাদের চিনতে পারে। ওরা সবাই নীল আচকান আর টুপি পরে—টুপিটা তাদের চোখ পর্যন্ত নামানো।

লর্ড্ সাউথ স্ট্রীটের বাঁকে এসে খুশি জোরে ছুটতে শুরু করল। নির্জন ঘোলাটে আলোর সার ম্লান আলো ছড়াচ্ছে—পেছনে সাইকেলের টুংটাং শব্দ। এমন ঘটনা তার জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। ঘামে ভিজে উঠল তার শরীর। পার্কের কাছে এসে সে পিছন ফিরে তাকাল। গোয়েন্দাটা ঠিক পিছনে আসছে।

বাড়ির ফটক ছাড়িয়ে এবার সে এগিয়ে চলল। শ্রীযুক্ত চাও চুপ করে রিক্সায় বসে আছেন। একটা শব্দও তিনি করলেন না। উত্তর দিকে সে চলল, সাইকেল এখনো পিছনে পিছনে আসছে। খুশি একটা গলিতে ঢুকে পড়ল; সাইকেল পিছনে পিছনে এল। শ্রীযুক্ত চো-র বাড়ি যেতে হলে গলিতে ঢোকার কোনো দরকার নেই, গলির শেষে এসে খুশির মনে হোলো, সে ভুলে গলিতে ঢুকে পড়েছে। মগজে আর তার কিছু নেই, নিজের উপর রাগই হোলো।

সুদৃশ্য পাহাড়ের কাছে এসে পড়তেই সাইকেলটা মোড় ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল। খুশি হাতের চেটোয় কপালের ঘাম মুছে ফেলল। বরফ আর তেমন পড়ছে না, মাঝে মাঝে ফুলের মত টুপটাপ করে একটু আধটু পড়ছে। খুশি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মন তার আনন্দে ভরে গেছে।

সে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব কত্তা?

চো-র বাড়ির দিকে যাও। কেউ যদি আমার সম্বন্ধে পথে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, বোলো, তুমি আমাকে চেনই না।

যে আজ্ঞে। ব্যাপারটা বড়ই ঘোরাল ঠেকছে। কিন্তু মনিবকে তো আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না।

চো-র বাড়ির কাছে এসে তারা পৌছল। শ্রীযুক্ত চাও তাকে রিক্সা নিয়ে ফটকের ভিতর ঢুকে ফটক বন্ধ করে দিতে হুকুম দিলেন। চাও বেশ শান্তই আছেন, কিন্তু মুখ যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তিনি এবার রিক্সা থেকে নেমে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

খুশি রিক্সাখানা রেখে পাদানির উপর বসে পড়ল। শ্রীযুক্ত চাও আবার বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে শ্রীযুক্ত চো-ও আছেন। খুশি শ্রীযুক্ত চোকে চেনে, তার মনিবের বিশেষ বন্ধু তিনি।

খুশি—শ্রীযুক্ত চাও ব্যস্ত হয়ে বললেন, তুমি চট করে একখানি ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি চলে যাও। তোমার মনিবানীকে বলগে, আমি এখানে আছি, তারাও যেন তাড়াতাড়ি চলে আসেন। যে গাড়িটায় যাবে, সেটা ছেড়ে দিও কিন্তু। কি বললাম, বুঝেছ তো? ওকে বোলো, দরকারি জিনিস ছাড়া আর কিছু সঙ্গে নেবার দরকার নেই, শুধু লাইব্রেরীতে যে পটখানা আছে সেইখানা যেন নিয়ে আসে। কি, মনে থাকবে তো? ওকে আমি ফোন করে দিচ্ছি, তোমাকেও বললাম, কি জানি উনি ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে হয়তো সবই ভুলে যাবেন। ভুলে গেলে, তুমি মনে করিয়ে দেবে।

আমিই তো গিয়ে ওকে নিয়ে আসতে পারি। শ্রীযুক্ত চো বললেন।

দরকার নেই, লোকটা গোয়েন্দা কিনা তারই বা ঠিক কি? কিন্তু সাবধানের তো আর মার নাই।

ভাই; তুমি আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।

শ্রীযুক্ত চো গাড়ি ডাকতে চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত চাও আবার খুশিকে সব কথা বললেন, কি জানি যদি সে ভুলে যায়।

ট্যাক্সি এখানে এলে আমিই ভাড়া চুকিয়ে দেবখন। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র নিয়ে এখানে কর্ত্রীকে চলে আসতে বলবে। দরকারী ছাড়া অন্য জিনিসপত্র পড়ে থাকে ক্ষতি নেই। শুধু খোকার সব জিনিসই যেন আনেন। হাঁ, আর লাইব্রেরী ঘরের পটখানা—বুঝলে? কর্ত্রীর সব গোছানো হলে কাও-মা যেন ফোনে একটা ট্যাক্সি ডেকে এখানে চলে আসে। ওরা চলে এলে তুমি ফটকের তালা বন্ধ করে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঘুমিও। ফোন করতে পার.?

ফোন করতে পারি না কত্তা, কিন্তু ফোন এলে ধরতে পারি। খুশি ফোন করতে ভালবাসে না, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু মনিবকে উত্তেজিত হতে দেখেই সে ওকথা বলল।

আচ্ছা, ওতেই চলবে। চাও বললেন, খুব দ্রুত তিনি বলে গেলেন, যদি কিছু হয়, বাইরে যদি কোনো গোলমাল হয়, ফটক খুলো না। আমরা পালিয়ে গেছি জানলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না। যদি তেমন বোঝো তাহলে আলো নিবিয়ে দিয়ে ভিতরের উঠোন পেরিয়ে চলে যেও। গিয়ে দেয়াল দেখতে পাবে। দেয়ালের ওপাশে ওয়ার্ড পরিবার থাকেন। দেয়াল টপকে চলে যেও। তুমি ওদের চাকরদের চেন, চেন না? বেশ। কিছুক্ষণ ওদের ওখানেই লুকিয়ে থেকো। আমার বা নিজের জিনিসপত্রের জন্য ভেব না। দেয়াল টপকে চলে যেও। তোমার জিনিস হারালে আমি কিনে দেব। এই নাও, এই পাঁচ ডলার এখন রাখ।

আমি এবার কর্ত্রীকে ফোন করতে যাচ্ছি। তুমিও গিয়ে সব কথা খুলে বলবে। সাইকেলওয়ালা গোয়েন্দা হতেও পারে নাও হতে পারে। দেখো, ঘাবড়ে যেও না।

ট্যাক্সি এল। খুশি চেপে বসল ট্যাক্সিতে। মাথাটা যেন তার ঘুরছে, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বরফ ঝরছে, বাইরে সব কিছু আবছা হয়ে গেছে। সে সোজা হয়ে গাড়ির ভিতরে বসে রইল, মাথা তার গাড়ির ঢাকনায় গিয়ে প্রায় ঠেকেছে। ব্যাপারটা সে একবার ভেবে দেখতে চেষ্টা করল, পারল না। রেডিয়েটরের ঢাকনায় আঁকা লাল তীরটার ওপর তার চোখ বার বার গিয়ে পড়ছে, সব কিছু তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এমন চমৎকার গাড়ি! কি জোরেই না ছুটেছে! খুশি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গাড়ি এসে এবার বাড়ির দরজায় থামল। খুশি বেরিয়ে এল। উৎসাহ তার নিবে গেছে।

দরজার কলিং বেলটা টিপতে যাবে, এমন সময় এক কাণ্ড হয়ে গেল। কোত্থেকে একটা লোক ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরল। মনে হোলো দেয়াল ফুঁড়েই যেন বেরিয়ে এসেছে সে। খুশি ভাবল, হাতটা সে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেবে, কিন্তু গায়ে জোর যা ছিল যেন ফুরিয়ে গেছে। লোকটাকেও সে চিনতে পেরেছে। এই সেই সাইকেলওয়ালা গোয়েন্দা।

খুশি, আমাকে চিনতে পারছ না? গোয়ান্দা তার হাত ছেড়ে দিয়ে হাসল।

খুশি ঢোক গিলল, কি বলবে ভেবেই পেল না।

কি, চিনতে পারছ না? পশ্চিম পাহাড়ে আমরাই তো তোমাদের ধরে নিয়ে গিছলাম। আমি লেফটেনাণ্ট সান। কি, এখন চিনেছ?

লেফটেনাণ্ট সান! খুশি ঠিক ঠাহর করতে পারল না। পশ্চিম পাহাড়ে যখন সৈন্যরা ওদের ধরে নিয়ে গিছল, তাদের হাতে বহু কষ্টই সহ্য করেছে। সেই কথাই মনে আছে! লেফটেনাণ্ট কি ক্যাপটেনের কথা নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায়নি।

ওঃ, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না বুঝি? আমি তোমাকে কিন্তু ঠিক চিনেছি। তোমার মুখের ঐ দাগটা কি একবার দেখলে আর ভোলা যায়। তোমার পাশ

কাটিয়ে যখন সাইকেল চালিয়ে গেলাম, তখনই আমার মনে হোলো এ খুশি না হয়ে যায় না। বারবার তাকিয়ে দেখলাম, হাঁ হাঁ খুশিই তো। অমন জবর দাগ!

কোনো দরকার আছে নাকি আপনার? খুশি বেল টিপতে গেল।

আছে বই কি। খুব জরুরী দরকার। চল না, ভিতরে গিয়ে, বসা যাক। লেফটেনাণ্ট—গোয়েন্দা সান, এবার বেল টিপল।

আমি খুব ব্যস্ত। খুশির কপালে মিনমিনে ঘাম দেখা দিল। মন তার ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে উঠেছে, জিজ্ঞেস করছে, বলছে, কোনো রকমে লোকটাকে তাড়ান যায় না? ওকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে সে পারে কি?

ঘাবড়ে যেও না, তোমার ভালোর জন্যই এসেছি। গোয়েন্দার মুখে ধূর্তামির হাসি ফুটে উঠল। কাও-মা দরজা খুলতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ধন্যবাদ! অনেক অনেক ধন্যবাদ। খুশিকে সে কাও-মার সঙ্গে কথাই বলতে দিল না, তাকে টেনে নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

কোথায় থাক তুমি?

খুশি ঘর দেখিয়ে দিল। দুজনে ঘরে এসে বসল এবার। বাঃ, বেশ পরিষ্কার ঘরটি তো! এখানে ভালোই আছ তাহলে?

কি কাজ আছে বলুন, বলেছি তো আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। খুশি বলল।

আমার যে বহুৎ জরুরী কাজ আছে খুশি। সান হাসল। হাসির আড়ালে যেন ক্রুরতা লুকিয়ে আছে।

সব ব্যাপারটাই খুলে বলছি। তোমার এই মনিব সরকারের বিরুদ্ধ-দলের লোক। ধরা পড়লে ওকে তারা গুলি করে মারবে, আর ধরাও সে পড়বেই। আমি সেই কথাই তোমাকে জানিয়ে দিতে এলাম। হাজার হোক, চেনা লোক তো বটে, তা তুমি স্বীকার করতে চাও বা না চাও। তুমি ছাউনিতে আমার কাজকর্ম করে দিতে, সে কথা তো আমি ভুলিনি। তাছাড়া তুমি আমি দুজনে নিচু তলার লোক। তাই তোমাকে সব কথা জানাতে এলাম। আমরা কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই পুলিস নিয়ে ফিরে আসছি, তার আগে যদি না পালাও তো আর কোনো উপায়ই থাকবে না। পুলিসের বেড়াজালে পড়লে ছাড়া পাওয়া শক্ত। তাছাড়া তুমি আমি গতর খাটিয়ে খাই, মনিবের জন্য আমরাই বা কেন বিপদে পড়তে যাব? কি খুশি, আমি ঠিক বলিনি।

কিন্তু কোনোদিন তো আর মনিবের কাছে মুখ দেখাতে পারব না, খুশি বলল।

কাকে মুখ দেখাতে পারবে না? গোয়েন্দা হো হো করে হেসে উঠল। এমন প্রভুভক্তি তো কখনো দেখিনি বাপু! আরে ওরা যদি নিজেদের বিপদ নিজেরা টেনে আনে, আমরা কি করতে পারি? মুখ দেখানোই বা ভার হবে কেন আমি

তো বুঝি না। তাদের বিপদ তারাই বুঝুক না। তাদের হয়ে আমরা শাস্তি পাব কেন? আচ্ছা, ধরই না, প্রভুভক্তি দেখিয়ে তিন মাস তোমার মেয়াদ হোলো, কি হবে তখন? বেশ বুনো পাখীর মত স্বাধীন ভাবে ঘুরছিলে, তখন থাক অন্ধকার ঘরে বসে। কি যে সে কষ্ট, এখন বুঝতে পারবে না।

তাছাড়া আরো একটা কথা। মনিবরা জেলে গেলে তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের মেলাই টাকা, ঘুস দিলে জেলে বসে কি না পাওয়া যায়। কিন্তু তোমার আমার এক কাণাকড়িও সম্বল নেই—আমাদেরই মুশকিল। হয়তো প্রস্রাবের বালতি বইয়েই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। আর তাছাড়া চাও উপর-ওয়ালাকে টাকাকড়ি ঘুস দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে—কিন্তু তোমাকে আমাকে জেলেই পচতে হবে। জেল থেকে যখন বেরিয়ে আসবে, দেখবে পিঠ কুঁজিয়ে গেছে, কোমর ভেঙ্গে গেছে। তখন আর খাটবার শক্তিটুকুও থাকবে না।

খুশি, তুমি আমি কেন এই কষ্ট ভোগ করতে যাব? আমরা তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি, সরকারের বিপক্ষেও কোনো কথা বলিনি, তবে আমাদেরই কেন স্বর্গের সাঁকোর কাছে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি লটকে দেবে? এর চাইতে অবিচার আর কি আছে? ব্যাপারটা নিজেই ভেবে দেখ না। তুমি তো মনিবের জন্যে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছ—কিন্তু আমরা যারা খেটে খাই, তাদের জন্যে পৃথিবীতে কেউ তো মাথা ঘামায় না। তবে আমরাই বা ভাবব কেন বল?

খুশি ভয় পেল। সৈন্যেরা যখন তাকে ধরে নিয়ে যায়, কি কষ্টই না তাকে সইতে হয়েছে। জেলে সে যায়নি, কিন্তু জেলের কষ্ট সম্বন্ধে সেই থেকেই তার ধারণা হয়েছে। তাহলে মনিবকে এই বিপদে ছেড়ে চলে যাব?

কেন যাবে না? তোমার বিপদে কি মনিব তোমাকে দেখবে?

খুশি নিরুত্তর। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, ঠিকই বলেছেন! আমি চলেই যাব!

তাই বলে এমনি ঝাড়া হাত পা বেরিয়ে পড়বে নাকি।

খুশি ঘাবড়ে গেল।

খুশি, তুমি একটা আস্ত বোকা! আমি গোয়েন্দা, অতো সহজে কি আর তোমাকে ছেড়ে দেব?

আপনি—খুশি কি বলবে ভেবে পেল না।

ওরকম বোকা সেজো না! গোয়েন্দা সান কটমট করে তাকাল। এতদিন চাকরী করলে, নিশ্চয়ই কিছু জমিয়েছ বন্ধু, যাও জমানো টাকা নিয়ে এস, তারপর যে চুলোয় খুশি চলে যাও। তুমি মাসে যা রোজগার কর, আমি তার অর্ধেকও করি না। আমাকে একটা গোটা সংসার চালাতে হয়, ভদ্র কাপড় চোপড় পরতে

হয়, কিন্তু মাইনেতে কুলোয় না। তাই মাইনে ছাড়াও মাঝে মাঝে এমনি কিছু রোজগার করি। কি করব, উপায় নেই। তুমি আমার বন্ধু বলেই কথাগুলো বললাম। তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার লাভ কি বল। বন্ধু বলেই না তোমাকে সাবধান করতে এলাম। কিন্তু জান তো, বন্ধু হলেও ব্যবসার দিকটা ভুললে চলবে না। সংসারের কথাও ভাবতে হয়। কিছু রোজগার না হলে গোটা পরিবার কি পুবাল হাওয়া খেয়ে থাকবে নাকি। যাক মেলাই বকছি; এইবার কাজের কথা পাড়া যাক।

কত চাই আপনার। খুশি বিছানার উপর বসল।

যা আছে, সব বার কর—কোনো বাঁধা ধরা দাম নেই।

তার চাইতে আমি জেলেই যাব।

কথাটা ভুলো না বন্ধু। পরে দুঃখ করলে কোনো ফলই হবে না'বলে দিচ্ছি।

গোয়েন্দা সান তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। শোন খুশি, আমি তোমাকে এখুনি গ্রেপ্তার করতে পারি। পালাবার চেষ্টা করলে গুলিও করতে পারি—একথা ভুলে যেও না।

খুশি রাগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না, তারপরে চিৎকার করে উঠল: মিতা বলেই বুঝি এমনি করে টাকা আদায় করছ? কই আমার মনিবকে তো পারলে না?

তোমার মনিব বড় আসামী। তাকে ধরলে সরকার থেকে পুরস্কার পাব। ছেড়ে দিতে তো আর পারব না? কিন্তু তোমাকে ইচ্ছে করলে আমি ছেড়ে দিতে পারি। তাছাড়া তোমাকে গুলি করে মেরে হাত গন্ধ করতেও চাই না। টাকা নিয়ে এস, তারপর যেখানে খুশি চলে যাও। টাকা না আনলে যা ফল হবে বুঝতেই পারছ। ঠিক খুন করে ফেলব। কিগো অমন তাগড়াই চেহারা তোমার অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার টাকা একা তো আর হজম করতে পারব না, আরো কয়েক জনকে ভাগ দিতে হবে। আমার ভাগে আর ক'পয়সা পড়বে। অন্য কেউ হলে এত সস্তায় পার পেয়ে যেত না। কই কি আছে বার কর?

খুশি উঠে দাঁড়াল। হাত তার মুঠো করা, মাথা গরম হয়ে গেছে।

সাবধান, গোয়েন্দা বলল, সাবধান! হাত তুলেছ কি মরেছ। বাইরে আমার লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। যাও, তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে এস। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। নিজের ভালো বুঝতে শেখ বন্ধু।

কার কি করেছি যে আমার এমন দশা হোলো। খুশি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বিছানার উপর বসে পড়ল। তুমি কিছু করনি, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মানোটাই যে একটা মস্ত বিপদ। আমার তো মনে হয়, মানুষ যতদিন মার পেটে থাকে

ততদিনই সে সুখী। আমরা নিচু তলার লোকরা তো তলায়ই পড়ে আছি বন্ধু, আমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। গোয়েন্দা সান মাথা নাড়ল। কি হবে ভেবে, টাকা কটা এনে দাও, নিয়ে চলে যাই।

খুশি কিছুক্ষণ ধরে ভাবল, কিন্তু কোনো উপায়ই খুঁজে পেল না। এবার ছানার ভিতর থেকে চীনা মাটির ঘটটা বার করল। তার হাত ঠক ঠক করে কাঁপছে।

দেখি দেখি! গোয়েন্দা সান হেসে ঘট কেড়ে নিয়ে দেয়ালে আছড়ে ভেঙে ফেলল।

ঝনঝন করে নতুন টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। খুশির বুক দুঃখে ফেটে গেল।

মাত্র এই কটা টাকা।

খুশি চুপকরে রইল। তার কাঁপুনি এখনো থামেনি।

বেশ বেশ! আমি কথায় কথায় মানুষ খুন করা পছন্দ করি না। তাছাড়া তুমি তো বন্ধুলোক। কিন্তু এই কটা টাকার বদলে তোমাকে ছেড়ে দিতে হোলো—এবড় আফশোস রয়ে গেল। সত্যি খুশি, তুমিই জিতলে দেখছি।

খুশি তবুও চুপ করে রইল। তার হাত পা কাঁপছে। সে বিছানার কম্বলটা তুলে নিতে গেল।

খবরদার, ছুঁয়ো না বলছি!

শীত করছে যে···খুশি তার দিকে তাকাল। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

বিছানা ছুঁয়ো না বলছি যাও, এখান থেকে চলে যাও!

খুশি ঢোক গিলল। সে রাগ হজম করে ফেলেছে। দাঁতে দাঁত এখনো চেপে আছে। কিন্তু কি করবে, উপায় নেই। দরজা খুলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পথঘাট বরফের কার্পেটে ঢাকা। এক ইঞ্চি পুরু বরফ পড়ছে। খুশি মাথা নিচু করে চলতে লাগল, চারদিক সাদায় সাদা হয়ে গেছে, শুধু বরফের উপর পড়ছে তার কালো পায়ের দাগ।

বারো

খুশি কোথাও বসে ব্যাপারটা ভালো করে মনে মনে খতিয়ে দেখতে চাইল। কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে—আদি-অন্ত সে খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে যদি সে কাঁদে তাতেই বা ক্ষতি কি? কাঁদলে বুকের ভার অনেকটা কমবে। সব কিছু যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ; তার চারপাশে একটার পর একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে তো চলেছেই—তাকে ভাববার ফুরসৎ পর্যন্ত দিচ্ছে না। না না, সে ভেবে দেখবে। খুশি চারদিকে তাকাল। বসবারও জায়গা নেই। যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। চা-খানাগুলোর দরজা বন্ধ। আর খোলা পেলেও সেখানে সে ঢুকবে না। নিরিবিলিতে বসে সে ভাবতে চায়— হৈ হল্লার ভিতরে যেতে তার মন চাইছে না, চোখের কোণায় কান্না জমে আছে, কখন ঝরে পড়বে কে জানে। লোকের সুমুখে কেঁদে ভাসালে ওরাই বা বলবে কি?

খুশি বসবার জায়গা খুঁজে পেল না। ঠিক করল পথ চলতে চলতেই সে ভাববে। কিন্তু কোথায় যাবে? রুপোর মতো সাদা পৃথিবী বিছিয়ে আছে— অনন্ত হিমবিস্তার—এর বুকে বসবার জায়গা তো নেইই, এমনকি যাবার জায়গাও বুঝি মিলবে না। কোথাও কেউ নেই, দুএকটা ছোটপাখী খিদের জ্বালায় উড়ে বেড়াচ্ছে : খুশির মনে হোলো, ঐ ছোট পাখীগুলোর মতোই সেও নিরুপায়। এই বরফ ঢাকা পৃথিবীতে এমনি করেই তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে, আশ্রয় সে পাবে না। হাওয়া বুঝি তারই দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, গোঙিয়ে উঠছে।

সত্যি কোথায় সে যাবে? এই তো এখন সমস্যা—এই সমস্যার সমাধান না করে আজেবাজে কথা ভাবলে তো চলবে না। ছোটখাট কোনো হোটেলে ঢুকে পড়বে নাকি? না, সেখানে সে মরে গেলেও যাবে না। কি নোংরা জায়গা! পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে, চারদিক থেকে পচা গন্ধ ভেসে আসছে। বসতে গেলে তার সাফ কাপড় চোপড় ময়লা হয়ে যাবে। তাছাড়া বসবার কি যো আছে? ছারপোকার তো গাদি লেগে আছে চেয়ার আর বেঞ্চিতে। এক হয় যদি সে কোনো বড় হোটেলে যায়? কিন্তু ট্যাক যে খালি। শুধু পাঁচ ডলারের একখানা নোট আছে—এই তো তার সম্বল। একটা হামামে অবিশ্যি সে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু ওরা আবার দুপুর রাতেই দোকানের দরজা

বন্ধ করে দেয়। রাত কাটাবার ওখানে সুবিধে নেই। খুশি ভেবে ভেবে হেদিয়ে গেল, কিন্তু রাত কাটাবার আস্তানা খুজে পেল না।

হতাশ হয়ে পড়ল খুশি। এতদিন সে পিকিঙ শহরে কাটিয়ে দিল অথচ আজ তার মাথা গোঁজবারও একটা ঠাঁই নেই। পুঁজির মধ্যে পরনের এই কাপড়-জামা আর পাঁচ ডলারের একখানা নোট, এমনকি তার বিছানা পর্যন্ত সে হারিয়েছে। যাক্‌, আজ রাতটা না হয় কাটিয়ে দিল, কাল কি হবে? আবার রিক্সা টানবে! আবার রিক্সা! এতদিন ধরে রিক্সা টেনে এই তো ফল হোলো—মাথা গোঁজবারও ঠাঁই নেই। যে কটা টাকা জমিয়েছিল—তাও চলে গেছে।

আচ্ছা, অন্য ব্যবসা করলে কেমন হয়! ফেরিওয়ালার ব্যবসা সে করতে পারে কিন্তু পুঁজি তো মাত্র পাঁচ ডলার। ওতে কি হবে। মায় কাঁধে চুপড়ি ঝুলোবার বাঁকটা পর্যন্ত কিনতে হবে। আর তাতে রোজগারই বা কত হবে? পেটও ভরবে না। সহায়-সম্বল না থাকলেও একজন রিক্সাওয়ালা তিরিশ কি চল্লিশ সেণ্ট দিনে রোজগার করতে পারে। আর ফেরিওয়ালার বেলায় তো তা হবে না। তার যতো কমই হোক কিছু মূলধন চাই, তাছাড়া রোজগারেরও কিছু ঠিক নেই। ফেরি করার ব্যবসায় মূলধন উড়িয়ে দিয়ে তারপর যদি আবার রিক্সার হাতল ধরতে হয়, তার চাইতে লজ্জা আর কি আছে। টাকা তো গেলই, ভাই-বেরাদারদের কাছে মানও আর বাঁচল না। না, সে ফেরি করে শেষ সম্বল উড়িয়ে দিতে রাজি নয়।

আচ্ছা, কারো বাড়িতে চাকর হলে কেমন হয়? কিন্তু ও কাজ কখনো সে করেনি। কাপড় ধুতে সে পারবে না, তাছাড়া রান্না তো জানেই না। না, কোনো কাজেরই সে উপযুক্ত নয়। ঢাউস একটা জিনিস যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে, কোনো উপকারেই লাগছে না।

কখন যে সে এসে মধ্যসাগরে এসে পৌছল তার নিজেরই খেয়াল নেই। সেতুর উপর সে উঠে এল, দুপাশে শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে, যতদূর চোখ যায় সব ফাঁকা শুধু মিহি বরফ ঝরছে। এতক্ষণ সে পথ চলছিল—বরফ পড়ছে কি পড়ছে না সে সম্বন্ধে তার খেয়ালই ছিল না। এবার খেয়াল হোলো। মাথায় হাত দিল সে; উলের টুপিটা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে, কামিজের উপর জমেছে বরফ। আশেপাশে কেউ নেই, ঘাঁটের পুলিসটাও পালিয়ে গেছে। পথে আলোর বাল্বের উপর ঝরছে বরফ, কেঁপে কেঁপে উঠছে আলো। খুশি চারদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল। তার বুকখানা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

বহুক্ষণ সে সেতুর উপর দাঁড়িয়ে রইল। চারদিক মরার মতো নিস্তব্ধ:

টু শব্দটি নেই, নেই জীবনের একটু সাড়া। শুধু বরফ ঝরছে, এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ছে, ঢেকে দিচ্ছে। সাদা কবর তৈরী হচ্ছে। মুহূর্ত পরেই পৃথিবী সেই কবরে সটান শুয়ে পড়বে। নাড়ির স্পন্দন তার থেমে যাবে।

খুশি এই প্রশান্তির ভিতরে বিবেকের সুর শুনতে পেল। নিজের কথা সে ভাববে না; চাও পরিবারের কি হোলো আগে খোঁজ করতে হবে। শুধু কর্ত্রী আর কাও-মা এরা সেখানে রয়েছে, একটা পুরুষও নেই! মনিবের উপর সে অবিচার করতে পারবে না, কত ভালো মনিব তার! এখনও যে সে নিঃসম্বল হয়নি, সে তো মনিবের জন্যেই, আর সে ভাবতে পারল না। সে ফিরে চলল।

দরজায় কয়েকখানা পায়ের ছাপ, পথে মোটরের দাগ বরফের উপর ফুটে উঠেছে। তবে কি কর্ত্রী আর কাও-মা চলে গেল।

উঠোনের দরজার কাছে সে এসে দাঁড়াল। দরজায় ধাক্কা দিতে সাহস হচ্ছে না, কি জানি, গোয়েন্দা বেটা যদি আবার ধরে ফেলে! চারদিকে তাকিয়ে সে দেখল—না, কেউ নেই, বুক দুলে উঠল। ধাক্কা মেরেই সে দেখবে দরজায় —তারপর যা হয় হবে। তার তো বাড়িঘর নেই—গ্রেফ্‌তার করলেই বা কি এল গেল। আস্তে আস্তে সে দরজায় ধাক্কা মারল। দরজা খুলে গেছে। পা টিপে টিপে সে দেয়াল ঘেঁসে চলতে লাগল। তার ঘরের আলোটা এখনো জ্বলছে। তার ঘর! ফুঁপিয়ে তার কাঁদতে ইচ্ছে হোলো। গুঁড়ি মেরে জান্‌লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কান রইল খাড়া। কে যেন কাশছে। খন্‌খন্‌ আওয়াজ বেরুচ্ছে। কাও-মাই অমনি করে কাশে। দরজা ঠেলে সে ঢুকে পড়ল।

কে কে? ওমা তুমি! ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে বাছা! কাও-মা বুকে হাত দিয়ে বিছানায় বসে পড়ল। কি হয়েছে তোমার খুশি?

খুশি উত্তর দিতে পারল না, চুপ করে রইল। যেন কত বছর পরে কাও-মার সঙ্গে তার দেখা। বুকের স্পন্দনও থেমে গেছে।

কি হয়েছে তোমার? কাও-মার স্বরে কান্না, তোমার আসার আগে মনিব এই বলে ফোন করলেন, আমরা যেন তাড়াতাড়ি চো-র বাড়িতে চলে আসি। তিনি আরো বললেন, তুমি এখানে এখুনি এসে পড়বে। তুমিতো এসেও ছিলে, আমি নিজে দোর খুলে দিলাম যে! তোমার সঙ্গে কে একটা লোক ছিল বলে তখন কোনো কথা বলিনি। কর্ত্রীর ঘরে গিয়ে সব গোছগাছ করলাম। কিন্তু তোমার দেখাই নেই।

এদিকে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে গরম কাপড়ে জড়িয়ে কোলে নিতে হোলো। তারপর লাইবেরী ঘরে গিয়ে পট নিলাম, তোমার তখনো দেখা নেই। কি করছিলে তখন? সব জিনিসপত্র কোনো রকমে তো গুছিয়ে নিলাম, তারপরে

তোমার খোঁজ করলাম। ওমা, কোনো পাত্তাই নেই—কর্ত্রী তো রেগে আগুন। একে তো কর্তার ফোন এসেছে, তার উপরে তোমার দেখা নেই। তিনি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। কি আর করি, নিজেই গাড়ি ডেকে আনলাম কিন্তু বাড়ি তো আর একেবারে সেই তিন রাজ্যির রূপকথার মতো ফেলে যেতে পারি না। তাই কর্ত্রীকে বললাম, আপনি চলে যান, আমি বাড়িতে পাহারা দেব। খুশি এলে তখন আমি যাব। না এলে, এইখানেই আমায় থাকতে হবে। কি হয়েছিল তোমার? বল, চুপ করে রইলে কেন?

খুশি চুপ করে রইল, কি বলবে ভেবে পেল না।

দুএকটা মুখের কথাই খসাও্না বাছা! বোবা হয়ে থাকলে তো চলবে না! কি, হয়েছিল কি?

তুমি এখুনি চলে যাও! খুশির মুখ দিয়ে কথা কটা বেরিয়ে গেল।

তুমি বুঝি বাড়িঘর দেখবে? কাও-মা রেগে গেল।

কত্তার সঙ্গে দেখা হলে বলবে, আমাকে গোয়েন্দায় ধরেছিল, কিন্তু...কিন্তু ধরেনি।

এ আবার কেমন ধারা কথা গো? কাও-মা হেসে উঠল।

শোন, খুশি রেগে গিয়ে বলল, কত্তাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়তে বলবে। গোয়েন্দা বেটা বলেছে, শীগ্‌গিরই ওরা তাকে ধরবে। চো-র বাড়িও খুব ভালো জায়গা নয়। পালিয়ে যেতে বলবে। যাও, আমি দেওয়াল টপকে ওয়াঙদের বাড়ি গিয়ে আজকের রাতটা কাটাব, কাল আবার কাজের খোঁজ করতে হবে। কত্তাকে বোলো, উনি যেন আমাকে মাফ করেন।

তোমার কথা শুনে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে বাছা! কাও-মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কি জানি, গিন্নী আবার যেরকম লোক, হয়তো গাড়িতে যেতে যেতে খোকার গায়ে কাপড় ভালো করে টেনে দেয়নি—ঠাণ্ডাই হয়তো লেগেছে। যাই; দেখিগে, খোকা কেমন আছে। আচ্ছা, আমি বলব'খন খুশি কর্তাকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বলেছে। আর সে আজ দেয়াল টপকে ওয়াঙদের বাড়ি রাত কাটাবে, কাল কাজের খোঁজে বেরুবে—কি, এই কথাগুলো বলবতো?

খুশি ঘাড় নাড়ল।

কাও-মা চলে গেল। খুশি ফটকে তালা লাগিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। ঘটের টুকরোগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। একটা টুকরো সে তুলে নিল, আবার কি ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার বিছানা ঠিকই আছে, চাদরটা পর্যন্ত একটু কুঁচকে যায়নি। কি ব্যাপার! তবে কি সান গোয়েন্দা নয়? না, না, তা সম্ভব নয়। বিপদ না ঘটলে মনিব কি তার বাড়িঘর ফেলে এমনি করে

পালাবে? খুশি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। হাঁ, বড় গোলমেলে ব্যাপার—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বিছানার একপাশে সে বসে পড়ল। কিসের শব্দ না? লাফিয়ে আবার সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বেশিক্ষণ সে এখানে থাকতে পারবে না; কি জানি, গোয়েন্দাটা আবার যদি ফিরে আসে? তার মনে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে ভাবনা:...বাড়ি ছেড়ে পালালে মনিবের কাছে সে আর মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু কাও-মা তো খবর দেবে? না, তাহলেও চিন্তার আছে বই কি।

সে কখনো জীবনে কাউকে ঠকায়নি, কারো কাছ থেকে সুবিধে আদায় করেনি, নিজেই সে ঠকেছে। এই তো আবার তার শেষ সম্বল হারিয়ে বসল। এখন এই শূন্য বাড়িতে বসে থেকে কি করবে? বিড়বিড় করে আপন মনে বকতে বকতে বিছানাটা বেঁধে ফেলল।

বিছানার মোটটা কাঁধে নিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে সে দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল। মোটটা রেখে দেয়ালের উপরে উঠে আস্তে আস্তে ডাকল: চেঙ, অ-চেঙ, বড় কি ঘুমিয়েছ নাকি? চেঙ ওয়াঙদের বাড়ি মাস মাইনেয় রিক্সা টানে।

কেউ সাড়া দিল না। খুশি ঠিক করল, যা থাকে বরাতে, সে লাফিয়ে তো পড়বে। বিছানার মোটটা নিয়ে আগে ছুড়ে ফেলে দিল। বরফের উপর ঝুপ করে পড়ল মোট। খুশির বুকের ধুকধুকানি বেড়ে গেছে। এবার সে নিজে লাফিয়ে পড়ল। বিছানাটা কাঁধে নিয়ে সে চলল বড় চেঙের খোঁজে। চেঙ কোথায় থাকে সে জানে, নিঝুম বাড়ি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, খুশির হঠাৎ মনে হোলো, চুরি করা তো খুব সহজ। কিন্তু তার সে মতলব নেই। সে এবার জোরে পা চালিয়ে চেঙের ঘরের সুমুখে এসে দাঁড়াল। গলা খেঁকারি দিতেই ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

কে, কে?

আমি, খুশি। দরজাটা খোল, খুশি বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল। চেঙের স্বর শুনে তার বুকটা যেন খানিকটা হাল্কা হয়ে গেছে। চেঙ তার বন্ধু, তার কাছে পাবে সে দুঃখে সান্ত্বনা।

বড় চেঙ আলো জেলে একটা ছেঁড়া কোট পরে দরজা খুলে দিল।

আরে, এই দুপুর রাতে কোত্থেকে এলে?

খুশি বিছানার মোটটা ঘরের এক কোণে রেখে তারই উপর বসে পড়ল। মুখে তার কথা নেই।

বড় চেঙের বয়েস তিরিশ কি তার কিছু বেশি হবে। সারা গাল খুদে খুদে বিচিত্তে ছেয়ে গেছে। খুশির সজে তার বন্ধুত্ব নেই, দেখা হলে কথা বলে এই

পর্যন্ত। মাঝে মাঝে তার মনিব আর শ্রীযুক্ত চাও এক সঙ্গে বাজার করতে বেরোন। তারা বাজারে ঢুকলে ওরা চা-খানায় ঢুকে দুএক পাত্র চা একসঙ্গে খায়, বিশ্রাম করে নেয়। খুশির বড় চেঙের উপরে তেমন শ্রদ্ধা নেই। লোকটা জোরে ছুটতে পারে বটে, কিন্তু কেমন করে হাতল ধরে যেন! মনে হয়, গায়ে এক ফোঁটা জোর নেই। তাই বলে চেঙ লোক খারাপ নয়। কিন্তু অমন রগ-ঢিলে লোককে মিতে বলতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।

কিন্তু আজ রাতে চেঙকে তার খুব ভালোই লাগল। খুশি চুপ করে বসে রইল, তার বুকে উছলে উঠছে কৃতজ্ঞতা। কিছুক্ষণ আগে সে মধ্যসাগরের সেতুর উপর দাঁড়িয়েছিল, নিঃসঙ্গ অবস্থায়; বরফ ঝরছিল; এখন সে আশ্রয় পেয়েছে, পেয়েছে চেনা মুখের দেখা।

বড় চেঙ কম্বলের ভিতরে ঢুকে পড়ে আঙুল দিয়ে ছেঁড়া কোটটা দেখিয়ে বলল, নাও, কোটটার পকেট থেকে সিগারেট নিয়ে খাও।

খুশি এমনি সিগারেট খায় না, কিন্তু আজ সে না বলতে পারল না। একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে পুরে দিল।

কি হয়েছে? বড় চেঙ জিজ্ঞেস করল, চাকরী ছেড়ে দিলে নাকি?

না। খুশি বিছানার মোটটার উপর বসেই বলল। খুব বিপদ! কর্তারা সব পালিয়ে গেলেন, একা বাড়ি পাহারা দিতে পারব না বলেই তোমার এখানে এসেছি।

কি বিপদ ঘটল? বড় চেঙ উঠে বসল।

ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু বিপদ যে খুব সে কথা আমি বলতে পারি। কাও-মাও চলে গেছে।

বাড়ি খালি পড়ে আছে?

হাঁ, দরজায় তালা মেরে এখানে চলে এসেছি।

হুঁ! বড় চেঙ খানিকক্ষণ ভেবে বলল, আচ্ছা, আমার মনিবকে ব্যাপারটা জানালে কেমন হয়? বড় চেঙ উঠে পড়ে ছেঁড়া কোটটা গায়ে দিল।

কাল বোলো। আজ রাতে আমিই সব গুছিয়ে বলতে পারব না। খুশির ভয় হোলো ওয়াঙ-কর্তা হয়তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করবেন, সে কোনো উত্তরই দিতে পারবে না। কি উত্তরই বা দেবে? মাথাটায় যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।

শুধু একটা জিনিস সে জানে, মনিব, তার স্ত্রী, বাচ্চা খোকা, কাও-মা—সবাই পালিয়ে গেছে। এক সেইই এখানে পড়ে আছে। সকলেই উপায় খুঁজে পেয়েছে;—সে যেমন উপায়ই হোক না—সরেও তারা পড়েছে। কিন্তু তার

কোনো উপায় নেই, তাই সে পালাতে পারেনি। রিক্সাওয়ালাকে আবার উপায় বাতলে দেবে কে? রিক্সাওয়ালাদের এমনিই বরাত। হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে যা পায় তা দিয়ে দিন চলে না। সমাজের একেবারে নিচু তলার বাসিন্দে সে, ভাগ্যের চড় চাপড়, আইনের চাবুক তার উপর এসে অনবরত পড়ছে, কিন্তু মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া তো তার উপায় নেই!

সিগারেটটা সে শেষ করে ফেলল, কিন্তু তখনো ভাবনা থিতিয়ে যায়নি মগজে। বাড়ি ছেড়ে এসে সে ভালো না খারাপ করেছে—সেকথা সে বুঝতে পারল না। সে যেন একটা মুরগীর ছানা, রাঁধুনি তাকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে; আর একবার নিশ্বাস ফেলতে পারলেই সে তো যথেষ্ট! মরা-বাঁচার চিন্তা—কে করে এখন? বড় চেঙের সঙ্গে পরামর্শ করতে তার খুব ইচ্ছে হোলো, কিন্তু পরামর্শ করবে কি? ভালো করে সে কথাই বলতে পারছে না। সত্যিই, কথা বলতে গেলে কেমন গোলমাল হয়ে যায়। জীবনে সে বহু দুঃখ সহ্য করেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি। সে যেন বোবা মানুষ। রিক্সা সে কিনল, তারপর একদিন রিক্সাখানাও গেল। টাকাও জমাল; টাকা গেল; এমনি করেই চলেছে তার জীবন। তার পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেছে। তার শেষ সম্বল কেউ না কেউ ঠকিয়ে নিয়ে গেছে। কারো উপর সে রেগে উঠতে পারেনি—কুকুর দেখলেও সে পথ ছেড়ে দিয়েছে—আর তার ফল কিনা এই হোলো! এখন আর কোনো আশা-ভরসাই নেই!

পুরনো কথার জবাব কেটে কি হবে? কালকের কথাই সে ভাববে। কাল কি করবে? চাঙ-বাড়িতে ফিরে যাওয়ার তো উপায় নেই—কোথায়ই বা সে যাবে?

আজ রাতটা তোমার এখানে কাটিয়ে দেব ভাবছি—কি বল? এ যেন পথের নেড়িকুত্তা বাহি করবার জন্যে কোণ খুঁজে পেয়েছে! এই কোণটায় বসেই সে মিনিট খানেক অন্তত আরাম করে জিরিয়ে নেবে। কিন্তু দেখতে হবে, অন্যের অসুবিধে না হয়।

—কি ঠাণ্ডাই পড়েছে! আর বাইরে বরফে তো ঢেকে গেছে। এমন রাতে কোথায় আর যাবে? মেঝেয় শুতে পারবে তো? না পার, বিছানায় এস, কোনো রকমে দুজনের জায়গা হবে'খন।

—খুশি বিছানায় শুতে চাইল না। মেঝেয়ই সে শুতে পারবে।

বড় চেঙ ঘুমিয়ে পড়ল। খুশির চোখে ঘুম এল না। সে বারবার এপাশ ওপাশ করল, ঘুম যে ছাই আসেই না! ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এসে ঢুকছে, বিছানা যেন ঠাণ্ডা লোহার পাত, গা ঠেকানো যায় না। কোনোরকমে হাঁটু দুটো কুঁচকে ঘন হয়ে সে শুয়ে রইল। দোরের ফাঁক দিয়ে ছুঁচের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া

এসে গায়ে বিঁধছে, অস্থির করে তুলছে। খুশি জোর করে চোখ বুজল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না। চেঙের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে চেঙ। খুশির হিংসে হোলো। ওকে ঠেলে জাগিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু উচিত হবে কি? খুশি আবার ঘুমোতে চেষ্টা করল। ঠাণ্ডা হাওয়া গলায় ঢুকেছে, বেদম কাশি আসছে। কিন্তু কাশবারও উপায় নেই। কাশির শব্দে চেঙ হয়তো এখুনি জেগে উঠবে।

ঘুমোতে সে পারল না। উঠে পড়ে, নিঃশব্দে একবার মনিবের বাড়ি ঘুরে আসবে কিনা—এই কথাই সে ভাবতে লাগল। চাকরি তো সে ছেড়ে এসেছে; বাড়িতেও এখন কেউ নেই; এখন গিয়ে দুচারটে জিনিস নিয়ে এলে কেমন হয়? নিজে খেটেখুটে যে কটা টাকা সে জমিয়েছিল, তা তো চুরি হয়ে গেল। আর মনিবের জন্যেই তো ব্যাপারটা ঘটল। এখন সে যদি মনিব বাড়ি থেকে গোটা কয়েক জিনিস চুরি করে নিয়ে আসে তাতে ক্ষতি কি? চাও বাড়িতে কাজ করতে এসেই তো সর্বস্ব খোয়াল, এখন চাও বাড়ির জিনিস দিয়ে ক্ষতি-পূরণ করাই তো তার উচিত। এর থেকে ভালো উপায়ও আর নেই। এমনি ধারা চিন্তা করতে করতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। হাঁ, সে এখুনি যাবে। অত কষ্টের রোজগার গোয়েন্দাটা চুরি করে নিয়ে গেছে, যাক না, টাকাটা সে সহজেই ফিরে পাবে। হাঁ হাঁ, সে আর দেরি করবে না!

খুশি বিছানায় উঠে বসল, কিছুক্ষণ পরেই আবার শুয়ে পড়ল। বড় চেঙ যদি জেগে থাকে—যদি ব্যাপারটা দেখে ফেলে? কে জানে হয়তো ঘাপটি মেরে ঘুমের ভাণ করেই ও পড়ে আছে। বুকে ধুকধুকানি বেড়ে চলেছে। না, চোর সে হতে পারবে না। কিছুক্ষণ আগেই তো সে ভাবছিল, মনিবের কাছে কি করে মুখ দেখাবে। সে তার পরামর্শ মতো কাজ করতে পারেনি। তার তবু ওজুহাত আছে, চাইকি মনিবের সঙ্গে দেখা হলে সবকথা সে খুলেও বলতে পারে, কিন্তু চুরি করলে তো আর তা সম্ভব হবে না। না না, অসম্ভব। সে না হয় টাকার অভাবে মরে যাবে, কিন্তু চুরি করতে পারবে না।

কিন্তু অন্য কেউ যদি খালি বাড়ি পেয়ে চুরি করে? সান কিছু নিয়ে গেছে কি না তাই বা কে বলবে? তবে তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া চলতে পারে। খুশি আবার উঠে বসল। দূরে একটা কুকুর ডাকছে। আবার সে শুয়ে পড়ল। যেতে সে পারবে না। অন্যে চুরি করবে বলে কি সেও দলে ভিড়ে পড়বে তারপর বিবেকের বিষদাঁত ফুটবে না? লজ্জায় মুখ দেখানোই তো ভার হবে। পৃথিবীতে গরীব হওয়াটাই এক মস্তবড় অভিশাপ, তার উপর চুরির কলঙ্ক চেপে বসলেই হয়েছে আর কি?

আর একটা কথা, কাও-মা জানে সে ওয়াঙদের বাড়িতে এসেছে। কিন্তু চুরি করুক বা না করুক, কিছু চুরি গেলে তার উপরই দোষ পড়বে। চুরি

করা চুলোয় যাক, তার ভয় হোলো, রাতে কিছু চুরি না যায়। তখন পীতনদীতে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়লেও সে কলঙ্ক ধুয়ে যাবে না। এতক্ষণ শীত করছিল, এখন ভাবনায় ভাবনায় গায়ে যেন জ্বর এসেছে, হাত ঘামছে, তাইতো এখন কি করবে? মনিব বাড়িতে গিয়ে পাহারা দেবে নাকি! সে সাহস তো নেই। নিজের শেষ সম্বল দিয়ে কোনোরকমে বেঁচে গেছে; আবার ফাঁদে পড়তে সে রাজি নয়। কিন্তু যদি কিছু চুরি যায়, কি হবে তখন!

কোনো পথই সে খুঁজে পেল না। খুশি আবার উঠে বসল। মনের উপর পাথর চেপে বসেছে, চোখ বুজে আসছে, তবু ঘুমুতে সাহস নেই। লম্বা রাত কিন্তু খুশির চোখে ঘুম আসছে না।

কতবার সে মতলব ভাঁজল আর বদলাল তার ঠিক ঠিকানা নেই। হঠাৎ সে যেন আলো দেখতে পেল! ধাক্কা মেরে বড় চেঙকে জাগিয়ে দিল। বড় চেঙ, অ-বড় চেঙ, ওঠ, ওঠ।

কি হয়েছে? বড় চেঙ চোখ না মেলেই বলল, প্রস্রাব করবে বুঝি? ঐ খাটের তলায় ডাবর রয়েছে।

ওঠ, ওঠ! আলো জ্বালো।

কি, চোর এসেছে নাকি? বড় চেঙ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ঘুম টুটে গেছে তো? এখন আমার কথাগুলো শোনো।

বড় চেঙ হাই তুলল।

বড় চেঙ, একবার ভালো করে দেখে নাও। এই আমার বিছানা, এই আমার জামা-কাপড়। মনিবের দেওয়া নোটখানাও দেখালাম, আমার যা কিছু আছে, সব দেখলে তো?

হাঁ, দেখলাম তো, কিন্তু ব্যাপারটা কি? চেঙ আবার হাই তুলল।

ভালো করে দেখ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখলে চলবে না। এই আমার জিনিস-পত্তর। মনিবের একগাছা কুটোও আমার কাছে নেই—তাই না?

তাতো দেখতেই পাচ্ছি! আমরা মনিবের নুন খাই, তার জিনিসপত্র ছুঁতে যাব কেন? চুরি করা আমাদের ব্যবসা নয়। যতদিন পোষাবে কাজ করব, যেদিন পারব না ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। তাই বলে চুরি করতে যাব কেন? এই জন্যেই কি জাগিয়ে দিলে নাকি?

ভালো করে দেখে নিয়েছ তো?

বড় চেঙ হাসল। নিশ্চয়। ভালো করে দেখেছি। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?

না, না, আমি এইখানেই বেশ আছি।

তেরো

ভোর যেন একটু তাড়াতাড়ি হোলো। বছর শেষ আসছে। সবাই জোড়ায় জোড়ায় মুরগী কিনছে, খাইয়ে দাইয়ে একটু মোটা করে নিতে হবে তো! চারদিকে মুরগী ডাকছে, বেচাকেনা চলছে। প্রথম তুষার মুখে করে প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছে।

কিন্তু সারারাত ঘুমোতে পারেনি। ভোরের দিকে সে চোখ বুজল। ঘুম এল না, তন্দ্রায় ঢুলতে লাগল। এ যেন নদীর ঢেউয়ের মতো একবার তোমাকে উপরে নিয়ে যাচ্ছে, আবার নিচে তলিয়ে দিচ্ছে। ঘুম বটে, কিন্তু ঘুমের প্রশান্তি নেই। এমনি করে বহুক্ষণ সে পড়ে রইল, শরীর হিম হয়ে গেছে। বাইরে মোরগের ডাক কানে আসছে—অসহ্য হয়ে উঠছে ডাক। খুশির বেদম কাশি পেল। কিন্তু বড় চেঙ যদি কাশির আওয়াজে জেগে ওঠে? সে মুখে ভালো করে কম্বলের একটা কোণ গুঁজে দিল। এখনো রোদ ওঠেনি, পথে গাড়ির চাকার শব্দ, ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক শুরু হয়নি।

খুশি উঠে বসল। সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর দরজাটা ফাঁক করে একবার বাইরে তাকিয়ে দেখল। তেমন বেশি বরফ পড়েনি। হয়তো মাঝরাতেই বন্ধ হয়ে গিছল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ভোরাই কুয়াশায় এখনো পথঘাট ভালো করে চেনা যাচ্ছে না, পথঘাট ছেয়ে আছে কুয়াশায়। তার নিজের বড় বড় পায়ের ছাপ রয়েছে দোর গোড়ায়—বরফ পড়ে পড়ে আবছা হয়ে গেছে, কিন্তু মুছে যায়নি। এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

খুশি ঘরের ভিতর থেকে একটা ঝাঁটা এনে বরফ সাফ করতে শুরু করল। একটা কাজও করা হবে, তাছাড়া নিজের পায়ের ছাপটাও মুছে যাবে'খন। কিন্তু ঝেঁটিয়ে সাফ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ঝেঁটাটাও ছোট, তার উপর মাটিতে একেবারে নুয়ে পড়তে হয়। যাহোক, কোনোরকমে উপরের স্তরটা পরিষ্কার করে ফেলল, নিচে মিহি চাদরের মতো আর এক আস্তরণ জমে আছে, মটির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তবুও সে ক্ষান্ত হোলো না, বার দুই জিরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণের ভিতরেই আঙিনায় দুটো চারা উইলো গাছের গোড়ায় সে বরফের ঢিবি তৈরী করে ফেলল। ঘাম ছুটছে, শরীরটাও বেশ তাজা লাগছে। খুশি এবার হাঁপ ছাড়ল।

ঘরে গিয়ে জায়গামতো ঝাঁটা রেখে দিয়ে বিছানা গুটিয়ে ফেলল। চেঙের ঘুম এবার ভেঙেছে। সে হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, খুব দেরী হয়ে গেছে না কি? জড়ানো স্বর। চোখ মুছে জামার পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করল। দু'এক বার কষ্টে টেনে ধোঁয়া ছাড়ল। এবার সে পুরোপুরি জেগে উঠেছে।

খুশি, এখুনি চলে যেও না! গরম জল নিয়ে এসে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক! কাল রাতে তোমার উপর দিয়ে অত ধকল গেছে, নিশ্চয়ই ঘুম হয়নি?

আমিই গরম জল নিয়ে আসছি—বলতে গিয়ে খুশি থামল। রাতের ভয় এখনো কাটেনি, আবার তাকে ছেয়ে ফেলেছে, সব কিছু তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

না না, আমিই যাচ্ছি! তুমি আমার বাড়িতে এসেছ, তুমি কি যাবে? বড় চেঙ উঠে পড়ে জামা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আরে, উঠোন এরই ভিতরে সাফ করে ফেলেছ যে! সত্যিই তুমি বড় ভালো লোক। তোমাকে কিছু না খাওয়ালে আপশোষ থেকে যাবে। যাই কিছু নিয়ে আসিগে।

কিছুক্ষণ পরেই বড়চেঙ একগাদা কেক, বিস্কুট আর দুভাঁড় কাঞ্জি নিয়ে ফিরে এল।

চা করতে একটু দেরি হবে। এস, তার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেই। ফুরিয়ে গেলে আরো দুএকভাঁড় আনা যাবে'খন। পয়সা না থাকলেও ধারে নিয়ে আসবো। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রোজগার করি, ভালো মন্দ খাবার না খেলে চলবে কেন? কিসের জোরে খাটব বল দেখি। এস, শুরু করে দি!

কুয়াশা কেটে গেছে, রোদ উঠেছে; ঘরের ভিতরে স্বচ্ছ আলো। ওরা ভাঁড় মুখের কাছে নিয়ে চুমুক দিয়ে খাচ্ছে—কেমন একটা চুক্‌ চুক্‌ শব্দ হচ্ছে—মিষ্টি মিষ্টি শব্দ! শুনতে বড় ভালো লাগে। কারো মুখে কথা নেই। শুধু কেক আর বিস্কুট চিবুচ্ছে, কাঞ্জি দিয়ে গলা ভেজাচ্ছে।

কি করবে এখন? বড় চেঙ দাঁত থেকে কেকের টুকরো খুঁটে বার করতে করতে বলল। আমি চলে যাব। খুশি তার গোটানো বিছানাটার দিকে তাকাল।

আচ্ছা, কি হয়েছিল বল দেখি? আমার যেন কেমন গোলমেলে ঠেকছে। বড়চেঙ একটা সিগারেট খুশির দিকে এগিয়ে দিল। খুশি সিগারেটটা নিল।

খুশি লজ্জা পেল। বড় চেঙকে ব্যাপারটা খুলে না বলে সে অন্যায়ই করেছে। সে ব্যাপারটা যেমন যেমন ঘটেছিল বলল, খুঁটিনাটি কিছুই বাদ পড়ল না।

বড় চেঙ ঠোঁট চুষতে চুষতে শুনে গেল। যেন সে গল্পের কেমন তার হয়েছে চেখে পরখ করে দেখছে।

আমার তো মনে হয়, চাও কত্তাকেই তোমার খুঁজে বার করা উচিত এমনি করে চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া টাকা কটাও এমনি করে যেতে দেবে নাকি? তুমিই তো বলেছ, চাও-কত্তা তোমাকে বিপদ দেখলে সরে পড়তে বলেছিলেন? গাড়ি থেকে নামতেই তো গোয়েন্দাটা ধরে ফেলে! তোমার আর দোষ কি? তুমি তো আর অবিশ্বাসী নও, ব্যাপারটা যা দাঁড়াল, তাতে প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই ছিল না। চাও-কত্তার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, ভীষণ লজ্জা করছে—ওসব কথার আমি কোনো মানেই খুঁজে পাই না। আমার পরামর্শ যদি শোনো, চাও-কত্তাকে খুঁজে বার কর, তাকে সব খুলে বল। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে গালাগাল দেবেন না, তাছাড়া তোমার টাকাটাও তিনি দিয়ে দিতে পারেন। এখুনি চলে যাও—বিছানা পত্তর এইখানেই থাকুক না। দিন আজকাল হুস হুস করে চলে যায়, সূর্যই ওঠে বেলা আটটায়। যাও, তাড়াতাড়ি যাও, দেরি কোরো না।

খুশির ধড়ে আবার যেন প্রাণ এল। কিন্তু এখনো মনটা খুঁত খুঁত করছে মনিব কি বলে বসবেন কে জানে! কিন্তু বড় চেঙের বুদ্ধি আছে, ঠিক কথাই সে বলেছে। গোয়েন্দাটা ধরে রেখেছিল, পিস্তল বার করবে বলে ভয়ও দেখিয়েছিল। তা খুশি কি করবে?

যাও, দেরী কোরো না! বড় চেঙ আবার বলল। কাল রাতে তোমার মাথার ঠিক ছিল না। কি যে মাথামুণ্ডু বললে, বুঝতেও পারলুম না। তা অতো বড় বিপদে মাথা ঠিক আর কজনের থাকে? কিন্তু আমি যে পথ বলে দিলাম, এইই ঠিক পথ। তোমার থেকে আমি কিছুটা তো বড়, তাছাড়া জীবনে বহু দেখেছি-শুনেছি, আমার কথা শুনলে তোমার ভালোই হবে। রোদ উঠেছে—তুমি এখুনি বেরিয়ে পড়।

সূর্য উঠেছে, শহরে ছড়িয়ে পড়েছে আলো। আকাশ নীল, নিচে সাদা বরফ বিছিয়ে আছে—আকাশের আলো আর বরফের আলো মিশে একাকার হয়ে গেছে। দেখা যায় না, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। খুশি ঘর থেকে বেরোতে যাবে এমন সময় ফটকে কে ঘা দিল।

বড় চেঙ কে এসেছে দেখতে গেল। ফটক থেকে চিৎকার করে বলল, খুশি, খুশি, তোমার খোঁজে কে একজন এসেছে।

চো-র বাড়ি থেকে ছোটওয়াং এসেছে। ঠাণ্ডায় তার নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলছে। খুশিকে দেখে বড় চেঙ বলল, চল, ওকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে বসা যাক। তিনজন ঘরে ফিরে এল।

ছোটওয়াঙ হাত ঘষতে ঘষতে বলল, আমি বাড়িটা দেখে যেতে এলাম। ভিতরে যেতে পারলাম না, ফটক তালা বন্ধ। উঃ, কি ঠাণ্ডা পড়েছে ভাই!

চাও-কত্তা আর গিন্নি আজ ভোরে রওনা হয়ে গেছেন। টিয়েনসিন না সাংহাই কোথায় যাবেন ঠিক বলতে পারি না। আমাকে বলে গেছেন বাড়ির তত্ত্ব তালাস করতে। উঃ, কি ঠাণ্ডা ভাই!

খুশির মনে হোলো, সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে। বড় চেঙের কথা মত সে মনিবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মনিব তো চলে গেছেন, এখন কি হবে? সে বহুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞেস করল, কত্তা আমার কথা কিছু বলে যায়নি?

না, ভোর হবার আগেই ওরা উঠে পড়লেন কিনা। তখন কি আর কথা বলার ফুরসৎ আছে? ট্রেন সাতটা চল্লিশে। বাড়িতে কি করে ঢুকব ভাই?

দেয়াল টপকে চলে যাও। খুশি বিছানা গোটাতে শুরু করল।

কোথায় যাচ্ছ? বড় চেঙ জিজ্ঞেস করল।

মানবমিলনেই যাচ্ছি—আর যাই বা কোথায়? বারে বারে হতাশা। অন্য কোনো উপায় তার আর নেই—সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এই বরফ ঢাকা সাদা পৃথিবী পার হয়ে বাঘিনীর কাছে, সেই কালো প্যাগোডার কাছেই, তাকে ফিরে যেতে হবে। আত্মসম্মান, আশা-ভরসা সব কিছু খুইয়ে নিঃস্ব, রিক্ত হয়েই সে চলেছে। কুকুরের মতোই তার বরাত।

বড় চেঙ তার কাছে এসে বলল, তুমি যে মনিবের একটা কুটো পর্যন্ত নাওনি, ছোট ওয়াঙের কাছে একথা বলে কোনো লাভ নেই। তোমার বরাত ফিরুক ভাই, যদি কখনো এই পথে আস, একবার দেখা দিয়ে যেও। ভালো কাজের খবর পেলে তোমাকে জানাতে পারব। তুমি চলে গেলে ছোটওয়াঙকে নিয়ে ওবাড়ি যাব'খন। ওবাড়িতে কয়লা পাওয়া যাবে?

কয়লা আর জ্বালানি কাঠ উঠোনের পাশে ছোট ঘরটায় গাদা করা আছে। খুশি বিছানার মোটটা কাঁধে তুলে নিল।

পথের বরফ এখন আর সাদা দেখাচ্ছে না। গাড়ির চাকায় ঘোড়ার খুরে কালো হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে সাদা রং ফুটে উঠছে। খুশি তাকিয়েও দেখল না, বিছানাটা কাঁধে নিয়ে সে এগিয়ে চলল। কোথাও না থেমে সে পৌঁছল মানবমিলনে। ফটকে এসে থামল না, একবার থামলে ঢোকবার সাহসই হয়তো হারিয়ে ফেলবে। সে সোজা ঢুকে পড়ল। মুখ তার পুড়ে যাচ্ছে।

সে ঠিক করল, বাঘিনীর সঙ্গে দেখা হলেই বলবে:

আমি এসেছি। তোমার এখন যা খুশি করতে পার। তুমি যা ঠিক করবে তাইই হবে। আমার আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু বাঘিনীর সঙ্গে দেখা হতে তার সব কথা কেমন গুলিয়ে গেল। কিছুই সে বলতে পারল না, চুপ করে রইল। বাঘিনী সবে ঘুম থেকে উঠেছে, চুলগুলো এলোমেলো, চোখ ফুলো, মুখের উপর দুএকটা ব্রণ ঠেলে উঠেছে।

এসেছ, তুমি এসেছ তাহলে? তার স্বরে উষ্ণতা, চোখে হাসি।

আমাকে একখানা রিক্সা ভাড়া দিতে হবে। খুশি মাথা নিচু করে জুতোয় লাগা বরফের দিকে তাকিয়ে বলল।

যাও; বুড়োকে বল না।' বাঘিনী নিচু গলায় বললে। পুবের ঘর দেখিয়ে দিল সে।

ন'কর্তা লিউ ঘরে বসে চা খাচ্ছেন। সুমুখে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। খুশি ঘরে ঢুকতেই তিনি খানিকটা বিরক্তি আর ঠাট্টার ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন, কিহে, আর যে দেখাই নেই! কাজকর্ম কেমন চলছে? রিক্সা কিনলে নাকি?

খুশি মাথা নাড়ল। ন'কর্তা আমাকে একখানা রিক্সা ভাড়া দিতে হবে।

সেকি! মাসমাইনের কাজ চুকে গেল? কোথাও ধোপে টিকছ না দেখছি। কাজ পাচ্ছ আর মোমবাতির মতো ফুঁদিয়ে শেষ করে দিয়ে চলে আসছ? যাও, দেখে শুনে একখানা রিক্সা বেছে নাওগে। ন'কর্তা লিউ পেয়ালাটা চুমুক দিয়ে শেষ করলেন। এস, এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও।

খুশি এক চুমুকে চা খেয়ে ফেলল। গরম চা; আগুনের কুল থেকে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে, আঁচ গায়ে লাগছে। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে তার। পেয়ালাটা রেখে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় ন'কর্তা তাকে বাধা দিলেন।

দাঁড়াও। অতো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ কেন? তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। সাতাশে তারিখ আমার জন্মদিন, আমি বহু লোককে নেমন্তন্ন করেছি। মেরাপ বাঁধা হবে। তোমাকে ঐ কদিন একটু খাটতে হবে। তাই বলছিলাম, ঐ কদিন না হয় রিক্সা নাই টানলে। ওদের উপরওতো—আঙিনার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে তিনি বললেন, আর নির্ভর করা যায় না! আর আমি ঐ হতচ্ছাড়াদের ডাকতেও চাই না। ওরা কাজ তো করবেই না, বরং সব পণ্ড করে দেবে। এক তোমার উপরেই নির্ভর করা যায়, তাই তোমাকেই বলছি। দেখছি তো, কোনো কাজ পড়লে তুমিই এগিয়ে যাও, মুখ ফুটে একবার বলতেও হয় না। তুমি গিয়ে উঠোনের বরফ প্রথমে সাফ করে ফেল। দুপুরে আমার এখানেই খাবে, বুঝলে?

যে আজ্ঞে কত্তা। খুশি আগেই ভেবে রেখেছিল, বাপ-বেটি যা বলবে, তাই করবে। সে হুকুম তামিল করে যাবে, তারপর বরাতে যা আছে তাই হবে।

বাঘিনী এমন সময় ঘরে ঢুকে বলল, বলিনি বাবা? খুশিই তো একমাত্র লোক, যার উপর কাজের ভার দিলে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। ওর মতো লোক এখানে আর একটাও নেই।

ন'কর্তা হাসলেন। খুশি মাথা হেঁট করে রইল।

এস, এস, বাঘিনী তাকে বাইরে ডাকল, আমি পয়সা দিচ্ছি, ভালো দেখে একটা ঝাঁটা কিনে নিয়ে এস, বাঁশের শলা হলেই কিন্তু—নইলে বরফ সাফ করা শক্ত হবে। তাড়াতাড়ি কিনে নিয়ে এসে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেল। মেরাপ বাঁধবার লোক এখুনি এসে পড়বে।

খুশিকে নিয়ে বাঘিনী তার ঘরে এসে পয়সা গুনে দিল। একটু চটপটে হও! বোকার মতো অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকো না! বুড়োকে খুশি কর, তাহলেই আমাদের ব্যাপারটার একটা সুরাহা হবে।

খুশি চুপ করে রইল। রেগে উঠতে যেন সে ভুলে গেছে। কোনো চিন্তাই সে আর করে না। কোনো রকমে দিন কেটে গেলেই হোলো। খাবার পেলে খাবে, কাজ পেলে কাজ করবে। হাত পা এখনো মজবুত আছে, কাজ করতে করতেই দিন শেষ হয়ে যাবে। কলুর চোখ বাঁধা খচ্চরগুলোকে সে ঘানিতে ঘুরতে সে দেখেছে, ঘুরছে তো ঘুরছেই—ক্লান্ত হলেও বাঁচোয়া নেই। ঠিক তেমনি চোখ বাঁধা খচ্চরের মতো সেও কাজ করে যাবে। কাজের আনন্দ তো চলে গেছে, কি করবে না করবে ভেবে কি হবে? কিন্তু মন বশ মানে কই? কথা কইবার আর তার ইচ্ছে নেই, ভাবতেও সে চায় না, এমনকি রেগে উঠতেও সে পারে না—তবু বুকটায় যেন কেমন দমসম লাগে, মনে হয় অনেক কিছু যেন আটকে আছে, বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না। এ যেন সরু গলা একটা বোতল—মাঝ পথে ছিপিটা আটকে গেছে। কাজের সময় কিছু তার মনে থাকে না, কিন্তু বিশ্রামের সময় আবার সেই নিরুদ্ধ ভাবনার স্রোতের ধাক্কা এসে লাগে—তুলোর মতো নরম সে স্রোত...কোনো স্বাদ নেই, গন্ধ নেই—কিন্তু নিশ্বাস ফুরিয়ে ফেলে—মনে হয় গলার কোথায় যেন একখানা স্পঞ্জ বিঁধে আছে।

কাজ করে সে ক্লান্ত হয়ে যায়, তাহলেই তো ঘুম পাবে, নিরুদ্ধ ভাবনার স্রোতে তার দম বন্ধ করে দিতে পারবে না। রাতে সে স্বপ্নের হুকুমবরদার হয়ে আর দিনে হাত পায়ের শাসন মেনে নেবে। আর সে তাইই করল। তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন মরা মানুষ, শুধু জ্যান্তলোকের মতো খাটতে পারে। উঠোন ঝেঁটিয়ে বরফের স্তূপ করল, জিনিসপত্র কিনতে ছুটল বাজারে, কেরোসিনের লম্পোর ফরমায়েস দিয়ে এল, রিক্সা ঘষে মেজে পরিষ্কার করল, টেবিল চেয়ার সরাল; তারপর মিলল ছুটি। ন'কর্তার দেওয়া খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার ভোরে উঠল, আবার কাজ! ভূতের মতো সে কাজ করে গেল। মুখে তার রা নেই, মনে নেই কোনো ভাবনা। শুধু মাঝে মাঝে স্পঞ্জের মতো ঠেলে উঠল সেই নিরুদ্ধ স্রোত। তার উৎসাহের স্রোতে ভাঁটা পড়ে।

মেরাপ বাঁধা শুরু হয়েছে। ঘরামি বাঁশের মাচাটা উপরে তুলে দিল—এর উপরে ছাউনি দেওয়া হবে। সমস্ত উঠোনটা জুড়েই মেরাপ বাধা হবে। চারদিক ঘিরে দেওয়া হবে, যাতে ছাউনিটা গরম থাকে। ছাউনির ভিতরে কাঠের পার্টিশন থাকবে, ছবি টাঙানো হবে দেয়ালে, পাশে শালু দিয়ে মুড়ে দেবে দেয়াল। দরজায় ঝুলাবে নানা রঙের কাপড়। মুরগীর খোপটা উঠোন থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। ন'কর্তার উনসত্তর বছরের জন্মদিন, সত্তর বছর হতে আর এক বছর বাকি—তিনি বেশ ঘটা করেই সব কিছু করছেন। মেরাপ বাঁধা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে, একটা এলাহি কাণ্ড হবে।

শীতের দিন ছোট। তাই বাঁশের কাঠামোটা তুলে নানা রঙের হরফ লেখা কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েই ঘরামি চলে গেল। কাল আবার এসে ছবি টাঙাবে, বাকি কাজগুলো করবে। ন'কর্তা লিউ রেগে উঠলেন, মুখ তার লাল হয়ে গেল। বেটা সারাদিন বসে বসে এই কাজ করেছে! তিনি খুশিকে ডেকে এনে হুকুম দিলেন, বেটা তো কাজে ফাঁকি দিয়ে পালাল। যাও এবার দেখে এসো লম্পো-গুলোর কি ব্যবস্থা হোলো। আর রাঁধুনিকেও বলবে—সে যেন কাজে ফাঁকি না দেয়। ন'কর্তা জানেন তারা ফাঁকি দেবে না—তবু তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

খুশি খবর দিয়ে ফিরে আসতেই তিনি আবার তাকে মেচিয়াঙ খেলার হাতির দাঁতের টেবিল আনতে পাঠালেন। দুতিনটে টেবিল আনতে হবে। একদিন তো জুয়ো খেলা—তাও যদি মনের সাধে না খেলা গেল তো কি আর হোলো? খুশি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টেবিল নিয়ে ফিরে এল। এবার তিনি তাকে পাঠালেন গ্রামোফোন আনতে—জন্মদিনের উৎসব করছে একটু সোরগোল না হলে জমবে কেন? খুশি একবারও জিরোবার সময় পেল না, রাত এগারোটা পর্যন্ত এমনি ফাইফরমায়েস তাকে খাটতে হোলো। সে রিক্সা টানে, এমনি ছুটোছুটি করা তার অভ্যেস নেই। শেষ বার ফিরে এসে তার মনে হোলো, সে আর পা তুলতে পারছে না।

সাবধান ছোকরা! বুড়ো বললেন, তোমাকে দিয়ে চলবে দেখছি, আমার যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকত। নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারতাম। যাও, জিরিয়ে নাও গে—কাল আবার খাটাখাটুনি আছে।

বাঘিনী এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। খুশির দিকে তাকিয়ে সে চোখ টিপল।

পরদিন ভোরেই ঘরামি কাজ করতে এল। ছবি আঁকা কাপড় দেয়ালে টাঙানো হোলো—তিন রাত্রির রূপ কথার যুদ্ধের ছবি। এ লিউ-পির সঙ্গে লু-পুর সে কি ভীষণ যুদ্ধ! তারপর চাও-উন পরাজিত লিউ-পির ছেলেকে বাঁচালেন। লিউ-পির শিবির পুড়ে গেল। তিনি কোনো রকমে রক্ষা পেলেন। আরো বহু গল্পের ছবিও সেখানে দেখা গেল। কতো বড় বড় যোদ্ধা ঢাল তলোয়ার আর বর্শা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে টগবগিয়ে চলেছেন। ন'কর্তা ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। দেখে মনে হোলো তিনি খুশিই হয়েছেন।

ঘরামির পরেই আসবাবের দোকান থেকে আসবাব নিয়ে এল। ছাউনির ভিতরে আটটা টেবিল পাশাপাশি পড়ল; টেবিলের উপর সাদা ঢাকনি। চেয়ারগুলো গদি মোড়া। উৎসবের ঘরের মাঝখানেই দীর্ঘজীবনের দেবতার বেদী তৈরী হয়েছে। ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে মাথার উপরে। টেবিলের উপরে লাল গালচে পাতা আছে। লাল গালচে দেখেই বুড়োর মনে পড়ল, আপেল তো আনা হয়নি। তিনি খুশিকে তাড়াতাড়ি আপেল আনতে পাঠালেন। বাঘিনী বুড়োকে না জানিয়ে দু'ডলার তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল ঐ দিয়ে সে যেন কেক কিনে নিয়ে এসে বুড়োকে উপহার দেয়।

সে আপেল নিয়ে ফিরে আসতেই ওরা আপেল টেবিলে সাজিয়ে রাখল। আপেলের পিছনে সাজিয়ে রাখল তার দেওয়া উপহার।

বাবা, দেখ, দেখ, খুশি তোমার জন্যে কেমন উপহার এনেছে! ওমা, ওর যে এমন চমৎকার পছন্দ তাতো জানি না। বাঘিনী ন'কর্তাকে ডেকে খুশির দেওয়া উপহার দেখাল। ন'কর্তা খুশির দিকে চেয়ে হাসলেন।

বুড়োর জন্মদিনের উৎসবের সবই তৈরী, শুধু একটা জিনিস এখনো এসে পৌছয়নি। লম্বা টেবিলটায় ধুছুচি রাখা হয়েছে, তারই পিছনে 'দীর্ঘায়ু হও' এই কথাটা বড় বড় হরফে লেখা থাকবে। প্রথা এই যে, যার জন্মদিন, সে এই হরফগুলো নিজে লেখাবার বন্দোবস্ত করবে না, তার কোনো বন্ধু তাকে হরফওলা কাপড়খানা উপহার দেবে। ন'কর্তা এক বন্ধুকে বলেও দিয়েছেন, কিন্তু এখনো তার দেখা নেই। ন'কর্তা রাগে জ্বলে উঠলেন।

বন্ধুবান্ধবের বিয়ে, জন্মদিন, এমনি কি কেউ মরলেও আমাকেই ওরা সুমুখে ঠেলে দেয়—আর আজ আমার জন্মদিন কিনা! বেজন্মা বেটারা সব খসে পড়েছে!

কাল তো ছাব্বিশে, টেবিল তো তার আগে সাজানো হবে না। অতো তাড়া কিসের? বাঘিনী তাকে শান্ত করবার জন্যে বলল।

আমি সবকিছু তৈরী করে রাখতে চাই। একটু একটু করে সব যোগাড় করা আমার ধাতে পোষায় না। খুশি, কারবাইড ও আলো আজ রাতেই

সিকা

জ্বালাতে হবে। বিকেল চারটের ভিতরে যদি না এসে পৌঁছায়, বেটাদের কি করি দেখ না। টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব।

খুশি, তুমি আর একবার গিয়ে একটু তাড়া দিয়ে এস। বাঘিনী বাপকে শুনিয়ে খুশিকে অনুরোধ করল। আজকাল বাপকে দেখলে সে খুশিকে কোনো না কোনো ফরমায়েস করে। খুশি কোনো কথা বলে না, মুখবুজে খাটে।

এ শুধু মুখের কথা নয় বাবা, বাঘিনী বলল, এ খুশির মতো ছেলে হলে তোমার বেশ হোতো। আমার এমন বরাত, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালুম! খুশির মতো ছেলে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া যায় বটে—এই দেখ না—কদিন একটু জিরোয়নি—কিন্তু আলিস্যি নেই—খেটেই চলেছে।

ন'কর্তা কোনো কথা বললেন না, খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, ওরে কলেরগান এসেছে না? নিয়ে আয় তো, গান শুনি।

পুরনো ভাঙা একটা গ্রামোফোন রেকর্ড খারাপ হয়ে গেছে, এমনকি পিন-গুলো পর্যন্ত মরচে ধরা। কোত্থেকে বুড়ো এমন জিনিস ধার করে এনেছে, কে জানে। দম দিয়ে গ্রামোফোন চালিয়ে দেওয়া হোলো। শব্দ বেরুচ্চে বটে! বিড়ালের লেজ মাড়িয়ে দিলে যেমন চিৎকার বেরোয় ঠিক তেমনি। চামারের জুতো সেলাইয়ের ছুঁচের মতোই বুকে গিয়ে বেঁধে। কিন্তু ন'কর্তার সে খেয়াল নেই, আওয়াজ বেরুলেই হোলো—তা যতো বিদকুটেই হোক না কেন।

বিকেলের দিকেই সাজানো-গোছানো হয়ে গেল। সব তৈরী, কাল রাঁধুনী এসে খাবার তৈরী করবে। ন'কর্তা নিজে ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছেন। হাঁ, হাঁ, সবই ঠিক আছে।

সন্ধ্যেরদিকে তিনি কয়লার দোকানে গেলেন। দোকানের ম্যানেজার কেঙকে বললেন, তিনি এই উৎসবের হিসেব রাখেন এই দেবতাদের ইচ্ছে। কেঙ হিসেব রাখতে ওস্তাদ। শানসি প্রদেশের লোক সে। কেঙ ন'কর্তার অনুরোধে রাজি হয়ে গেলেন। খুশিকে দিয়ে দুখানা প্রকাণ্ড খেরো বাঁধানো খাতা আর কিছু হলদে কাগজ বাজার থেকে আনিয়ে নিলেন। হলদে কাগজে তিনি বড় বড় করে লিখলেন—দীর্ঘায়ু হও; তারপর প্রতিটা হরফ ভিন্ন করে কেটে দেয়ালের এখানে ওখানে এঁটে দিলেন। এবার ন'কর্তা আরো দুজন অতিথিকে ডেকে এক হাত মেচিয়াঙ খেলায় প্রস্তাব করলেন। কেঙ রাজি হলেন না। তিনি জানেন বুড়ো জুয়া খেলায় ওস্তাদ।

ন'কর্তা রেগে গেলেন, তিনি এবার কয়েকজন রিক্সাওয়ালাকে ডেকে বললেন, এস না এক হাত খেলা যাক। কি ধক আছে?

রিক্সাওয়ালা

সবারই খেলবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু ন'কর্তার সঙ্গে নয়। কে না জানে, ন'কর্তা একসময়ে জুয়োর আড্ডাধারী ছিল?

তোরা একেবারে অপদার্থ। তোরা যে এখনো বেঁচে আছিস, এইতো আশ্চর্য। অথচ তোদের মতো বয়েসে, পকেটে পয়সা না থাকলেও ধার করে খেলতে বসে গেছি। আগে হার তবে তো হারবার কথা বলবি, তা না আগেই হারবার কথা ভাবছিস? আয়, বসে যা!

পয়সা দিয়ে খেলা চলবে? কে একজন জিজ্ঞেস করল।

রেখে দে, ট্যাঁকে গুঁজে রেখে দে কাজ দেবে। লিউ তোদের মতো লোকদের সঙ্গে খেলতেও ঘেন্নাবোধ করে। বুড়ো চায়ে চুমুক দিতে দিতে টাকে হাত বুলাল। শোন্, তোরা সবাইকে বলে দে, কাল আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন আসছে, কাল যেন বেলা চারটের ভিতরে সবাই ফিরে আসে।

অতিথ লোকজনে বাড়ি গিস্‌গিস্ করবে, ওর ভিতরে রিক্সা নামানো বা শেডে রাখতে গেলে গোলমাল হবেই। কালকের রিক্সাভাড়া মাপ করে দিলাম। ভোর থেকে বেলা চারটে পর্যন্ত যত খুশি টানো, একটা পয়সা দিতে হবে না। শুধু আমার হয়ে তোমরা সবাই দেবতার কাছে হাতজোড় করে বলবে, আরো যেন ধন দৌলত বাড়ে—এইটুকু আমি চাই, আর কিছু না। আশা করি, এইটুকু তোমরা করবে।

কাল বাদে পরশু আমার জন্মদিন। সেদিন কেউ রিক্সা নিয়ে বেরুতে পারবে না। বেলা সাড়ে আটটার সময় আমি সবাইকে ভোজ দেব। ছ'রকম খাবার পাকানো হচ্ছে, মদও থাকবে বইকি! কিন্তু তোমরা যে, যেমন তেমন পোশাকে এসে পাত পেতে বসে যাবে—তা হবে না। তোমাদের ধোপদুরস্ত পোশাক পরে ফিটফাট হয়ে আসবে। যে ময়লা জামা কাপড় পরে আসবে তাকে লাথি মেরে দূর করে দেব। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে তবে আমার আত্মীয় স্বজনরা খেতে বসবে। ওদের জন্যে আলাদা খাবার তৈরী হচ্ছে। মাংসই হবে তিনরকম, ছ'রকম শাকসব্জি, তাছাড়া মেঠাইমণ্ডা তো আছেই। আমি আগেই বলে দিচ্ছি, ওদের খাওয়ার সময় জুল জুল করে তাকিয়ে থেক না, খাবারের উপর দৃষ্টি দিও না।

যারা আমাকে ভালোবাসো তারা জন্মদিনের উপহার হিসেবে দশটা করে তামার পয়সা দিয়ে যেও। তোমরা মনে করতে পারো, দশটা তামার পয়সা কি আর ন'র্তাকে হাতে ধরে দেওয়া যায়। কেন দেওয়া যাবে না? ভালোবেসে যা দেবে তাইই আমি নেব। যারা দশটা পয়সা দিতে পারবে না, তারা যদি তিনবার আমার সুমুখে মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে, তাহলেও চলবে। শুধু সন্ধ্যের দিকে কারো যদি ইচ্ছে হয়, এসে খেয়ে যেতে পার। ভোজের পর বাকি যা থাকবে, সে তো

তোমাদেরই। কিন্তু সন্ধ্যের আগে ফিরে এসে আমার অতিথদের জ্বালিও না, কি শুনছ তো?

কাল কেউ কেউ রাতে রিক্সা নিয়ে বেরুবে, তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা করবেন ন'কর্তা? একজন আধাবয়সী লোক জিজ্ঞেস করল।

রাতে যারা বেরুবে, তাদের এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। পরন্তু এখানে ব্যাপার, হাঙ্গামা পোয়াতে পারব না বাপু, তাই আগেভাগে সাবধান করে দিচ্ছি।

সবাই চুপ করে রইল। কি বলবে তারা? তারা যেন এক উঁচু মাচায় চড়ে বসেছে, সিঁড়ি নেই যে তর্‌তর্ করে নেমে যাবে। সবাই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—যেন একদল মমীকে এনে সাজিয়ে রেখেছে। ন'কর্তার কথায় সবাই রেগে উঠেছে, সবাই বুঝতে পেরেছে তাদের অবস্থার অসমতা। কিন্তু সুবিধেও তারা পাচ্ছে: একদিনের রিক্সাভাড়া তাদের মাপ করে দিয়েছে, তার উপরে বিনে পয়সায় ভোজও তারা খাবে। অবিশ্যি নামেই বিনে পয়সা, ন'কর্তা ঠিক উপহার হিসেবে ভোজের দাম আদায় করে নেবে। কথার ছিরি দেখ না ন'কর্তার? ওরা যেন মানুষই নয়। জন্মদিনে তিনি ওদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ঘেঁসতে দিতেও রাজি নন। ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়েই লুকোতে হবে।

তাছাড়া নতুন বছর আসছে, সোয়ারিও খুব মিলছে। এখন একদিন রিক্সা নিয়ে না বেরুলে বেশ ক্ষতি। অথচ ন'কর্তা হুকুম দিলেন: তার জন্মদিনে কেউ রিক্সা নিয়ে বেরুতে পারবে না। কি অন্যায় ন'কর্তার? মনে মনে রিক্সাওয়ালারা ক্ষেপে উঠল, ন'কর্তাকে অকথ্য গালাগাল দিল, কিন্তু মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে পারল না।

খুশিও ওদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাঘিনী এসে তাকে জামার হাতা ধরে টানতেই সে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সবাই নিঃশব্দে চোখ তুলে খুশির দিকে তাকাল। চোখ থেকে তাদের আগুন ঠিকরে পড়ছে। ন'কর্তার প্রতি পুঞ্জিভূত বিদ্বেষ যেন বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পেয়েছে। এই দুদিন ধরে তারা লক্ষ্য করেছে, খুশি জুজুর মতো ন'কর্তার ফাই-ফরমায়েস খাটছে, এক মুহূর্তের জন্যেও আপত্তি করেনি। কিন্তু কেন? চাকর খেতাব পাবার জন্যেই কি খুশি এতো খাটছে? খুশির উপর তারা রেগে উঠল।

খুশি অত খতিয়ে দেখেনি। সে লিউ পরিবারের এই এলাহী ব্যাপারে ভূতের মতো খাটছে শুধু তার নিজেরই জন্যে। মন তার দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে উঠেছে, খাটলে দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—এই ভেবেই সে খাটছে। সন্ধ্যায় সে যখন ফিরোয়, তখনো কারো সঙ্গে কথা বলে না। বলবে কি, বলার মতো

কিই বা তার আছে। অন্য রিক্সাওয়ালারা ভাবে, ন'কর্তার ফাইফরমায়েস খেটে খেটে খুশির দেমাক হয়েছে। কিন্তু তারা তার মনের খবর তো আর রাখে না।

বাঘিনীর খুশির সঙ্গে এতো ঢলাঢলিও তাদের ভালো লাগেনি, বরং মন যেন কেমন তেতো হয়ে গেছে। ন'কর্তা তো হুকুম জারী করেই বসলেন তারা তাদের খুশিমতো আস্তানায় আসতে যেতে পারবে না—আর খুশিটার কি মজা'! রিক্সা নিয়েও বেরুতে হবে না, তাছাড়া দুদিন খাবে-দাবেও ভালো। কিন্তু ওর বেলায় বা এ ব্যবস্থা হোলো কেন? ও তো ওদেরই একজন। দেখ না, বাঘিনীটা এসে ডেকে' নিয়ে গেল! দরজা দিয়ে বাইরে যাবার পথে তারা দেখল কেরোসিনের আলোটার নিচে দাঁড়িয়ে খুশি আর বাঘিনী কথা কইছে। তারা চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখল তারপর সবাই বেরিয়ে এল।

চৌদ্দ

লিউ পরিবারের উৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই সম্পন্ন হোলো। ন'কর্তা খুব খুশি হলেন। কত লোক এসে তার পায়ে মাথা ঠুকল। তাকে অভিনন্দন জানাল, তাছাড়া বন্ধু-বান্ধব দিল নানা উপহার। হবার কথাও বটে। যেসব আত্মীয়-স্বজন তাকে এতদিন ভালো চোখে দেখেনি তারাও এসে উপহার দিয়ে গেল, জানিয়ে গেল অভিনন্দন। ন'কর্তা গর্বে ফুলে উঠলেন। হাঁ, তাহলে তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ন'কর্তা একেবারে বদলে গেছেন! ফার দেওয়া নতুন কামিজ পরে তাকে মানিয়েও ছিল বেশ। সবাই তাকিয়ে দেখেছে, তারিপও করেছে মনে মনে। অথচ একদিন তার চাইতে ঢের ঢের ভালো অবস্থা ছিল এদের—আর আজ? ভাগ্যের চাকা এই বিশ ত্রিশ বছর ধরে অনবরত ঘুরেছে—জীবনের পঙ্কিল স্রোত বয়ে গেছে—এরা এখন এসে ঠেকেছে চাকার একেবারে নিচে। কারো কারো একবেলাও ভালো করে খাওয়া জোটে না। তাদের দিকে ন'কর্তা তাকিয়ে দেখলেন, তার চোখ পড়ল মেরাপ আর দীর্ঘায়ুর দেবতার বেদীর দিকে:—ধূপ ধুনো জ্বলছে, টেবিলে টেবিলে খাবার, মদের পেয়ালাগুলো চক চক করছে—ওদিকে দেয়ালে যুদ্ধের ছবি—লোকজনের হল্লা-হুল্লোড়। ন'কর্তার মনে হোলো তিনি এদের চাইতে অনেক বেশি উপরে উঠে গেছেন, বদলে গেছেন। মেচিয়াঙ খেলার ঝকঝকে সাদা টেবিলগুলো এনে যখন পাতা হোলো, তখনও তার এই কথাই বার বার মনে পড়ল।

এই আমোদ আহ্লাদের ভিতরে আর একটা জিনিস তিনি বেশি করে অনুভব করলেন—সে তার নিঃসঙ্গতা। অবাক লাগল, কি করে এতদিন তিনি এই নিঃসঙ্গতা সহ্য করলেন! এতদিন তিনি একাই কাটিয়েছেন, তার বন্ধুবান্ধব বলতে কেউ নেই। যাদের তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তারা অধিকাংশই পাড়ার যে সব দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনেন, তারই ম্যানেজার বা কর্মচারীর দল। দূরসম্পর্কিত আত্মীয়ও কিছু এসেছে, তাদের সঙ্গে রক্তের একটা সম্বন্ধ আছে ঐ পর্যন্ত; তাছাড়া আছে পুরনো দিনের সাঙাৎরা। বাউণ্ডুলে, লক্ষ্মীছাড়ার দল—এখন উড়ে উড়েই বেড়াচ্ছে—সংসারে ওদের দামই বা কি! কিন্তু এরই মধ্যে যে দুএকজন মেয়ে আসবে একথা ন'কর্তা ভাবতেই পারেনি। মেয়েরা এলে বাঘিনী তাদের অভ্যর্থনা করল, তাদের যত্ন করা, খাওয়াদাওয়ার তদারক কোনো কিছুতেই ত্রুটি

না, কিন্তু ন'কর্তার মন কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। তার বাড়িতে মেয়ে বলতে আছে বাঘিনী। তাকে মেয়ে বলে তো মনেই হয় না। যা দিন দিন মোষের মতো বেড়ে উঠছে। বাঘিনী যদি ছেলে হোতো, এতদিনে নিজের সংসার পাতিয়ে বসত, একপাল ছেলেপুলেও হোতো তার। ন'কর্তার বৌ না থাকলেও নাতি-নাতনী নিয়ে দিন কেটে যেত, এতটা ফাঁকা ঠেকত না। সত্যি; কিছুই তো তার অভাব ছিল না। একটা ছেলে হলেই তার সব অভাব মিটত। এই যে এত কষ্ট করে তিনি সব গুছিয়ে রেখে যাচ্ছেন, কার জন্যে? নিজে চোখ বুজলে কে এসব দেখবে? থাকবার মধ্যে তো এক মেয়ে। না, সবই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভোর বেলা থেকে তার মেজাজটা বেশ খুশিই ছিল। কত লোক এল, তার পায়ে মাথা ঠুকল, দীর্ঘায়ু কামনা করল; গর্বই হয়েছিল। হাঁ, অবশেষে ভাগ্যের দেবতা সমুদ্রের কচ্ছপের কাছ থেকে তিনি তার সম্মান আদায় করে নিয়েছেন—এতদিনে সাধনা তার যেন সার্থকই হয়েছে। তিনি যেন রূপকথার বীর—সবাই তার কাছে নিয়ে এসেছে পাদ্য অর্ঘ্য, সবাই তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ছে।

কিন্তু বিকেল হতেই গর্বের যে হাওয়াটুকু তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ ফুস করে বেরিয়ে গেল। ন'কর্তা কেমন চুপসে গেলেন। নিমন্ত্রিত মেয়েরা এল, তাদের সঙ্গে ফুটফুটে ছেলেমেয়ের দল। সত্যিই ওদের দেখে আনন্দও হয়, আবার হিংসে করতেও ইচ্ছে করে। ন'কর্তা তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর এক সমস্যা দেখা দিল। এদের কোলে পিঠে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হোলো, কিন্তু লোকে কি মনে করবে এই ভয়ে তিনি তা পারলেন না। কিন্তু নিরুদ্ধ ইচ্ছা অন্যদিক দিয়ে তার শোধ তুলল। তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। কিন্তু মেজাজ দেখাবেন কোথায়? নিমন্ত্রণ করে যাদের এনেছেন, তাদের সুমুখে কি আর মেজাজ দেখানো চলে! ন'কর্তা শুধু কামনা করতে লাগলেন, দিনটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক, নইলে এ শাস্তি আর সহ্য হয় না।

খুশিরও এদিকে কাহিল অবস্থা।

রিক্সাওয়ালাদের ভোজ শুরু হোলো আটটার কিছু পরে। একদিনের ভাড়া রেয়াত পেয়েছে তার উপরে বিনে পয়সার ভোজ—আর চাই কি। কিন্তু কেউ খুশি মনে ভোজে আসেনি। তার কারণ, বুড়োর জন্যে সবাইকেই উপহার আনতে হয়েছে। তারা মজুর, খেটে খায়, রিক্সার আড্ডার মালিক ন'কর্তার বকুনি মুখ বুজে সয়ে যায়। কিন্তু আজ ন'কর্তার নিমন্ত্রিত অতিথি হয়েও রেহাই নেই। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা ন'কর্তাকে উপহার দিতে হবে। খাওয়ার পরে আস্তানা ছেড়ে চলে যেতে হবে—কি জানি মানী অতিথিরা

রিক্সাওয়ালা

ওদের দেখলে বিরক্ত হতে পারেন। এদিকে আবার রিক্সা নিয়ে বেরুনোও নিষেধ। নতুন বছর আসছে, এই সময়ই তো তাদের মরশুম—এই সময়ে একদিনে যা রোজগার হবে, অন্য সময়ে এক হপ্তায় তা হবে কিনা সন্দেহ।

খুশির কথা অবশ্য আলাদা। খেয়ে দেয়ে চলে যাওয়ার দলে সে পড়ে না। তবু ভাই-বেরাদারদের সঙ্গেই সে খেতে বসবে ঠিক করল। তাড়াতাড়ি খাওয়াটা চুকিয়ে নিলে কাজ করবার যেমন সুবিধে হবে, তেমনি সেও যে ওদেরই একজন একথাও বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সে ভিড়ের ভিতরে বসতে গেল, এমন সময় কে একজন বলে উঠল, তুমি তো মানী লোক! আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসবে কি করে?

খুশি বোকার মতো হাসল, কথাটার মানে সে বুঝতে পারেনি। ক'দিন কারো সঙ্গে কথা না বলে বলে তার মন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

খাবার এসে গেল। মাংস বা শাক-সবজির রকমারি ব্যাঞ্জন তারা পেল না, কিন্তু মদ তারা আশা মিটিয়েই খেল। ন'কর্তা এখানে কৃপণ হতে পারেননি। দীর্ঘায়ু কামনা করতে হলে মদ চাই বৈকি। তাই আগেই তিনি বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন!

খাবার না থাকুক, মদ তো আছে। সবাই মদ খেতে শুরু করল। কেউ বা পেয়ালার পর পেয়ালা উজাড় করে দিয়ে গুম হয়ে গেল, কেউ বা হল্লা শুরু করল। বুড়ো লিউ তাদের থামাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। খুশি মদ খায় না, কিন্তু দলে পড়ে তাকেও দুতিন পেয়ালা গিলতে হোলো। কি জানি, না খেলে ওরা হয়তো আবার কি ভাববে। খানিকক্ষণ চলল মদ খাওয়া; চোখ এবার লাল হয়ে এল, জিভও বুঝি আর শাসন মানছে না।

কে একজন বলে উঠল, এই বেটা খুশি উট, বেড়ে চাকরী জোগাড় করেছিস মাইরি! দুবেলা পেট পুরে খাওয়া আর মনিব আর তার মেয়ের ফাইফরমায়েস খাটা! আমি বলে দিলাম, তোকে আর রিক্সা টানতে হবে না।

খুশি চুপ করে রইল। মানবমিলনে ফিরে আসার পর থেকে সে যেন কেমন হয়ে গেছে! কেউ কিছু বললে সে জবাব দেয় না, এমন কি রাগও চেপে রাখে। এখন একমাত্র দেবতা তার ভরসা। তারা যা করাবেন সে তাই করবে।

আবার কে একজন ফোড়ন দিল, খুশির রাস্তাই আলাদা ভাই। আমরা গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার করি, কিন্তু খুশি গতর খাটায় অন্য ব্যাপারে। কি বরাত মাইরি! টাকাকে টাকাও এল আবার সুখও হোলো। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। খুশি বুঝতে পারল, সবাই তাকে ঠাট্টা করছে কিন্তু যে দুঃখ

সে সয়েছে তার কাছে এই ঠাট্টার দাম কি। কয়েকটা হালকা কথা বই তো নয় খুশি মুখ বুজে রইল, উত্তর দিল না।

ওরা এবার খুশিকে ছেঁকে ধরল। আশেপাশের টেবিলের লোকরাও এসে যোগ দিল। কে একজন ডেকে বলল, খুশি কাল থেকে তুমিই তো আমাদের মুনিব। তখন কিন্তু ভাই-বেরাদারদের ভুলে যেও না।

খুশি তবু চুপ। অন্য টেবিল থেকে আর একজন বলল, কাল না হয় মনিবই হবে, তাই বলে একটা মুখের কথা খসাতে নেই?

খুশির মুখ লাল হয়ে উঠল, সে আস্তে আস্তে বলল, কি যা তা বকছ তোমরা। আমি মনিব হব কি করে?

কেন হবে না শুনি! ভেল্কি দেখনি! ফুস মন্তরে রিক্সাওয়ালা আর রিক্সাওয়ালা রইল না। খুশি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। ভেল্কি আবার কিসের? তবে এইটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারল, বাঘিনীর সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে তারা ঠাট্টা করছে। মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেল, মনে ভিড় করে এল জীবনের দুঃখ-দুর্দশার স্মৃতি। তারা যেন বুকে চেপে বসেছে; সে আর সহ্য করতে পারছে না। বন্যার মতো বুকের ভিতরে তোলপাড় তুলেছে, ছাপিয়ে উঠেছে, হয়তো যে কোনো মুহূর্তেই প্রবল বন্যার বেগে উৎসারিত হয়ে পড়বে।

ঠিক এমনি সময়ে একজন রিক্সাওয়ালা খুশিকে ডেকে বলল, খুশি ভাই, কথায় আছে না বোবা লোকরাই ভালো ভালো মাংস খায়। তোমার ভাগ্যে মাংস জুটল, আমরা তো শুধু কামড়াকামড়ি করলুম, ভাগ পেলুম না। কি ঠিক বলিনি?

খুশি এক লাফে উঠে দাঁড়াল। মুখ তার উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে। সে ঘুষি পাকিয়ে চিৎকার করে বলল, আয়, বাইরে এসে যা বলেছিস আর একবার বল! আয়, চলে আয় বাইরে! সবাই ঘাবড়ে গেল। কারো মুখে রা নেই। সময় কাটাবার জন্যে ঠাট্টা-তামাসা করছিল মাত্র, মারামারি করবার উৎসাহ তাদের নেই।

সবাই চুপ চাপ। একদল পাখী বনে কিচিরমিচির করছিল, হঠাৎ ঈগল এসে দেখা দিল, স্তব্ধ হয়ে গেল পাখীদের কলরব। খুশি একা দাঁড়িয়ে আছে, সকলের চেয়ে ঢ্যাঙা সকলের চেয়ে জোয়ান। বুকে তার ধুঁইয়ে উঠছে ক্রোধের আগুন, আত্মবিশ্বাসে সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সবাই যদি একসঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলেও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে তারা পারবে না। সে আবার বলে উঠল, কথা তো নয় যেন হাতুড়ী দিয়ে পেরেক ঠুকছে: আয়, কে আসবি আয়! কার কতো মুরদ আছে দেখি!

ব্যাপারটা সুবিধে নয় সবাই বুঝতে পারল। তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: হয়েছে, হয়েছে এবার থাম, আমরা তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম।

ন'কর্তাও গোলমাল শুনে ছুটে এলেন। তিনি এসেই বললেন, খুশি, তুমি বসে পড়! তারপর দলের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিরীহ গোবেচারী পেয়ে খুব ঠাট্টা করছিলে বুঝি। দেখো, আবার যদি গোলমাল শুনতে পাই সব লাথি মেরে দূর করে দেব কিন্তু। চটপট মুখ বুজে খেয়ে নাও! খুশি টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। সবাই বুড়োর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বোখ্না থেকে ভাত তুলে নিল। চলল খাওয়া-দাওয়া। বুড়ো চলে যেতেই আবার হাসি ঠাট্টার স্রোত বয়ে গেল।

খুশি ফটকের সুমুখে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আবার কেউ যদি বেরবার সময় ঠাট্টা করে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর যা হয় হোক, সে গ্রাহ্য করে না। বেজন্মা বেটারা!

কিন্তু সবাই কেউ একা বেরুল না, দুজন, তিনজন করে তারা বেরিয়ে গেল, খুশির দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। খুশির লড়াই করাও হোলো না। তবু তার মনে হোলো, খানিকটা বুক হাল্‌কা হয়েছে, রাগের ঝাঁঝ সে কিছুটা বার করে দিতে পেরেছে। কিন্তু তবুও কি ছাই মনে শান্তি আছে? কতগুলো লোককে চটানো কি ভালো হোলো? তার বন্ধু বলতে কেউ নেই। তাই শত দুঃখ দুর্দশায় পড়লেও মুখ ফুটে কারো কাছে সে কিছু বলতে পারেনি। আজ আবার এতগুলো লোককে সে চটিয়ে দিল। কি হবে কে জানে!

খুশির মনে এল অনুতাপ। খুব কমই সে খেয়েছিল, কিন্তু পাকস্থলীতে যেন আটকে আছে খাবার, পেটে মোচড় দিচ্ছে। ফটক থেকে সে ভিতরে এল। দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। এই তো ওর ভাই-বেরাদাররা দিনে দুবার করে ঝগড়া করে, মারামারি করে, কিন্তু আবার হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে ওঠে, সব ভুলে যায়। মুখ গোমরা করে ভেবে লাভ কি? তাতে কিছু সুবিধে তো আর হবে না!

খুশি এমনি ধারা ভেবে ভেবে ঠিক করল, সে নতুন পথে চলবে। একেবারে নতুন মানুষ সে হবে। যাকে দেখবে তার সঙ্গেই পাতাবে মিতালি। যার কাছ যতটুকু সুবিধে পাওয়া যায় আদায় করে নেবে। পরের ঘাড় ভেঙে চা সিগারেট খাবে, টাকা ধার নিয়ে শোধ দেবে না, পুলিশের চোখে ধুলো দেবে। ধরা পড়লে দুতিন দিন হাজত বাস করে আসবে।

হাঁ, তাই সে করবে। সেই তো রিক্সাওয়ালার সত্যিকারের জীবন! আর তাতেই তারা সুখী। সেই বা অন্য পথে গিয়ে অসুখী হবে কেন? নিরীহ

গোবেচারী হয়ে থাকা, আইন বাঁচিয়ে চলা, উঁচু নজর—ওসবের কোনো দামই নেই। তার চেয়ে এই অপদার্থদের দলে ভিড়ে পড়া ঢের ভালো। ওদের মধ্যে ভালোমানষি নেই, আছে কাউকে গ্রাহ্য না করার নেশা, আছে বীরত্ব। খুশি ঠিক করল ওদের দলেই ভিড়ে পড়বে। স্বর্গে মর্ত্যে কাউকে সে ডরাবে না, কারো কাছে সে মাথা হেঁট করবে না। সে হবে খাঁটি মানুষ, খাঁটি গুণ্ডা!

তার কেমন আপশোষ হোলো। মারামারি বাঁধলে সে এক হাত দেখিয়ে দিতে পারত, হুঁ সেও কম যায় না। যাক ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। সে যখন কারো কাছে মাথা নোয়াবে না ঠিক করেছে তখন মারামারি তো আজ বাদে কাল বাঁধবেই।

ন'কর্তার চোখে ধুলো দেওয়া খুবই শক্ত। তিনি সব দেখে শুনে ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, বাঘিনী এই কদিন কথায় উঠেছে বসছে। খুশি ফিরে এসেছে বলেই কি ও এত বাধ্য হয়েছে? খুশির দিকেই সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে মেয়েটা? ব্যাপার খানা কি? বুড়ো মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে বেজায় চটে গেলেন। তার ছেলে নেই, হুট করে এক পাল ছেলের জন্ম দেওয়াও সম্ভব নয়। তারপর মেয়েটা যদি কারো সঙ্গে বেরিয়ে যায়, তাহলেই তো হয়েছে আর কি! এতদিন ধরে খেটেখুটে যা কিছু করলেন, সব পণ্ড হয়ে যাবে।

খুশি ছেলেটা বেশ ভালো, কিন্তু ছেলে বা জামাই হিসেবে একেবারে অচল। বেটা রিক্সাওয়ালা! গায়ে বোটকা গন্ধ ছাড়ছে! ন'কর্তা সারা জীবন ধরে যুদ্ধ করেছেন। কতোবার জেলখানায় আটক রয়েছেন—তবে না তার এত সম্পত্তি ধনদৌলতের মালিক তিনি হয়েছেন। আর সেই ধনদৌলতে ভাগ বসাবে এক ছোঁড়া গেঁয়ো ভূত! না, না, অতো সস্তা নয়, অতো সস্তা নয়! যদি সেই মতলব নিয়েই বেটা এসে থাকে, তাহলে টের ও পেয়ে যাবেখন! এ যে-সে লোক নয়, ন'কর্তা লিউ!

বেলা তিনটে-চারটের সময় বুড়ো লিউকে জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে আরো কয়েকজন নিমন্ত্রিত অতিথি এল, কিন্তু বুড়োর তখন মেজাজই খারাপ হয়ে গেছে। তার চেহারার স্তুতি, বাড় বাড়ন্তের কামনাই তারা করল। এমনি ফাঁকা বুলি শুনে তিনি উত্যক্ত হয়ে উঠলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল এবার, মেরাপের এখানে ওখানে জ্বলে উঠল. কাগজের লণ্ঠন। অতিথিরা একে একে বিদায় নিল। পাড়াপড়শী আর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মেচিয়াঙ খেলতে বসে গেল। বিরাট মণ্ডপ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে, টেবিলের ঢাকনাগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে, গ্যাসের বাতির আবছা নীল আলো এসে পড়ে কেমন এক

প্রেতপুরীর আবহাওয়া জাগিয়ে তুলেছে। ন'কর্তা তাকিয়ে রইলেন। তার মনে হালো দীর্ঘায়ুর এই উৎসব আর শোকের অনুষ্ঠানে কোনো তফাৎ নেই। শুধু ঐ রেকগুলো বদলে দিতে হবে, আর নানা রঙের কাপড় খুলে ফেলে সাদা কাপড়ে মুড়ে দিতে হবে চারদিক। ব্যস, তাহলেই দীর্ঘায়ু উৎসবের আসর হবে শোকবাসর। তার ছেলে বা নাতি নেই যে শোকের পোশাক পরে শবাধারের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে, তখনো এমন কয়েকজন পড়শী বা বহুদিনের বন্ধু বসে বসে মেচিয়াঙ খেলবে আর সারারাত শবাধার পাহারা দেবে। ন'কর্তা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এদের এখুনি তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? তার ফুসফুসে এখনো যতটুকু জীবনীশক্তি আছে, ওদের ঘাবড়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দুএক পা করে ন'কর্তা এগিয়ে গেলেন, তারপরে ফিরে এলেন। না, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এমন অভদ্রতা তিনি করতে পারবেন না।

তার রাগ এবার অন্যদিকে মোড় ঘুরল। মেয়ের দিকে কটমট করে তিনি তাকালেন। দেখলেও গা জ্বলে যায়! খুশিটাও মণ্ডপের ভিতরে বসে আছে। হাদা ছোকরা, মুখখানা ঠিক কুকুরের মতো দেখতে। গ্যাসের বাতির নীল আলো কাটা দাগটার উপর এসে কিম্ভূত দেখাচ্ছে। ন'কর্তা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মানিকজোড়ের দিকে তাকালেও পিত্তি জ্বলে যায়!

এমনি বাঘিনীর পোশাকের দিকে নজর নেই, আদব-কায়দারও ধার ধারে না—সে যেন বুনোদের গান, ছন্দ নেই, তাল নেই। আজ কিন্তু সে ভোল বদলে ফেলেছে। বাহারে পোশাক পরে অতিথিদের কেমন অভ্যর্থনা করছে? সবাই তার প্রশংসা করুক হয়তো এই সে চায়—তাছাড়া খুশিকেও দেখিয়ে দিতে চায় গৃহিনীপনায় সে কেমন ওস্তাদ। প্রথম প্রথম আদর অভ্যর্থনা তার ভালোই লাগছিল, কিন্তু পঙ্গপালের মতো পিল পিল করে অতিথি আসছে তো আসছেই, কাঁহাতক সামলানো যায়! সে বিরক্ত হয়ে উঠল। এমন মাপা কথা আর মাপা হাসি তার পোষাবে কেন? তার মনে হোলো, চিৎকার করে কাউকে বাপান্ত না করতে পারলে আর কিছুক্ষণ পরেই তার দম বন্ধ হয়ে যাবে! অস্থির হয়ে উঠল বাঘিনী। কিন্তু তখনো তার আঁকা ভ্রূ একটু কুঁচকে যায়নি, রুজমাখা মুখখানা মুখোশের মতো তার স্বরূপ ঢেকে রেখেছে।

সাতটার পরে ন'কর্তা ঝিমুতে শুরু করলেন। তা বুড়ো বয়েসে অত ধকল পোষাবে কেন? কিন্তু ন'কর্তা তবু শুতে গেলেন না, মেচিয়াঙ টেবিলে বসে গেলেন। কয়েক বাজি খেলা হোলো, ন'কর্তা এবার প্রস্তাব করলেন, 'ন' তাসের খেলা হোক। কিন্তু কেউই অন্য খেলা খেলতে রাজি হোলো না। কি আর করেন, তিনি খেলা দেখতেই বসে গেলেন! কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা যায়? চোখ বুজে আসছে, হাই উঠছে। তিনি পেয়ালার পর পেয়ালা মদ খেয়ে কোনোরকমে চোখ

খুলে রাখতে চেষ্টা করলেন। মদের একটু নেশা হতেই তার মনে হোলো, তিনি আজ বড় ঠকে গেছেন। মেরাপওয়ালা থেকে রাঁধুনি পর্যন্ত সবাই তাকে ঠকিয়েছে। এমন কি নিজের গাঁটের কড়ি ভেঙে ভোজ দিলেন, আর তার নিজের পেট ভালো করে ভরল না! এই সব কথা তিনি অনর্গল বকে গেলেন। সবাই জোচ্চোর, সবাই তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সরে পড়েছে।

এমন সময় শ্রীযুক্ত ফেঙ হিসেবপত্র নিয়ে এসে মণ্ডপে ঢুকলেন। কারা কি উপহার দিয়েছে তারই হিসেব। দীর্ঘায়ু কামনার স্তোত্র লেখা পঁচিশখানা পট, তিনটে বড় বড় দীর্ঘায়ু কেক, এক ভাঁড় মদ, কয়েকখানা মোমবাতি আর বিশ ডলার।—এই সারা দিনে উপহার! অথচ অতিথি তো পালে পালে পঙ্গপালের মতো এসেছে।

ন'কর্তা তো ক্ষেপে গেলেন। এই কটা উপহার পাবেন জানলে কে অতো ঘটা করে নেমন্তন্নের জোগাড় করত। দুএকটা ভাজাভুজি, কি শাক সবজি হলেই তো চলতো। আকণ্ঠ গিলে কিনা বেটারা এই কটা সামান্য উপহার দিয়ে গেল! বুড়োকে বোকা পেয়ে খুব ঠকিয়েছে তো! এর পর তিনি আর এমন বোকামি করবেন না। টাকা তো বানে ভেসে আসে না যে ওদের পেট ভরাবেন। এমন কি বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনরাও এসে বিনে পয়সার ভোজ মেরে তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। উনসত্তর বছর ধরে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে একি করলেন তিনি। বেজন্মা কচ্ছপের ডিমগুলো তার চোখের উপর দিয়ে এমন কাণ্ডটা করে চলে গেল। বুড়ো ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। তার মনে হোলো দিনের বেলা অতো খুশি মেজাজ দেখিয়েই তিনি ভুল করেছেন। অতো আদর-আপ্যায়ন না করলেও চলতো! তাহলে বোধ হয় এমনি করে নিমন্ত্রিতরা ফাঁকি দিয়ে যেতে পারত না। ছিঃ ছিঃ, কি বোকামিই হয়েছে। ন'কর্তা জিভকে আর বাগ মানাতে পারলেন না। অকথ্য গালাগাল করতে লাগলেন।

অতিথিরা সবাই এখনও বিদায় নেয়নি, তারা কি ভাববে—বাঘিনী বাপকে থামাতে ছুটে এল। কিন্তু অতিথিদের খেয়ালই নেই, তারা মেচিয়াও খেলায় মেতে আছে। শুনেও শুনছে না গালাগাল। বাঘিনী সব দেখে শুনে চুপ করে গেল! হয়তো থামাতে গেলে বুড়ো ক্ষেপে গিয়ে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। তার চেয়ে করুক না বক্‌বক, সবাই চুপ করে থাকলে, কতক্ষণ, নিজে গজগজ করে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বেচারী বাঘিনী! সে তো আর জানে না যে বুড়ো থামবার পাত্র নন। আসল কথায় পৌঁছবার জন্যেই এতক্ষণ ধরে ধানাই-পানাই বকছেন। এবার

বাঘিনীকে নিয়ে পড়েছেন। বাঘিনী ঠিক করল, গালাগাল সে হজম করে যাকে না। বুড়োর জন্মদিনে সেই কি কম খেটেছে নাকি। আবার তাকেই উলটে গালাগাল! না, না, সে হজম করবে না। উনসত্তর-সত্তর বয়েস হোলো, বুড়োর ভিমরতি দেখ না! সে আর চুপ করে থাকতে পারল না, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমিই তো জন্মদিনের উৎসব জাঁকিয়ে করলে? এখন আবার আমাকে বলতে এসেছে দেখ না।

বাধা পেয়ে বুড়ো আরো উগ্র হয়ে উঠলেন। তোকে বলব না তো কাকে বলব? তুই তো ভেবেছিস বুড়ো চোখের মাথা খেয়ে বসেছে, কিছুই দেখতে পাবে না। না—আমি সব দেখেছি।

কি দেখেছ বল না? সারাদিন খেটে খেটে হায়রাণ হলুম, এখন কিনা আমার উপরই তমবি শুরু হয়েছে। বল না, কি দেখেছ, বাঘিনী রাগে গর্জে উঠল।

—আহা, কি দেখেছ বল না! নেকি ছুঁড়ি। চোখ দুটো জুল জুল করে কোনদিকে তাকাচ্ছিস জানিস না?—জুল জুল করে কোনদিকে তাকানু গো! কি দেখেছ বল না?

কি দেখিনি তাই বল না। ঐ যে—ন'কর্তা লিউ মণ্ডপের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন। খুশি পিছন ফিরে ঝাঁট দিচ্ছে।

বাঘিনী কেঁপে উঠল। বুড়োর চোখ এতো সজাগ সে কল্পনাও করতে পারেনি। দেখেছি তো—তা কি বলতে চাও?

অতো জাঁক দেখাসনে। এখুনি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব। ন্যাকা ছুঁড়ি, কিছুই যেন জানে না! বুড়ো এবার উঠে দাঁড়ালেন। ওকে যদি চাসতো আমাকে পাবি নে, আমাকে পেতে হলে ওর কাছে ঘেঁসতে পাবিনে—বুঝলি তো? আমার বাপু স্পষ্ট কথা। তোর বাপ আমি, আমার ব্যাপারে কাউকে নাক ঢোকাতে দিতে আমি রাজী নই।

বাঘিনী হতভম্ব হয়ে গেল। তার এমন ফন্দি মাঝপথে আসতে না আসতেই বেটা বুড়ো ভেস্তে দিল! এখন সে কি করবে? লাল হয়ে উঠল তার মুখ, পাউডারের সাদা আস্তর ভেদ করে বেগুনী রং ফুটে উঠল: কারবাইডের নীল আলোতে বাঘিনীকে দেখে পোড়া পোড়া করে ভাজা শুওরের মেটে বলেই মনে হোলো। ঠিক তেমনি নানারঙের বিবর্ণ সমারোহ, ঠিক তেমনি বিশ্রী। বাঘিনী খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সে জ্বলে উঠল। মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেছে, কোনো ফন্দিই সে খুঁজে পেল না। কিন্তু খেদান জন্তুর মতো গর্তে ফিরে যেতেও সে পারল না। এই গোলমালের ভিতরেই তাকে একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। কোনোদিন কোনো পুরুষের কাছে সে মাথা নোয়ায়নি,

আজও তা সে করবে না। কথাটা যখন বুড়ো খুঁচিয়ে বার করেছে, তখন হেস্তনেস্ত একটা হয়েই যাক না।

বেশ, বেশ! বাঘিনী বলল। আজই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাক। ধরলাম, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ কিন্তু এখন কি করতে চাও বল? শুনি, শুনে কান জুড়াই। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ তুমিই বার করেছ—এর পরে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিও না।

যারা মেচিয়াঙ খেলেছিল, তারাও বাপ-মেয়ের ঝগড়া শুনতে পেল। কিন্তু কি দরকার পরের ঝগড়ায় কান দিয়ে। তারা টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে ঝগড়া ডুবিয়ে দিল। বাপ-মেয়ের গলা ছাপিয়ে চিৎকার উঠল।

খুশি কান খাড়া করে সবই শুনল, কিন্তু কি করবে? মাথা নিচু করে ঝাঁট দিতে লাগল। দাঁতে দাঁত পিষে অস্ফুট স্বরে সে বলল—যত বেজন্মার দল! তুই তো আমাকে রাগাবার চেষ্টা করবিই! বুড়ো হুঙ্কার ছাড়লেন; তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে, ভেবেছিস এমনি রাগিয়ে দিলে দমবন্ধ হয়ে আমি মারা যাব, তারপর আমার টাকায় একবেটাকে রেখে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবি! না, না, তা হবে না। বুড়োর হাড় এখনো শক্ত আছে, এখনো বহুবছর বাঁচব!

—যা তা বোকো না বলে দিচ্ছি! কি বলছিলাম যেন? হাঁ, তুমি এখন কি করতে চাও? বাঘিনী চীৎকার করে বলল। তার বুকের ভিতরটা এখনো কাঁপছে, কিন্তু মুখের জোর আরো বেড়ে গেছে।

কি করতে চাই? একশবার তোকে বলিনি, ওকে চাইলে আমাকে পাবিনে, আমাকে চাইলে ওর কাছেও ঘেঁসতে পারবিনে। আমার টাকা-কড়ি মান-সম্ভ্রম একটা রিক্সাওয়ালার হাতে তুলে দিতে আমি পারব না, কিছুতেই পারব না!

খুশি ঝাঁটা ছেড়ে ফেলে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। তারপর ন'কর্তা লিউর দিকে তাকিয়ে বলল, কার কথা বলছেন?

ন'কর্তা পাগলের মতো হো হো করে হেসে উঠলেন, হাঃ হাঃ হাঃ ঠিক রুখে এসেছ? কার কথা বলছিলাম? আবার কার কথা, তোমাদের মানিক জোড়ের কাণ্ডকারখানার কথাই বলছিলাম। ভালো ভেবে থাকতে দিলাম, আর বেটা কিনা আমারই ঘরে সিঁধ কাটতে আসছে! যাঃ—দূর হয়ে যা! আর কখনো যেন তোর মুখ দেখতে না হয়। বেটা বেজন্মা কোথাকার!

বুড়োর গলা ধাপে ধাপে চড়ে উঠল, কয়েকজন রিক্সাওয়ালা ব্যাপার দেখতে এরই মধ্যে ছুটে এসেছে। মেচিয়াঙ-খেলুড়েদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই। ন'কর্তা এবার কোনো রিক্সাওয়ালার উপর ঝাল ঝাড়ছেন এই ভেবে তারা আবার মাথা গুঁজে খেলতে লাগল।

খুশি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। অনেক কিছুই সে বলবে ভেবেছিল, কিন্তু বুড়োর সুমুখে এসে সব গুলিয়ে গেল, একটা কথাও বেরুল না। সে বোবার মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল।

যা, এখান থেকে দূর হয়ে যা! যা! আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিলি ছোঁড়া? তোর জন্মাবার আগে থেকে আমি ওসব হজম করে বসে আছি তা জানিস? বুড়ো খেঁকিয়ে উঠলেন বটে কেমন যেন ফাঁকা শোনাল চীৎকার; আসলে খুশির উপর তিনি চটেননি। ছোকরা তো নিরীহ ভালো মানুষ, বাঘিনীটাই যত নষ্টের গোড়া!

আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। খুশি আর বেশি কিছু বলতে পারল না। মানে মানে সরে পড়া ছাড়া তার উপায়ই বা কি? বুড়ো আর তার মেয়ে মুখ ছোটাতে শুরু করলে তার এখানে তিষ্ঠানোই দায় হয়ে উঠবে।

রিক্সাওয়ালারা ন'কর্তার চিৎকার শুনে ছুটে এল। তিনি খুশিকে গাল দিচ্ছেন দেখে তারা খুব খুশিই হোলো। ভোরবেলার ব্যাপারটা তারা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়নি। কিন্তু যখন তারা শুনল, ন'কর্তা তাকে মানবমিলন থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন; তারা খুশির পক্ষ নিল। ছোকরা খেটে খুটে কাজ উদ্ধার করে দিল, এখন নদী পার হয়ে বুড়ো সাঁকো ভেঙে ফেলতে চাইছে! খুশির তো আর দরকার নেই, এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে না চিনতে পারা তো খুবই সহজ! কয়েকজন খুশির কাছে ছুটে এল।

কি হয়েছেরে খুশি?

খুশি কোনো জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়ল।

যেও না; একটু দাঁড়াও! বাঘিনী স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার ফন্দি ভেস্তে গেছে। এখন খুশিও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে তো আর উপায় নেই! মুরগীর ছানাগুলো ভয়ে পালিয়ে গেছে বলে, রাগে ডিম ভেঙে ফেলা তো আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়! আমরা তো একই সুতোয় বাঁধা ফড়িং। একজন আর একজনকে ছেড়ে কি একটু নড়বার যো আছে! একটু দাঁড়াও, বুড়োর সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করে নি।

বাঘিনী মুখ ফিরিয়ে বুড়োর দিকে ছুরির মতো ধারাল কথা ছুঁড়ে মারল—তবে স্পষ্ট করেই বলি—আমার পেটে খুশির বাচ্চা। ওকে তো আমি ছাড়তে পারি না। ও যেখানে যাবে আমাকেও সেখানে যেতে হবে। এখন কি করবে বল?

বাঘিনী তার শেষ অস্ত্র ছাড়ল। ন'কর্তা কেমন হকচকিয়ে গেলেন। ব্যাপার এতটা গড়িয়েছে তিনি আশাও করতে পারেননি, কিন্তু এতগুলো লোকের সুমুখে চুপ করে থাকলে তো চলবে না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ওরে কালামুখি,

লজ্জার মাথা কি খেয়ে বসে আছিস যে এমন কথা সবার সুমুখে বলতে পারলি? তোর জন্যে বুড়ো বয়সে আমার মুখ নিচু হয়ে গেল। বুড়ো নিজের গাল চড়াতে শুরু করলেন। নচ্ছার, নচ্ছার বেটি!

খেলুড়েরা এবার খেলা বন্ধ করল। ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। কেউ কেউ উঠে দাঁড়াল, কেউবা ফ্যাল ফ্যাল করে হাঁদার মতো তাকিয়ে রইল।

সব কথা খোলসা করে বলে বাঘিনী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

আমি তো নচ্ছার হবই এখন! বেশি ঘাঁটিও না বলছি, সব ফাঁস করে দেব।

যতো নষ্টের গোড়া তো তুমি! ছেলে বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে লোকে বৌ ঘরে আনে, মেয়ে বড় হলে তাকে ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেয়—এই তো জানি। কিন্তু বুড়ো, উনসত্তর বচ্ছর তোমার বয়স হয়েছে, এখনো কিছুই শিখলে না। এইতো এত লোকজন রয়েছে, বাঘিনী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এদের সামনেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাক তোমার জন্মদিনের উৎসবের মেরাপ তো বাঁধাই আছে, এইখানেই আর একটা উৎসব করে ফেল, ভালোয় ভালোয় গোলমাল মিটে যাক। কি, আমি ঠিক পরামর্শ দিইনি?

কি আমি উৎসব করব? ন'কর্তা লিউর মুখখানা সাদা হয়ে গেল। সভ্য ভব্য মানবমিলনের মালিকের খোলস খসে পড়েছে, ন'কর্তা যেন পুরনো দিনের ডাকাত সর্দারে রূপান্তরিত হয়েছেন। উৎসব করব না কচু করব। তার আগে ঐ মেরাপ পুড়িয়ে দেব না!

বেশ, তো পুড়িয়ে ফেল। বাঘিনীর ঠোঁট কেঁপে উঠল। বিছানা পত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে চললাম। কিন্তু কত টাকা আমাকে তুমি দেবে আমি জানতে চাই?

টাকা আমার। যাকে খুশি দান খয়রাত করব। তোকে এক পয়সাও দেব না!

তোমার টাকা! এতদিন যে খাটলুম, তোমাকে সাহায্য করলুম, তা বুঝি কিছু নয়? থাক তোমার টাকা নিয়ে! পাঁচটা বেবুশ্যে রেখে উড়িয়ে দিলেও বলতে আসব না। তবে ধম্মে 'সইবে তো? বাঘিনী খুশির মুখের দিকে তাকাল, তুমিই বা মুখ বুজে রইলে কেন গো—কিছু বল?

খুশি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পনেরো

চুপ করে থাকা ছাড়া খুশির উপায় নেই। বুড়োকে সে তো আর দুঘা বসিয়ে দিতে পারে না। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলাও তার অভ্যেস নেই। গায়ে জোর আছে বটে, কিন্তু জোর খাটাবার কোনো সুবিধেই সে পেল না। ফিচেল বদমায়েসের মতো বাপ-বেটিতে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে কিছু আদায় করে নেবার ফিকির করলে মন্দ হয় না। খুশি একবার মনে মনে যে না ভাবল তা নয়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই ;. সাহসে কুলাল না। বাঘিনীর কাছ থেকে কেটে পড়তে পারলে সে বেঁচে যায়। কিন্তু এতগুলো লোকের সুমুখে বাঘিনী যে আত্মত্যাগের অভিনয় করে গেল, তাতে এখন সরে পড়াও বিপদ! বরং তাকে আগলে দাঁড়ানো ভালো। খুশি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যে পর্যন্ত না এই ঢেউ সরে গিয়ে নিচের পাথর দেখা দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে, আর তাইতো সত্যিকারের হানের বংশধরের কাজ।

বাপ-বেটির মুখের বুলি ফুরিয়ে এসেছে, এখন তারা পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। সত্যিই বলবার আর কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। খুশি কিছু বললে বোধ হয় ওরা এমন ধারা চুপ করে যেত না। কিন্তু খুশিও মুখ বুজে আছে, একটা কথা তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। রিক্সাওয়ালাদের অবস্থাও তেমনি। তারা যে কোন পক্ষ নেবে ভেবেই পাচ্ছে না। মেচিয়াও খেলুড়েরাও চুপ করে আছে। তারা বুঝতে পারছে, এই অবস্থায় একটা কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি বলবে? ব্যাপারটা তারা ভালো করে জানেই না। বাইরে ভাসা ভাসা দুএকটা মন্তব্য কি ঝগড়া থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া তাদেরও কিছু করবার উপায় নেই। আর তাতে বিপদও আছে। হয়তো বাপ-বেটির সমস্ত রাগ গিয়ে তাদের উপরই পড়বে। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। তারপর সুবিধে বুঝে একে একে খসে পড়লেই হবে।

বাঘিনী বেগতিক দেখে কয়লার দোকানের শ্রীযুক্ত ফেঙকে ধরল। আপনার দোকানে জায়গা হবে কি? খুশি কয়েকদিন আপনার ওখানে গিয়েই থাকবে। ভয় নেই, বেশিদিন আপনার ওখানে আমি ওকে ফেলে রাখব না। বিয়ের উদ্যুগ আমি এদিকে তাড়াতাড়ি করে ফেলছি। খুশি, তুমি ওর ওখানে যাও। আমি কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব। বাপের বাড়ি থেকে যদি আমাকে বিদায় নিয়েই

যেতে হয় তো ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে করেই যাব। আপনার হেফাজতে খুশিকে আমি রাখলুম, দেখবেন ঠিক ঠিক যেন আবার ওকে ফিরে পাই।

শ্রীযুক্ত ফেঙ কয়েকবার ঢোক গিললেন। মেয়েটা আবার তার ঘাড়ে একি দায়িত্ব চাপালে। খুশি আর দেরি না করে বিদায় নিল। যাবার সময় শুধু বলে গেল, ভয় নেই, পালাতে চাইলেও আমি পারব না।

শ্রীযুক্ত ফেঙ এবং আরো কয়েকজন অতিথি এবার ন'কর্তাকে ঘরের ভিতরে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ন'কর্তা তাদের কথায় কান না দিয়ে বললেন, আপনারা এখুনি যাবেন না। কয়েক পেয়ালা মদ আনাচ্ছি। বসুন, বহু কথা আছে।

মদ এল। ন'কর্তা এবার জাঁকিয়ে বসে বললেন, শুনুন এবার আমার কথা, বেশ মন দিয়ে শুনুন। আমার মেয়ের কাণ্ডকারখানা সব আপনারা নিজের চোখে দেখলেন তো? আজ থেকে ও আর আমার মেয়ে নয়। আমাদের সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল। এখন থেকে ও ওর নিজের পথে চলবে, আর আমিও মনে করব, এক বেটি ঝি ছিল তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছি। এতদিন আপনাদের ভিতরে মাথা তুলে আমি চলেছি, আজ আমার সেই মাথা হেঁট হয়ে গেল। বিশ বছর আগে এই ব্যাপার ঘটলে দুটো পাগলা ঘোড়ার মাঝখানে দুটোকে বেঁধে ছেড়ে দিতাম, তারপর দেখতাম কি হয়। কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, শরীরে সে ক্ষমতা নেই। তাই কিছু না বলে ওদের ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ও যদি আমার কাছ থেকে টাকাকড়ির আশা করে থাকে, তাহলে বলে দেবেন, এক কানা কড়িও পাবে না! দেখি, কি করে সংসার চালায়? তখন বুঝতে পারবে, ওর বুড়ো বাপ ভালো না বাউণ্ডুলে ঐ ছোঁড়া ভালো! বসুন উঠবেন না। আর এক পাত্তর চলুক না।

সবাই উঠে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কে আর পরের বাড়ির কলঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়! দায় সারা গোছের দুএকটা হাঁ-হুঁ দিয়ে তারা উঠে পড়ল।

খুশি কয়লার দোকানেই রইল।

বাঘিনীও চুপ করে বসে রইল না। সে বিয়ের আয়োজন করতে লেগে গেল। মাও পরিবারের বাড়িতে দুটো ছোট কুঠরি সে ভাড়া নিল। কুঠরি তো নয় যেন পায়রার খোপ—উত্তর দিকে বিরাট উঠোন, সেই উঠোনটা বাড়ির ভাড়াটেরা সবাই ব্যবহার করে। পায়রার খোপ দুটির দেয়াল আর মেঝে সাদা কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হোলো। বাঘিনী এবার শ্রীযুক্ত ফেঙকে অনুরোধ করল, গোটা কয়েক মন্ত্র লিখে দিতে। ফেঙ গোটা কয়েক মন্ত্র কাগজে লিখে দিলেন। বাঘিনী দেয়ালে আটা দিয়ে এঁটে দিল। ঘর সাজানো গোছানো হোলো, এবার বাঘিনী গাড়ি ভাড়া করতে ছুটল। যে সে গাড়ি হলে চলবে না, সারা গায়ে আঁকা থাকবে রুপালি তারা

—তাছাড়া যোলেটা বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে বাজবে। শুধু সোনার লণ্ঠনই এক সে ভাড়া করল না, ওতে বহু খরচা। অনেক দর কষাকষির পর ভাড়া ঠিক হোলো, এবার বাঘিনী তার তোরঙ্ থেকে লাল সাটিনের কাজকরা পোশাক বার করল। বছরের প্রথম পাঁচদিন তো আবার ছুঁচ ধরা নিষেধ, তাই নতুন বছরের ষষ্ঠদিনের উৎসবের জন্যে আগেই পোশাক তৈরী করে রেখেছিল। পাঁজির মতে এই দিনটাই বছরের সব চাইতে ভালো তাই এই দিনেই বিয়ের দিন ধার্য করে ফেলল।

সব জোগাড় করে সে এবার খুশিকে ডেকে বলল, জীবনে একবারই এদিন আসে। যাও একপ্রস্থ নতুন পোশাক কিনে নিয়ে এস।

খুশি বিপদে পড়ল। তার হাতে পুঁজি তো মাত্র পাঁচ ডলার।

বাঘিনী খেঁকিয়ে উঠল। সে কি গো! এই তো সেদিন তিরিশটা কড়কড়ে ডলার গুনে দিনু! কি হোলো সে টাকাগুলো?

খুশি চাও পরিবারের সমস্ত ঘটনাই তাকে খুলে বলল। বাঘিনী চোখ মিটমিট করে খুশির দিকে তাকাল। কথাটা যেন সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। কি আর হবে? তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবার আমার সময় নেই। তোমার বিবেক যা বলেছে তাই করেছ। নাও, এই পনেরটা ডলার নাও। উৎসবের দিন যদি নতুন পোশাক না দেখি তাহলে অনর্থ করব কিন্তু বলে দিচ্ছি।

নতুন বছরের ষষ্ঠ দিনে বাঘিনী লাল সাটিনের পোশাক পরে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে চড়ে বসল। বাপের সঙ্গে একটা কথাও সে বললে না আত্মীয় স্বজন কেউ তাকে বিদায় দিতে এল না, তার সঙ্গে কেউ গেল না। আর কেই বা সঙ্গে যাবে? তার তো আর ভাই নেই! ঘণ্টা বেজে উঠল, ঢাকে বাড়ি পড়ল—বাঘিনীর গাড়ি চলতে লাগল। শান্তির দরজা পেরিয়ে চলল গাড়ি। দুপাশে দোকানপাট, পথে নতুন পোশাকপরা লোকজন গিস্‌গিস্ করছে। সবাই গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। অতীতের স্মৃতি সবার মনে গুনগুন করছে, কেউ বা বহু আকাঙ্ক্ষিত এই দিনটার কথাই ভাবছে।

স্বর্গের সেতুর কাছে দোকান থেকে খুশি এক প্রস্থ নতুন পোশাক কিনে পরল। মুখখানা ঘষে ঘষে লাল করে ফেলল, মাথায় দিল তিরিশ সেণ্ট দামের মখমলের ছোট্ট টুপী। একেবারে খাসা বর সে সেজেছে। কিন্তু মনে তেমন জোর পাচ্ছে না। সবই যেন কেমন ফাঁকা অচেনা-অচেনা ঠেকছে। কয়লার দোকান থেকে এখন সে নতুন ঘরে এসেছে। পায়রার খোপের মতো ঘরখানি, কিন্তু বরফের মতো সাদা কাগজে মোড়া দেয়াল, কি তার জেল্লা! সে ঠিক বুঝতে পারে না কেমন করে এই ঘরে এসে হাজির হোলো। আগে যা ঘটেছে সেতো কহতব্য নয়। কয়লার দোকানের কয়লার স্তূপের মতোই কালো সে কাহিনী। এখন সে কালো জীবন পেরিয়ে এসে ঠাঁই পেয়েছে এই

ঘরে। দেয়ালের সাদা কাগজ চোখ ঝলসে দিচ্ছে, লাল অক্ষরগুলো চোখ ঠারছে। সত্যিই কি নতুন জীবনের কুলে এসে সে পৌছল ?

না না, নতুন জীবন এ নয়। এ এক গুরু অভিসন্ধী : তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে, তাকে লোকের চোখে খেলো করে ফেলছে। তাই এক অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে নিরাশার অনুভূতি তাকে পেয়ে বসেছে, তারই সাদা জেল্লায় তার চোখ ঝলসে গেছে।

ঘরে চেয়ার, টেবিল, তক্তপোশ বাপের বাড়ি থেকে বাঘিনী নিয়ে এসেছে, নতুন শুধু স্টোভ আর রান্নাঘরের টেবিলটা। দেয়ালের এককোণে মুরগীর নানা রঙের পালকের ঝারণটি ঝুলছে। খুশি পুরনো চেয়ার টেবিলগুলো দেখে খুশি হোলো। কিন্তু নতুন জিনিসগুলো বরদাস্ত করতে পারল না। পুরনো জিনিসগুলোতে যেন অতীতের চেনা দিনের স্পর্শ লেগে আছে : আর নতুনগুলো নিয়ে এসেছে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আর ভয়। জীবনে সে অন্যের কথা মতোই চলেছে ; সেও যেন এই নতুন আর পুরনো আসবাবগুলিরই সামিল ! অদ্ভুত, অদ্ভুত সে ! পুরনো দিনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, আবার নতুনকেও সে এড়াতে পারছে না। সত্যি, সে কি রকম লোক ? নিজেকে সে চিনতে পারছে না, নিজের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস নেই। খুশি ভাবতে পারছে না, সে কাঁদবে না, হাসবে। ছোট্ট ঘরটার ভিতরে সে ঘুরে বেড়াল। সে যেন এক মস্তবড় খরগোস, একটা নড়বড়ে বাঁশের খাঁচায় ধরা পড়েছে—বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখছে, আবার খাঁচার ভিতরে ফিরে আসছে চোখ ; একদিন পায়ে ভর করে কি জোরেই না সে ছুটতে পারত, আজ আর সে শক্তি তার নেই—আজ সে বন্দী—বেরুতে পারছে না, কিছুতেই বেরুতে পারবে না।

বাঘিনী এসেও পৌছেচে। পরনে তার লাল জ্যাকেট। মুখে পাউডার আর রুজ। তার চোখ জলের মতই ছলাৎছলাৎ করে খুশির সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। তার চোখের দিকে তাকাতেই সে পারছে না। সেও যেন কেমন বদলে গেছে। নতুন আর পুরনো পরিচয় আর অপরিচয়ের অদ্ভুত সমাবেশ দেখা দিয়েছে বাঘিনীর ভিতরে। সে যেন ছোট্ট মেয়ে, আবার পরিপূর্ণ নারী; সে যেন একাধারে পুরুষত্বের সম্ভাবনায় পূর্ণ ; সে যেন একদিকে মানুষ আর অন্যদিকে বর্বর হিংস্র পশু। লাল জ্যাকেট পরা পশুনী তার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বন্দী করেছে। এখন ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো করে তারিয়ে তারিয়ে খাবে ! সে নিরীহ গোবেচারী, সবাই তার উপরে এমনি ধারা অত্যাচার করতে পারত, কিন্তু এই পশুটা যেন আরো বর্বর, আরো নিষ্ঠুর ; সে তাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে, এক মুহূর্তও দৃষ্টির বাইরে যেতে দেবে না, কটমট করে তাকাবে, তাকে ঠাট্টা করবে, দরকার হলে কাছে টেনে নেবে। তারপর জোর করে তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরবে, পা দিয়ে পা দুখানা জড়িয়ে ধরবে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে বোবা করে রেখে তাকে।

না, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। খুশি তার মখমলের টুপিটা খুলে নিয়ে টুপির উপরে বসান লাল বোতামটার দিকে বোকার মতন তাকিয়ে রইল। চোখে ঝাপসা দেখছে, মনে হচ্ছে দেয়াল জুড়ে সারি সারি লাল বোতাম ছুটোপুটি খেতে খেতে চলেছে। এবার একটা লাল বোতাম সারা দেয়ালটা ঢেকে দিল—দেয়াল লাল হয়ে গেছে আর তার ভিতরে একখানা মুখ হাসছে। কি অশ্লীল তার হাসি! কে—ও কে? খুশি চিনতে পারল, সে আর কেউ নয় বাঘিনী।

রাত হয়ে এল, বিবাহের প্রথম রাত। খুশি এবার বুঝতে পারল, বাঘিনী গর্ভবতী নয়। যাদুকরের মতো বাঘিনী তাকে সব কথা খুলে বলল, তোমাকে অমন করে না ভুলালে কি আর তোমার উঁচু মাথা কখনো নুয়ে পড়ে? আমি পেটের নিচে বালিস বেঁধে তোমাকে কেমন ঠকিয়ে দিলাম। হাঃ হাঃ হাঃ। হাসতে হাসতে বাঘিনীর চোখ দিয়ে জল বেরুল। হাঁদারাম! ও নিয়ে এখন আর ভেবে কি হবে? আর এমন কিছু লজ্জার কাজও করিনি। বরং দেবতাদের তুমি এই বলে ধন্যবাদ দাও যে, আমার মতো মেয়ে অমন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে তোমার মতো একটা লোকের সঙ্গে ঘর করতে এসেছে।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই খুশি বেরিয়ে পড়ল। কয়েকদিন ছুটির পর প্রায় সব দোকানগুলোই আজ খুলেছে। বসত বাড়িগুলির সদর ফটক বন্ধ। নতুন বছরের শুভাশীর্বাদ লেখা লাল কাগজগুলো এখনো দরজার গায়ে আঁটা, শুধু হলদে কাগজের শেকলগুলো হাওয়ায় ছিঁড়ে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। পথঘাট শান্ত, কন কনে হাওয়া বইছে। দুচারজন রিক্সাওয়ালা এরই মধ্যে রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। নতুন বছরের উত্তেজনা এখনও উবে যায়নি। প্রায় সকলের পায়েই নতুন জুতো, রিক্সার পেছনে ছোট লাল কাগজ আঁটা—নতুন বছর যাতে ভালো ভাবে কাটে তাই ভাগ্যের দেবতাকে প্রসন্ন করবার জন্যে লাল কাগজ লাগিয়েছে। খুশি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল। হিংসে হোলো তার! নতুন বছরের স্পর্শ পেয়েছে তাইতো ওরা অমন তেজিয়ান। আর সে বছরের ছোঁয়া তো পেলই না, বরং এই কটা দিন যেন একটা পচা কুমড়োর ভিতরে সে গুমিয়ে গুমিয়ে মরছিল, আজ সবে ছাড়া পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। ওরা কেমন রিক্সা টেনে আপন খেয়ালখুশি-মাফিক চলেছে। আর সে! কোনো কাজ নেই তার, সদর সড়ক দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলেছে। সে যেন পথের পাশের দোকানির কাঠের ফলক হাওয়ায় দুলে দুলে দুলে উঠছে। কোনো কাজ নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই।

মনেও তো ছাই শান্তি নেই। সে ঠিক করল, কাল সে বাঘিনীর সঙ্গে পরামর্শ করবে। বাঘিনী—তার স্ত্রী বাঘিনী! তার স্ত্রী তাকে পুষছে, তারই

ভাতে সে আছে। এত চাঙা সে, এত শক্তি তার কিন্তু কোনো কাজেই এল না! তার বাঁচার কোনো সার্থকতা আছে? আছে বইকি! লাল জামা পরা, নেকড়ে বাঘের মত দাঁত, সেই না-পুরুষ, না-পশু মেয়েটাকে পুষতে হবে তো? ঐ মেয়েটাই তো তার রক্ত চুষে খেল, চুষে খেল তার পুরুষত্ব। সে তো আর মানুষ নেই, একখানা হাড়ে এসে ঠেকেছে। নিজের সত্তা হারিয়ে বসে আছে। এখন সে বাঘিনীর শীকার, বাঘিনী তার ধারালো দাঁত বসিয়ে দেবে, ইঁদুরের মতো তার দাঁতের সঙ্গে সে ঝুলচে। এই তার নিয়তি।

না, সে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে না। নিজের উপায় নিজেই খুঁজে বার করবে, তারপর বিদায় না নিয়েই বাঘিনীর কাছ থেকে সরে পড়বে। ওঃ, তার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না তো বয়েই গেল! অমন মেয়ের জন্যে বিবেকে লাগবে না। সে তো মেয়ে নয়, ডাইনী। একটা বালিস নিয়ে কেমন সস্তা হাতের কসরৎ দেখিয়ে দিল। সে বোকা বলেই না তার ফাঁদে পড়েছে।

হৃদয়ের গুহায় অস্থির হয়ে উঠল তার আত্মা, ক্ষত বিক্ষত করে দিল কামড়ে কামড়ে তার বুক। তার ইচ্ছে হোলো, নতুন পোশাক সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে কোথাও গিয়ে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসে। শরীরটা তার অশুদ্ধ হয়ে গেছে, তেমনি গেছে তার মন। সারা দেহে যেন পচা গলা কি লেপ্টে আছে, গা বমি বমি করছে, মন অস্থির হয়ে উঠেছে। না, সে আর বাঘিনীর মুখ দেখতে চায় না।

কিন্তু কোথায় সে যাবে? কোনো উদ্দেশ্যই তার নেই। রিক্সাখানা টানে, সোয়ারির নির্দেশ মতোই সে চলে। আজ কোনো নির্দেশ নেই, যেখানে সে যেতে পারে—কিন্তু কোথায় যাবে? মনে কেমন গোলমাল শুরু হয়েছে। দক্ষিণ মুখো সে চলতে লাগল। কুচকাওয়াজ ফটক পেরিয়ে সে এল। সোজা সড়ক—গলি ঘুঁজিতে ঢুকে পড়তে তার ইচ্ছে নেই। সে চলতে চলতে এসে দাঁড়াল একটা হামামের সুমুখে, এইখানেই সে ঢুকে পড়বে ঠিক করল।

পোশাক ছেড়ে সে একবার নিজের নগ্ন শরীরটার দিকে তাকাল। কেমন যেন লজ্জা করছে। এবার সে চৌবাচ্ছায় নেমে পড়ল, গরম জলের ধারা গায়ে পড়ছে, সমস্ত শরীর কেমন অবশ হয়ে গেছে। চোখ বুজে সে শুয়ে পড়ল, সারা শরীরে মাদকের অবসাদ, শিথিল হয়ে গেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ক্লেদ ঝরে পড়ছে ঘাম হয়ে। সাবান মাখতে তার ভয় হোলো; মনটা ফাঁকা হয়ে গেছে, কপালে মুক্তোর মতো বড় বড় ফোঁটায় ঘাম দেখা দিচ্ছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবার ঘন হয়ে এল, এত ঘন যেন ফুরিয়ে যাবে নিশ্বাস, দম আটকে যাবে! আর সে সহ্য করতে পারল না, কোনোরকমে চৌবাচ্চা থেকে উঠে পড়ল। সদ্যজাত

শিশুর মতো সারা গা লাল হয়ে গেছে এমনি ন্যাঙটো। বাইরে বেরুনো যায় না। সে তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিল। ঘাম ঝরে ঝরে মেঝেয় বিছানো মাদুরে পড়ছে, অদ্ভুত শব্দ! বী-ডা-বাই-ডা। তার মনে হোলো, এখন সে সম্পূর্ণ শুচি হতে পারেনি, এখনো তার মনের অপবিত্রতা ঘোচেনি। সে কি আর ঘুচবে, অনন্ত, অনন্ত কাল ধরে থাকবে সে অপবিত্রতা। ন'কর্তার কাছে, বাইরের আর দশজনের কাছে সে তো অপরাধী হয়েই রইল। মেয়ে ফুসলে ঘরের বার করে এনেছে, এর চাইতে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে?

ঘাম শুকোতে না শুকোতেই পোশাক পরে সে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। কি জানি কেউ যদি টের পায়, সে এমনি কলঙ্কভরা জীবন কাটাচ্ছে! বাইরে পথের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার মন শান্ত হোলো। হালকা লাগছে, নিজেকে স্বাধীন মনে হচ্ছে। পথে ভিড়, উজ্জ্বল আকাশ। আকাশ থেকে উজ্জ্বলতা চুইয়ে পড়ে সকলের মুখে খুশির রং বুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার মনে এখনো আলোর স্পন্দন জাগেনি। কোথায় যাবে, কি করবে সে জানে না।

দক্ষিণদিকে চলতে চলতে পুবদিকে মোড় ঘুরল, আবার দক্ষিণ দিকে ফিরে এসে স্বর্গের সেতু পার হয়ে গেল। নটা বাজে। নতুন বছরের উৎসবের পর আজ প্রথম দোকান খুলছে, কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে কাজে এসেছে। দোকানপাঠ খুলছে, কিছু দূরে একটা সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। লোকের ভিড় জমেছে সেখানে। ভিড়ের মাঝখানে কয়েকটা লোক ঘণ্টা শাঁখ, ঢাক পেটাচ্ছে। খুশি একবার ভিড়ের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল, কি ভেবে আবার ফিরে এল। তামাসা দেখবার মতো তার মেজাজ নেই; এমনকি হাসতেও যেন সে ভুলে গেছে।

সার্কাসের সং মুখভঙ্গী করে লোক হাসাচ্ছে, তিব্বতী ভালুকের নাচ দেখাচ্ছে একটা লোক; ওপাশে যাদুকর ভোজবাজি দেখাতে বসে গেছে; একদল গান গাইছে, কেউ বা পুরনো পুঁথি খুলে গল্প শোনাচ্ছে; একধারে যুদ্ধের নাচ দেখাচ্ছে একদল—এক হৈচৈ ব্যাপার! খুশির এসব দেখতে ভালোই লাগে, কতোবার সে প্রাণ খুলে হেসেছে। এই স্বর্গের সেতুর জন্যেই কতবার সে ছাড়িছাড়ি করেও পিকিঙ থেকে যেতে পারেনি। এমন মজা বুঝি দুনিয়ার আর কোথাও মিলবে না! কিন্তু আজ যেন কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে সব! ভালো লাগছে না, ভিড় থেকে সে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। একটা নিরালা জায়গায় গিয়ে দুদণ্ড বসতে চায় সে, কিন্তু এমন হৈ হল্লা, আমোদ প্রমোদ ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। সে আবার ফিরে এল। সে স্বর্গের সেতু ছাড়তে পারবে না; ছাড়তে পারবে না এই পিকিঙ।

এসব ছেড়ে কোথায় যাবে? পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তার কাছেই তাকে ফিরতে হবে—তার কাছে! পরামর্শ চাইতে হবে। এমনি নিষ্কর্মা জীবন কাটালে তো চলবে না। অনেক অবিচার সে সয়েছে, কোনোদিন মুখ ফুটে কারো কাছে কিছু বলেনি। আজই বা চিৎকার করে বলতে যাবে কেন? অতীতের অনেক ভুলই তো সে করেছে, আজও না হয় ভুলের অলিতে-গলিতেই সে ঘুরে বেড়াবে। পিকিঙ ছেড়ে যাওয়া তার হবে না—সে যেতে পারবে না।

খুশি দাঁড়িয়ে পড়ল। হল্লা-হুল্লোড়, গান, ঢাকের শব্দ কানে ভেসে আসছে, চোখের সুমুখে ঢেউয়ের মতো আসছে আর যাচ্ছে গাড়িঘোড়া আর লোকের মিছিল। বিরাম নেই, নেই তার অন্ত। খুশি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, হঠাৎ তার মনে পড়ল ছোট্ট দুখানি কুঠরির কথা। পায়রার খোপের মতো দুখানি কুঠরি, দেয়ালে বরফের মতো সাদা কাগজের জেল্লা! লাল আশীর্বাণী তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে বাইরের হল্লা, জনতার ভিড় তার চোখের সুমুখ থেকে মুছে গেল। ছোট্ট দুখানি কুঠরি! এক রাত সে সেখানে কাটিয়েছে, কিন্তু এত পরিচিত, এত ঘনিষ্ঠ তারা। এই লাল জ্যাকেট পরা মেয়েটাকেও যেন দূরে সরিয়ে রাখা চলে না, মনের একটা কোণ সে জুড়ে বসেছে। এই তো স্বর্গের সেতুর উপর সে দাঁড়িয়ে আছে, কি আছে তার এখানে? এই আমোদ প্রমোদের ভিড়ে তার সত্তা হারিয়ে গেছে। অথচ ঐ দুটো কুটরিতে তো তার সব আছে। সে ফিরেই যাবে। ফিরে গিয়ে বলবে, 'কর্তৃত্ব নিতে এলাম, আমাকে কে রুখবে এগিয়ে এস। ঐ ছোট্ট কুটরিতেই তো তার আগামী কালের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। লজ্জা, ভয় ওগুলো তো কিছু নয়—তাকে বাঁচতে হলে ঐখানেই ফিরে গিয়ে উপায় খুঁজে বার করতে হবে।

এক ছুটে সে বাড়ি ফিরে এল। ঘরে যখন ঢুকল এগারোটা বেজে গেছে। বাঘিনী সকালের রান্না শেষ করে বসে আছে। নানারকম খাবার সে তৈরী করেছে—মাংস দিয়ে বাঁধাকপির ঘণ্ট, ডুমুরের তরকারি আরো কতকি! সবই টেবিলের উপর সাজানো—শুধু বাঁধাকপির ঘণ্ট এখনো উনুনের উপর চড়ানো রয়েছে। খোসবাইতে ঘর ভরে গেছে। লাল জামা সে খুলে পরেছে সুতীর জামা, পরনেও সুতীর পায়জামা, শুধু এখনো চুলে গোঁজা রয়েছে মখমলের লাল ফুল, ভিতরের সোনালি কাগজ চক্ চক্ করছে। মুখখানাও বেশ হাসি-খুশি! মনের মানুষকে পেয়েছে, খুশি হবে না?

খুশি তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। নতুন বৌ বলে তাকে মনে হয় না। একটু লজ্জা-সরম নেই। মনে হয় যেন, এক যুগ হোলো তার বিয়ে হয়েছে। একেবারে পাকা গিন্নিটি। খুব চটপটে আর অভিজ্ঞ। নতুন বৌয়ের মতো না হলেও খুশির যেন তাকে নতুন বলেই মনে হোলো। এমন রূপ সে

বাঘিনীর কখনো দেখেনি। খুশির জন্যে সে রান্না করেছে, ঘর দোর পরিষ্কার করেছে, কেমন একটা শ্রী এসেছে যেন। এ শ্রী তো আগে তার ছিল না। বাঘিনীর স্বভাব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—বাঘিনী তাকে বাড়ি দিয়েছে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে এই তো যথেষ্ট!

কোথায় গিছলে? বাঁধাকপির ঘণ্ট পরিবেশন করতে করতে বাঘিনী জিজ্ঞেস করল।

হামামে—কামিজটা খুলে রেখে উত্তর দিল।

যখন কোথাও যাবে আমাকে বলবে। অমন হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে যেও না। আমি তো ভেবেই মরি, বুঝি রাগ করেই বেরিয়ে গেলে!

খুশি জবাব দিল না।

কালা না বোবা। অন্তত হুঁ হাঁ করেও একটা জবাব দাও। তবু বুঝি যে কথা কানে গেছে। কি করে জবাব দিতে হয় শিখিয়ে দেব না কি।

হুঁ! খুশি মুখে অস্ফুট শব্দ করল। এর বেশি কি করতে পারে সে ভেবে পেল না। সে জানে সে এক খেঁকি কুকুরকে বিয়ে করেছে। এমনি খেঁকি কুকুররাই নাকি ছানা বিয়োয়—আর সেই ছানাগুলো নরকের দূত হয়ে আকাশে ধূমকেতুর মতো উড়ে বেড়ায়। কিন্তু খেঁকি কুকুর হলে কি হবে, ভালো রাঁধতে জানে, ঘরদোর সাফ করে; গালাগাল অবিশ্যি দেয়, তাই বলে সাহায্যও কম করে না। কিন্তু যাই করুক, তার বরাতের গুণে সবই উল্টো দাঁড়ায়। এই তো মাংস রেঁধেছে, গরম মাংস মুখে দিতে গিয়ে জিব পুড়ে গেল! খুশি কোনো রকমে ঘাড় গুঁজে খেয়ে গেল। চিবুচ্ছে বটে কিন্তু নেকড়ের মতো সে খিদে যেন কোথায় উবে গেছে। এ যেন কোনো রকমে গিলে চলেছে, কোনো স্বাদ পাচ্ছে না। অথচ সামান্য খাবার খেয়ে সেদিনও কেমন দরদর করে ঘাম ছুটত! হাঁ, কিছুটা খেয়েছে বলে মনে হোতো।

খাওয়া সেরে খুশি বিছানায় হাতে মাথা দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল, চোখ রইল ছাতের দিকে।

এস না! বাসন-কোসনগুলো ধুতে হবে না। আমি তো কারো দাসী বাঁদী নই যে একা এককাড়ি বাসন মাজব! বাইরের ঘর থেকে বাঘিনীর স্বর শোনা গেল।

অনিচ্ছা সত্ত্বে খুশি উঠে পড়ে বাসন মাজতে বসে গেল। খাটুনিকে সে কোনোদিন ডরায় না, কিন্তু আজ কোনোরকমে মুখ বুজে সে কাজ করে গেল। মানবমিলনে সে বাঘিনীকে ঘর-গৃহস্থালির কাজে বহু সাহায্য করেছে, কিন্তু এখন তাকে দেখলেই তার পিত্তি জ্বলে যায়। জীবনে বোধ হয় এত ঘেন্না সে কাউকে কোনোদিন করেনি। সে নিজেই বুঝতে পারে না, কেন বাঘিনীর উপর

তার এই বিতৃষ্ণা! এই কাজ করতে করতে বারবার মনে হোলো, তার বরাতই দুঃখের। এমন পোড়া বরাত নিয়ে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?

বাসনগুলি সাজিয়ে রেখে বাঘিনী এবার হাঁফ ছাড়ল। তারপর ফিক করে হেসে ফেলল। কি গো?—

কি? খুশি উনুনের ধারে হাত সেঁকতে সেঁকতে জিজ্ঞেস করল। হাত তার ঠাণ্ডা হয়নি, তবু সে হাত সেঁকতে লাগল। এই দুখানা কুঠরি তার বাড়ি অথচ কোথাও যে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বসবে তারো উপায় নেই।

আমাকে বাইরে নিয়ে চলো না গো। কত মজার মজার জায়গা রয়েছে। চলো না সাদা মেঘের মঠে বেরিয়ে আসি। না, না, আজ দেরী হয়ে গেছে। তার চেয়ে চলো রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আসি?

নতুন বৌ-এর সবটুকু আনন্দই বাঘিনী পেতে চায়। বুড়ো বয়েসেই তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তাই বলে মোটে সাদ-আহ্লাদ তার নেই এমন কথা বলা যায় না। এতদিন বাপের বাড়িতে সে ভালো খেয়েছে-পরেছে, টাকা কড়িরও অভাব হয় নি। শুধু অভাব ছিল এমন একজন মনের মানুষের। মনের মানুষ সে পেয়ে গেছে, এত বছরের আকালের শোধ সে চুটিয়ে নেবে না তো কে নেবে! সে খুশিকে নিয়ে পথে ঘাটে মন্দিরে হাটে বাজারে ঘুরে লোককে দেখিয়ে দেবে সে কারো পরোয়া রাখে না, সেও মনের মানুষ জুটিয়েছে।

খুশি কিন্তু যেতে রাজি হোলো না। বুড়ী বউকে পিছনে বেঁধে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো তার ধাতে সয় না। তারপর যে কাণ্ড করে বিয়ে হোলো বউকে সে বাইরে বার করবে কোন লজ্জায়? লোকেই বা দেখে কি বলবে? অমন বৌকে ঘরে বন্ধ করে রাখাই ভালো। বাইরে বেরুলেই তো রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে দেখা হবে। এতক্ষণে বাঘিনী আর খুশির কেচ্ছা আধখানা শহর জেনে গেছে। সে বেরুলেই তারা পিছনে টিটকারী দেবে। খুশি সে টিটকারী সইতে কিছুতেই পারবে না।

এস, একটা পরামর্শ করা যাক, কি বল? খুশি উনুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে বলল।

কিসের পরামর্শ শুনি? বাঘিনী এসে তার পাশে দাঁড়াল।

খুশি হাত দুটো হাঁটুর উপর রাখল। আগুনের হল্কা উঠছে। সে তার দিকে বহুক্ষণ চেয়ে রইল। একখানা খোঁটা যেন কে পুঁতে রেখেছে, কোনো সাড়া শব্দ নেই। বহুক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বলল, আমি আর কুড়ে হয়ে বসে থাকতে চাই না।

তোমার যা বরাত তাইতো হবে। খেটে খেটে হায়রান হওয়া ছাড়া কিই বা করবে বল? বাঘিনী একটু হাসল। জানি, জানি, একদিন রিক্সা না টানলে

সারা গা তোমার চুলকোয়—কি সত্যি বলিনি? আর বুড়োর দিকে চেয়ে দেখ। সারা জীবন আরামে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে এক রিক্সার আড্ডা খুলে বসেছে। জীবনে সে রিক্সা টানেনি, কখনো তাগদ বিকিয়ে রোজগার করেনি। মাথা খাটিয়ে রোজগার করেছে। তুমি আজীবন রিক্সা চালিয়ে পারবে বুড়োর মতো আড্ডাধারী হতে? হুঁ, তা আর দেখতে হয় না! আমি বলি কি, এস কটা দিন আমোদ আহ্লাদ করে কাটাই, তার পর কাজের কথা ভাবা যাবেখন। দুতিন দিনেই তো আর ব্যবসা পালিয়ে যাচ্ছে না। এত তাড়া কিসের বাপু? আমি কি আর কিছু বুঝি না? এই দুদিন ঝগড়া করতে চাই না বলেই তুমি আমাকে রাগাবার ফিকির খুঁজছ!—

আমি পরামর্শ করতে চাই। খুশি নাছোড়বন্দা। সে বুঝতে পেরেছে, পালাবার উপায় নেই, তাই তাড়াতাড়ি এখনি কাজ নিতে চায়। এমনি করে ছোট ছেলের মতো দোলনায় দুলে দুলে কদিন কাটাবে?

বেশ তো, কি বলতে চাও, বল না? একটা টুল নিয়ে এসে উনুনের ধারে বাঘিনী বসে পড়ল।

কত টাকা আছে তোমার? খুশি জিজ্ঞেস করল।

যা ভেবেছি তাই। জানি, আজ বাদে কালই ওকথা জিজ্ঞেস করবে। তুমি তো আর আমাকে বিয়ে করনি, বিয়ে করেছ আমার টাকা—কি ঠিক বলিনি?

খুশির মনে হোলো হঠাৎ এক ঘূর্ণি এসে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকবার সে ঢোক গিলল। বুড়ো লিউ আর মানবমিলনের রিক্সাওয়ালারা মনে করেছে টাকার জন্যেই সে বাঘিনীর সঙ্গে নটঘটি বাঁধিয়েছে। বাঘিনীও আজ ঐ কথাই তাকে শুনিয়ে দিল। অথচ তার দোষ কি? সে নিজের রিক্সা হারিয়েছে, পুঁজি যা ছিল তাও গেছে। এখন আবার এই অপবাদ! এ যেন খাবার পাকস্থলীতে না গিয়ে মেরুদণ্ডে গিয়ে জমা হয়েছে, এখন উগরে দেওয়াও চলে না। খুশির নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল। মেয়েটা এখনো তার সুমুখে মুখ নেড়ে কথা কইছে! সে তার গলা এমনি করে টিপে ধরছে না কেন? এমনি করে পিষে পিষে ওর জিভ বার করে দিচ্ছে না কেন? এমনি করে মেরে ফেলতেও তো সে পারে! খুশি নিজের গলায় হাত দিল। তারা কেউই বেঁচে থাকবার উপযুক্ত নয়। তাদের মরাই ভালো। সেও কি মানুষ নাকি? তারও মরা উচিত। দুজনেরই বাঁচবার অধিকার নেই।

খুশি উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে আসবে। এখন বাড়ি ফেরাই তার ঠিক হয়নি।

খুশির মুখ চোখের চেহারা দেখে বাঘিনী ঘাবড়ে গেল। এবার সে নরম সুরে বলল, জানতেই যখন চাইলে, বলছি শোনো, পাঁচশ ডলার জমিয়েছিলাম।

বিয়ের গাড়ি, তিন মাসের বাড়ি ভাড়া, দেয়ালে কাগজ লাগানো, পোশাক আর এই বাসন-কোসন কিনতে প্রায় একশ ডলার বেরিয়ে গেছে। তাছাড়া তোমাকেও তো কিছু টাকা দিয়েছি। খরচ-খরচা মিটিয়ে এখন আমার হাতে আছে প্রায় চারশ ডলার। তোমার ভয় নেই গো, আমি ঠিক ওতেই চালিয়ে নেব। এস না, দুদিন একটু আমোদ করেই কাটানো যাক্! আইবুড়ো থেকে থেকে তো বুড়িয়ে গেছি—একটু আধটু ফুর্তি না করলে চলবে কেন? টাকাকড়ির টানাটানি পড়লে না হয় বুড়োর কাছেই আবার হাত পাতব। সে রাত্তিরে কি ভূতেই পেয়ে বসেছিল বাপু, না হোক একটা ঝগড়াঝাটি করলুম? তা না হলে কি আজ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়। এখন রাগ পড়েছে, এখন তো বুঝতে পারছি, বাপ কি বস্তু। আর বুড়োরই বা আমি ছাড়া কে আছে—একটা ছেলে নেই। তাছাড়া তোমাকে বুড়ো খুব ভালোই বাসে। এখন আমরা দুজনে গিয়ে যদি নরম হয়ে মাপ চাই তাহলেই বুড়ো গলে যাবেখন। আর মাপ চাইতেই বা দোষ কি বল? বুড়োর টাকা আছে—আর আমরা তার ওয়ারিসান, আমরাই তো সব পাব। এর ভিতরে আর কিন্তুটিন্তু নেই বাপু। গাধার মতো ভাড়া খেটে খেটে জীবন চালানোর চাইতে এ ঢের ঢের ভালো।

দুতিন দিন পরে—তুমি একবার গিয়েই দেখ না। তোমাকে নিশ্চয়ই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে না! প্রথমবার যদি তাড়িয়েও দেয়, আবার যাবে। বুড়ো তখন নরম হবেই, মতও বদলাবে। তারপর আমি নিজে একবার দেখা করে বুড়োর মন গলিয়ে দেব। এখন পেছপা হলে চলবে না। তাহলে সব ভেস্তে যাবে। সমাজে আমরা একঘরে হয়ে থাকব। কি, আমার কথাগুলো কানে ঢুকল?

খুশি এসব বিষয় চিন্তা করে কখনো দেখেনি: বাঘিনী যেদিন চাও-বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল সেইদিন থেকেই সে ঠিক করে রেখেছে, বাঘিনীর পয়সায় রিক্সা কিনে সে টানবে। যদিও বৌএর পয়সায় কেনাটা খুব সম্মানের ব্যাপার নয়, কিন্তু গত্যন্তর নেই, সে কি করবে! কিন্তু বাঘিনীর মগজে যে অন্য ফন্দি খেলছে, একথা সে ভাবতেই পারেনি। এবার মুখোশ খুলতেই তার ফন্দি বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু খুশি তো সে ধাতের লোক নয়। সোজা পথেই সে চলে, বাঁকা পথের ধার ধারে না। এত ব্যাপার ঘটেছে সে বুঝতেও পারেনি। তার নিজের জমানো টাকা চুরি গেছে, কিন্তু কারো কাছে মুখ ফুটে বলেনি। এখন কেউ টাকা দিতে চাইলে তাকে বাধ্য হয়েই নিতে হবে, উপায় তো নেই! কিন্তু মানুষ বলেই নিজেকে পরিচয় দিতে আর সে পারবে না। কোথায় গেল তার সে চওড়া ছাতি আর শক্তির গর্ব? অন্যের নকর হয়েই তাকে থাকতে হবে। সে হবে বৌ-এর হাতের খেলনা, বুড়ো শ্বশুরের কেনা

চাকর। কিন্তু উপায় নেই, উপায় নেই! মানুষের এইই বরাত! যতই গর্ব করুক, মানুষ কিছুই না। একটা পাখীরই সামিল। খাবার খুঁজতে গিয়ে শিকারীর ফাঁদে পড়তে পারে; কারো খাবার খেলে তারই পোষমানা হয়ে খাঁচায় থাকতে হবে, তারই হুকুম মাফিক শিষ দেবে, গান গাইবে, তারপর মনিব হয়তো একদিন খুশি মতো আর কারো কাছে দেবে বিক্রী করে।

ন'কর্তা লিউর কাছে যেতে খুশির মোটেও ইচ্ছা নেই। কেন সে যাবে? বাঘিনীর সঙ্গে তার রক্তমাংসের সম্বন্ধ, কিন্তু ন'কর্তার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। এই মেয়েমানুষটার জন্যে সে বহু সহ্য করেছে, এবার তারই জন্যে বাপের কাছে ভিখ মাগতে সে যাবে না—যেতে পারবে না!

আমি কুড়ে হয়ে বসে থাকতে পারব না—শুধু একটা কথাই খুশি বলল। সে বৃথা ঝগড়া করতে চায় না। যার যেমন বরাত তেমনি তো কথা হবে! বরাতে আছে খেটে খেটে প্রাণ দেওয়া—তা আমি কি করব? বাঘিনী যেন খুশির স্বাধীন ইচ্ছার উপর একটা মুগুরের ঘা মারল। কুঁড়ে হয়ে বসে থাকতে কেই বা বলছে, যাও না কোনো ব্যবসা করগে না!

আমি ওসব ব্যবসা-ট্যাবসা বুঝি না। বেশি টাকার আমার দরকার নেই। আমি রিক্সা টানতে জানি—রিক্সাই টানব। খুশি রেগে গেল। মনে হোলো মাথার শিরা ছিঁড়ে এখুনি সে অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি, রিক্সা টানতে তোমাকে দেব না। ঘেমো গন্ধ নিয়ে রোজ যে এসে আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে, তা হবে না। তোমারও যেমন পথ আছে, আমারও আছে। দেখি, কার জোর খাটে? মুরোদ তো ভারি! বিয়ে করেছ তুমি, আর গাঁটের পয়সা খরচ করলাম আমি। কই এক পয়সাও তো ট্যাঁক থেকে বেরুল না! একটু সমঝে কথা বোলো বলে দিলাম। দেখি এ বাড়িতে কে হুকুম চালায়—তুমি না আমি?

খুশি বাঘিনীর কথা শুনে থ মেরে গেল।

ষোলো

প্রথম চান্দ্রমাসের পনেরো দিন চলে গেছে। খুশি এখনো ঘুরেই বেড়াচ্ছে, কোনো কাজেই ঢোকেনি। বসে থেকে থেকে সে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে।

বাঘিনী কিন্তু ফুর্তিতেই আছে। ও আগামী উৎসবের জন্যে রকমারি খাবার তৈরী করছে: চালের পিঠে, মাংসের নানা খাবার আরো কতকি! বিশেষ করে খুশির জন্যেই সে তৈরি করছে। দিনের বেলা বাঘিনী রান্না-বান্না সেরে প্রায়ই খুশিকে নিয়ে বৌদ্ধ মন্দির দেখতে যায়, রাতের বেলা দোকানের আলো দেখে দেখে পথে ঘোরে। খুশিকে সে কোনো বিষয়েই মন্তব্য করতে দেয় না। তবে তার খাওয়া-দাওয়ার দিকে তার খুব নজর, রোজই নতুন দুএকটা ব্যাঞ্জন বা পিঠে সে রাঁধে।

বাড়ির উঠানটা ভাড়াটেরা সবাই ব্যবহার করে। তা ভাড়াটে প্রায় সাত আট ঘর হবে। প্রায় বেশির ভাগই একখানা ঘর নিয়ে থাকে। এক এক ঘরে সাত আটজন করে লোক—বুড়ো ছোকরা মেয়ে ছেলেপুলে সবাই কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকে আর কি। এদের কেউ কেউ রিক্সা টানে, কেউ বা ফেরিওয়ালা। দুএকজন পুলিশও আছে। বেশির ভাগই বাড়ি বাড়ি ঠিকে চাকরের কাজ করে। কারোই দুদণ্ড জিরোবার সময় নেই, নিজের নিজের কাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত। ছেলেপুলেরাও ভোর না হতেই হাঁড়ি নিয়ে কাঞ্জি আনতে লঙরখানায় ছোটে, বিকেলে ছাইয়ের গাদা থেকে আপোড়া কয়লা কুড়িয়ে আনে। শুধু একেবারে বাচ্চারাই উঠনে বসে চেঁচায়, খেলা আর মারামারি করে।

উঠোনে উনুনের ছাই, আবর্জনা, ময়লা জল সবাই ফেলে দিয়ে যায়, কিন্তু পরিষ্কার করবার কারো নামটি নেই। ময়লা জল মাঝখানে জমে বরফ হয়ে যায়! ছেলে মেয়েরা সন্ধ্যেবেলা কয়লা-অভিযান থেকে ফিরে এসে ঐখানেই খেলা করে। কেউ ধাক্কা মেরে কাউকে বরফের উপর ফেলে দেয় আর সবাই হো হো করে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। বাড়িখানা গম গম করে।

বাসিন্দের মধ্যে বুড়ো আর মেয়েদেরই ভারি কষ্ট। বুড়োদের পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড়ও জোটে না, সারাদিন ইঁট সাজিয়ে বিছানা করে তারই উপর গড়ায়। কখন সেই রাতে ছেলে ছোকরারা ফিরবে, তখন যদি কিছু

জোটে। তাও এমন কিছু পেটভরতি খাবার নয়—ফেনা ফেনা চারটি ভাত। কিন্তু তাও সবদিন জোটে না। মাঝে মাঝে তারা শুধু হাতেই ফিরে আসে। দিন এক তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। মেজাজ তো:তে'তেই থাকে, এসে সুবিধে পেলেই গলাবাজি শুরু করে। বেচারী বুড়োরা আর কি করবে? হালি পেটে গড়ায় আর কাঁদে। চোখের জল গড়িয়ে মুখে পড়ে।

মেয়েদেরও ভোগান্তির একশেষ! বুড়োদের আর বাচ্চা-কাচ্চাদের সামলাতে হয়, ওদিকে আবার ছোকরাদেরও মন জুগিয়ে চলতে হয়। তা মন জুগিয়ে না চললে কি হয়, রোজগার তো ওরাই করে। খাটুনির তাদের শেষ নেই, এমন কি পোয়াতি হলেও দুদণ্ড যে জিরোবে তারো উপায় নেই। খাবার তো ছাই খায়। সবাইকে দিয়ে-থুয়ে ওদের ভাগ্যে কোনোদিন বা একটু কাঞ্জি, কি এক আধখানা রুটি জোটে, কোনোদিন বা তাও জোটে না। শুধু খেটেই শান্তি নেই, সংসার চালাবার নানা ফিকির ফন্দি তাদের জানতে হয়। বরাতগুণে ভরপেট খেয়ে ছেলে বুড়ো সবাই যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে, তারা মুখ বুজে কেরোসিনের ডিবেটার কাছে বসে কাপড় কাচে, পিঠে তৈরী করে, কখনো বা ছুঁচসুতো নিয়ে সেলাই বা রিপু করতে বসে যায়। ঘরগুলো ছোট, দেয়াল গুলো কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের কনকনে হাওয়া একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘরের ভিতর সবাই ঠক ঠক করে শীতে কাঁপতে থাকে।

কাঁপবে না, গরম কাপড় জামার তো বালাই নেই। কোনোরকমে ছেঁড়া কাপড়ে সারা গা ঢেকে বসে থাকে। পেটেও তেমন কিছু গরম খাবার পড়ে না—খায় তো সামান্য জাউ। তার উপরে সাত আট মাসের পোয়াতি। এই গর্ভ নিয়েই ছেলেবুড়োদের তত্ত্বতালাসি করতে হয়। তাই এখানকার মেয়েরা সবাই হাড় জির-জিরে রোগা, তিরিশ না পেরোতেই তাদের মাথার চুল সব উঠে যায়। কিন্তু তবু কি জিরোতে পায়। এমনি করে এতদিন তারা রোগে ভুগে ভুগে একদিন মরে যায়। তখন শবাধারের জন্যে পুরুষরা চাঁদা তুলে আনে।

বাড়ন্ত মেয়েগুলিরই বা কি দশা! ষোল কি সতেরোয় পড়েছে, অথচ পরনে একটাও ভালো পায়জামা নেই। কোনোরকমে ছেঁড়া কানি জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে। ঘরের বাইরে তারা কচিৎ কখনো বেরোয়—ঐ অন্ধকার খুপরি যেন তাদের জেলখানা। ওখানে বসেই মাদের গৃহস্থালিতে সাহায্য করে, পুরুষদের কাপড় রিপু করে দেয়। এমন কি পায়খানায় যেতে হলেও চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। ছেড়া কানি পরে কার সামনে গিয়ে পড়বে কে জানে। তারপর চোরের মত পা টিপে টিপে পায়খানায় গিয়ে ঢুকে পড়ে। শীত এলে তো সূর্যের মুখই তারা দেখতে পায় না। এদের মধ্যে যারা কুশ্রী দেখতে তাদের

ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। মাদের মতোই বছরে বছরে তারা বিয়োবে, রোগে ভুগবে, তারপর একদিন মরে যাবে। যারা সুশ্রী তাদের অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তাদেরও ভাগ্য খুব ভালো নয়। বাপ মা তাদের কারো কাছে বিক্রি করে দিয়ে দাঁও মারবে সেই আশায় বসে আছে! তারপর তারা যেখানেই থাক না— বাপ মা আর খোঁজখবর নেবে না।

এমনি বাড়ির বাসিন্দে হয়ে বাঘিনী খুব খুশিই হয়েছে। খুশি হবে না? এবাড়িতে সে একাই পেট ভরে খেতে পায়, ভালো জামা কাপড় পরে, তার কোনো ভাবনাও নেই। সে যখন তখন পথে চক্কোর দিয়ে আসে, ইচ্ছে হলে বৌদ্ধ মন্দির বা অন্য কোথাও যায়। চলবার সময় যেন দেমাকভরেই সে চলে, কোনো দিকে যেন দৃষ্টি নেই। সে জানে নিজের জন্যই অবস্থা তার ভালো, নইলে সোয়ামির তো এক ফোঁটা মুরদ নেই—সে তো এদেরই সামিল। তাই সে এই গরীবলোকগুলোকে আমল দেয় না।

এবাড়িতে যেসব ফেরিওয়ালা আসে তারা শস্তা জিনিসই ফেরি করে। শুকিয়ে যাওয়া বাঁধাকপি, পাঁঠার ঠ্যাং, সয়াবিনের পাতলা ঝোল, ঘোড়া বা গাধার মাংস এই সবই নিয়ে আসে। এসব জিনিসের খদ্দের এমনিধারা গরীবের বস্তিতে যথেষ্টই মেলে। বাঘিনী এখানে আসার পর থেকে উঁচুদরের ফেরিওয়ালারাও আনাগোনা শুরু করেছে। তারা এসেই হাঁক দেয়; চাইগো ভেড়ার মাথা চাই, শুটকি মাছ চাই, চাই বিসকুট। বাঘিনী ফেরিওয়ালাদের হাঁক শুনলেই ছুটে আসে, হাতে থাকে ঝুড়ি। কিনে ফেরবার পথে বেশ দেমাক দেখিয়েই চলে হাড় জিরজিরে লোহার তারের মতো শুকনো ছেলেমেয়েগুলো আঙুল চুষতে চুষতে বাঘিনীর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়—যেন অন্য পৃথিবীর লোক এসে তাদের মধ্যে রয়েছে। বাঘিনী তাদের দেখেও দেখে না। সে তো আর এখানে খয়রাত করতে আসেনি যে, এদের দুঃখ দেখে গলে গিয়ে এই ন্যাংটো হাড় জিরজিরে পঙ্গপালগুলোকে পেট ভরে খাওয়াবে।

খুশির কিন্তু বাঘিনীর এই ব্যাভার ভালো লাগে না। সে গরীব, দারিদ্র্য কাকে বলে সে জানে। এই সব চোব্য চোষ্য খেতে তার বড় খারাপ লাগে—শুধু শুধু টাকা-গুলো জলে যাচ্ছে! দ্বিতীয়ত—সে বার বার বাঘিনীকে রিক্সা কিনে দিতে বলছে, কিন্তু বাঘিনী শুনেও শুনছে না। শুধু গাণ্ডেপিণ্ডে মাংস, শাকসব্জি আর ভাত গিলিয়ে গিলিয়ে তাকে নাদুস নুদুস করে তুলছে। সে যেন পোষা গাই—আরো দুধ পাবার জন্যে খাইয়ে খাইয়ে মোটা করছে। এখন কি আর সে আগের মতো তেমনি মরদ আছে, এখন বাঘিনীর হাতে একবারে ভেড়ুয়া বনে গেছে। খুশি এর আগে জীবজন্তুর ভিতরে এ ব্যাপার বহু দেখেছে: একটা রোগা মাদি কুত্তা হয়তো গরম হয়ে উঠে একটা জোয়ান

কুকুরের সঙ্গে পিরিত শুরু করে দিয়েছে। বাঘিনীও ঠিক মাদি কুত্তা, বেছে বেছে খুশিকে ধরেছে। ওকে সে নিঙড়ে নেবে, শুষে খাবে! একথা মনে হলেই খুশির নিজের জীবনের উপর ঘেন্না ধরে যায়। ছিঃ ছিঃ, এ সে কি করছে? খেটে খেতে হলে শরীরটাকে তো তাজা রাখতে হবে—ঐ তো তার একমাত্র পুঁজি। যদি সে এমনি করে খেয়ে ঘুমিয়ে নিজের জীবনীশক্তি নিঙড়ে নিঙড়ে ঐ মাদী কুত্তাটাকে খুশি করে —কদিন এমনি চলবে? বুড়ো বয়েসে তো হাড়কখানা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে করছেও তো তাই। তার খাঁচাটা তেমনিই আছে, তেমনি লম্বা চওড়া —কিন্তু তেজ বলতে আর কিছুই নেই। না বেশি দিন এমনি করে চলবে—না। খুশির বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। সে ঠিক করল, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, সে রিক্সাই টানবে। সারাদিন রিক্সা টেনে রাতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলে আর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। বাঘিনীর দেওয়া রকমারি খাবারও সে খাবে না, তার সারা রাতের দেহের ক্ষিধেও সে মেটাবে না। ঠিক তাইই সে করবে, বাঘিনীর জিভের সে পরোয়া করে না। যদি সে রিক্সা কিনতে টাকা দেয় ভালোই, না হয় তো ভাড়া করা রিক্সাই সে টানবে। বাঘিনীকে একথা ঘুণাক্ষরেও জানাবে না, জানলেই সে বাগড়া দেবে নিশ্চয়ই।

প্রথম চান্দ্রমাসের সতেরো তারিখে রিক্সা ভাড়া নিয়ে সে টানতে শুরু করল। কিছুক্ষণ রিক্সা টেনেই সে হাঁফিয়ে উঠল। মনে হোলো পা যেন আর চলছে না, গেঁটে বাত ধরেছে—পায়ের গিঁটে গিঁটে কামড়াচ্ছে। সে তার এই ব্যথার কারণ বুঝতে পারল, কিন্তু মনকে এই বলে প্রবোধ দিল: কুড়ি দিন কুড়ে হয়ে বসে থাকার ফলেই পাদুখানার অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে। আর কয়েকবার সোয়ারি নিয়ে ছুটলেই ও ব্যথা সেরে যাবে।

খুশি আবার একটা সোয়ারি পেল। চারখানা রিক্সা ভাড়া নিয়েছেন কয়েকজন ভদ্রলোক। এর মধ্যে তার খানিও আছে। সবাই রিক্সার হাতল দুটো তুলে নিল। এবার দলের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় তাকে আগে যেতে ওরা বলল। লোকটির বছর চল্লিশেক বয়েস হয়েছে, বেশ লম্বা চেহারা। লোকটি একটু হাসল, সে জানে এই তিন ছোঁড়া তাকে হারিয়ে দেবেই। তবুও বয়েসের দোহাই দিয়ে পিছনে পিছনে ছুটতে সে রাজি নয়। সেই প্রথম ছুটল, পিছনে পিছনে চলল তিনখানা রিক্সা। এক মাইলের প্রায় তিনভাগের একভাগ যখন তারা এসেছে, তখন ছোকরাদের ভিতরে একজন চেঁচিয়ে উঠল, বাবা! কি পাইপাই করে ছুটছে দেখ না! অ-বুড়ো, তুমি কি নিজের কেরামতি দেখাচ্ছ নাকি ভাই? তুমি আমাদের ভিতরে সেরা বলেই আমরা মেনে নিলুম।

সত্যি, লোকটা বেশ জোরেই ছুটতে পারে। খুশির মতো তাগড়া জোয়ানেরও তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দৌড়বার ঢঙ্ দেখ না! খুব ঢ্যাঙা কিনা তাই কোমর একটু বেঁকে যায়নি। সে দৌড়াচ্ছে বলেই যেন মনে হচ্ছে না—যেন সামনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে। পাছা দুলছে, পা পথের উপর দিয়ে যেন পিছলে চলেছে, সমস্ত শরীরটা পড়েছে সুমুখে ঝুঁকে। এমনি করে তাড়াতাড়ি চলা যায় বটে, কিন্তু তাতে শক্তিও খুবই ক্ষয় হয়। লোকটা এবার মোড় ফিরল, শুধু মনে হোলো সমস্ত শরীরটাই যেন ঘুরে গেল। বেচারার অবস্থা দেখে ছোকরাদের কেমন মায়া হোলো। আহা, লোকটা রিক্সা আর সোয়ারি গেল কি রইল চেয়েও দেখছে না! তার একমাত্র চিন্তা এগিয়ে সে যাবে, এগিয়ে তাকে যেতে হবে, এমন লোককে দেখে মায়া কার না হয়!

ঠিকানায় পৌঁছে সে থামল। সারা গা ঘামে নেয়ে উঠেছে, কপাল, নাক, মুখ বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে, রিক্সার হাতল দুটো রেখে সে সিধে হয়ে দাঁড়াল। পয়সা নেওয়ায় ওরা দেখতে পেল তার হাত কাঁপছে, হাতের মুঠোয় পয়সা কটা পর্যন্ত চেপে ধরবার শক্তি যেন আর তার নেই।

ওরা এবার রিক্সা রেখে গল্প গুজবে মশগুল হয়ে উঠল। সোয়ারি পেলে আবার নিয়ে ফিরবে এই ওদের মতলব। খুশিও অন্য সবার মতো ঘাম মুছতে মুছতে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠল। শুধু ঢ্যাঙা লোকটার ঘাম ঝড়া তখনো থামেনি, তার উপরে সে কাশতে শুরু করল। শুকনো কাশি, খন খন করে শব্দ উঠছে—মুখ থেকে দলা দলা কফ থু থু করে ফেলছে। খানিকক্ষণ কাশবার পর সে একটু সুস্থ হয়ে ওদের বলল:

আরে আমার তো হয়ে এসেছে। আমার পা আর পিঠে আর একফোঁটাও জোর নেই। যতোই চেষ্টা করি না কেন, এখন আর তেমন ছুটতে পারি না। ভারি কষ্ট হয় ভাই।

এই ক'পা তো এলাম ভাই—তোমাদের কিছুই হয়নি—যেন বেড়াতে বেড়াতে এলে—কি তাই না? বছর বিশেকের একটা বেঁটে ছোঁড়া বলে উঠল, তা যদি বল কর্তা, আমাদের এই তিন মরদের কিছুই হয়নি। আমরা মজবুত লাঠি, অতো সহজে কি আর নুইয়ে ফেলতে পারে!

বুড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বেঁটে ছোকরাটা আবার জিজ্ঞেস করল। আচ্ছা কত্তা, তুমি অতো সামনে ঝুঁকে পড়ে রিক্সা টানো কেন?

আর একটা ছোকরা বলল: না না, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। আমার মনে হয় বয়েস হয়েই তুমি কাবু হয়ে পড়েছ।

ঢ্যাঙা লোকটা হেসে মাথা নাড়ল। আরে বয়স আমার এমন কি বা হয়েছে? শুধু বয়েসের দোষ নয়রে ভাই। একটা হক কথাই তাহলে বলি: আমাদের এ লাইনে যারা আসে তাদের বিয়ে করতে নেই। এ খুব সত্যি কথারে ভাই, খুব সত্যি কথা! ঢ্যাঙা লোকটা থেমে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। সবাই কান খাড়া করে আছে। এবার চাপা গলায় বলল: একবার বিয়ে করলেই, দিনে রাতে তোমার তাগদ বেশ কিছু খরচ হবেই— তারপর এমন দিন আসবে যখন তুমি একেবারে ফোঁপরা হয়ে যাবে। এই আমার শরীরটার দিকেই তাকিয়ে দেখ না—কি আছে শরীরে? দৌড়তে কষ্টই হয়। তার উপর দমকে দমকে কাশি তো আছেই। বেশি কাঁদুনি গেয়ে আর কি হবে—তাই বলি, এ লাইনে এসে কেউ বিয়ে কোরো না, এমনকি চড়ুই পাখীও জোড় বেঁধে থাকে, কিন্তু আমরা জোড়া বাঁধলেই দফা রফা!

হাঁ, আর একটা কথা। বিয়ে করলেই তো বছরে একটা করে বাচ্চা হবে। এই তো আমারই পাঁচটা হয়েছে। সবগুলো গিলবার জন্যে মুখ হাঁ করেই আছে। কিন্তু হাঁ বোজাব কি দিয়ে? রিক্সার ভাড়া বেশ চড়া, বাজারে ধান চালও আক্রা ব্যবসায় মন্দা—কোন দিক সামলাব বল তো? ওঃ বিয়ে করে কি বেকুফি কাজই করেছি। এর থেকে সারা জীবন একা কাটানোই ভালো ছিল। শরীর কখন-সখন গরম হয়ে উঠলে 'সাদা বাড়ি'তে কাটিয়ে এলেই তো চুকে যেত! সেখানে পয়সা ফেললে যত্ন-আত্তি সবই পাওয়া যায়। হাঁ, তারপর গায়ে পারা ফুটে উঠলে আর কি করবে? সে তো বরাতের ব্যাপার। আর একা মানুষের মরতেই বা ভয় কি? নিজে চোখ বুজলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু বিয়ে করলে তো আর তা হবে না। তখন নিশ্চিন্তে চোখ বুঝতেও তুমি পাবে না। কি সাঙাত, ঠিক বলিনি? খুশির দিকে সে তাকাল?

খুশি শুধু মাথা নাড়ল, মুখে কিছু বলল না।

এইবার একজন সোয়ারি এল। বেঁটে ছোকরাটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরদাম ঠিক করে নিয়ে ঢ্যাঙা লোকটাকে বলল, ও বড় ভাই, সোয়ারি নিয়ে চলে যাও। তোমার ঘরে পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা আছে—তোমারই তো বেশি দরকার!

ঢ্যাঙা লোকটা হাসল। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই রাখলাম। কিন্তু অন্য সময় হলে এ সোয়ারি আমি নিতুম না। যাক বাড়ি গিয়ে কাচ্চা-বাচ্চাদের মুখে তবু কিছু দিতে পারব। আচ্ছা ভাইসব, আবার দেখা হবে।

ঢ্যাঙা লোকটি মিলিয়ে গেল। বেঁটে ছোকরা আপন মনে বিড়বিড় করে বলল— বেজন্মা—বেজন্মা! সারা জীবন ধরে খেটে খেটে মর, অথচ একটা [illegible]

সঙ্গে ঘর করবারও যো নেই—আর অন্যেরা কি ফুর্তিই না লুটছে! বেজন্মা—বেজন্মা বেটারা! এক একজন চারটে পাঁচটা মাগী নিয়ে মজা লুটছে!

অন্যে কি করছে তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন? আর একজন বলল। আমরা যে লাইনে আছি, এখানেই সারাজীবন পড়ে থাকতে হবে। ঢ্যাঙা ভাই আমাদের ঠিকই বলেছে। আচ্ছা তুমি কি জন্যে বিয়ে করতে চাও বলো তো? বিয়ে করে বউকে তো আর গয়না বা খেলনার মতো গোপনে কোথাও রেখে দেবে না নিশ্চয়ই? আর এইখানেই বিপদ বাধবে। সারাদিন কিইবা আমরা খাই—ফেনা ফেনা ভাত আর কখনো শুকনো বিস্কুট। তাতে কতটুকুই বা তাগদ হয়? দুদিক থেকে যদি তার উপর টানা হেঁচড়া চলে তাহলে কতদিন আর কোমর সিধে করে দাঁড়াতে পারব? নাহে ঢ্যাঙা লোকটা ঠিকই বলেছে। রিক্সাওয়ালার জন্যে ওসব বিয়ে-টিয়ে নয়।

খুশি রিক্সার হাতল তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি দক্ষিণ মুখো চললাম। এদিকে আর সোয়ারি মিলবে না। কতক্ষণই বা এমনি বসে থাকব বল?

আচ্ছা, আবার দেখা হবে। ছোকরা দুটি বলল।

খুশি তাদের কথা শুনতে পেল না, আনমনে সে চলতে লাগল। তার কোমর এখনো কনকন করছে। সে ঠিক করল, আজকের মতো আর সে সোয়ারি নেবে না। কিন্তু যাবে কোথায়? বাড়ি ফিরতে সাহস হচ্ছে না। সেখানে মাদী কুত্তাটা বসে আছে যে। সে যেন রূপকথায়-শোনা রাক্ষসীর মতো রাতে নিঃসঙ্গ মানুষদের ঘরে ঢুকে রক্ত চুষে খায়; যৌবনের কুয়ো এক চুমুকে শুকিয়ে যায়। তারপর মানুষগুলোর যা দশা! তারা পাগল হয়ে যায়, বিড়বিড় করে বকে।

আজকাল দিন বেশ বড়। শহরের এদিক থেকে ওদিক কয়েকবার সে টহল দিল, কিন্তু এখন সবে পাঁচটা। সে একটা দোকান থেকে মাংসের কচুরী আর এক ভাঁড় কাঞ্জি কিনে খেল। তারপর বাড়ির পথ ধরল। বাড়ি গেলেই তো মাথায় বাজ পড়বে, কিন্তু তার জন্যে বিশেষ চিন্তা নেই। বাঘিনীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি সে করবে না, রেগে উঠবে না; গিয়েই সটান বিছানায় গা এলিয়ে দেবে, ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর আবার ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়বে। বাঘিনী যা খুশি তাই করুক না, সে তার এই নিয়ম ভাঙবে না।

বাড়ি এলে সে দেখল, বাঘিনী বাইরের ঘরে বসে আছে। বাঘিনী একবার তার দিকে তাকাল। থমথমে মুখ, এখুনি হয়তো ধারা নামবে। খুশি ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে দুএকটা কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পারবে কেন—ছলছুতো তার তো আর রপ্ত নেই। সে টুঁশব্দটি না করে ভিতরের ঘরে ঢুকে পড়ল। বাঘিনীও

রিক্সাওয়ালা

চুপচাপ—ঘরতো নয় যেন পাহাড়ের গোপন কন্দরে এক অতি পুরানো গুহা। বাইরে উঠোন থেকে কাশির শব্দ, ছেলেমেয়েদের কান্না স্পষ্ট ভেসে আসছে, কিন্তু মনে হচ্ছে বহুদূর থেকেই আসছে—এ যেন পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনি জাগছে।

প্রথমে কে কথা বলবে এই নিয়েই সমস্যা। দুজনে দুজনের বিছানায় গা এলিয়ে দিল, মুখ এখনো বোজা, মনে হচ্ছে এক জোড়া প্রকাণ্ড কচ্ছপ গুটিসুটি মেরে বসে আছে। প্রথম রাতের ঘুম ভাঙতে বাঘিনীই প্রথম কথা বলল। তার স্বরে ঠাট্টা আর রাগ মেশানো।

কোথায় গিছলে? কোন চুলোয় ছিলে সারাদিন?

রিক্সা টানছিলাম। খুশি যেন আধ-জাগন্ত অবস্থায় বলল। বলতে পারছে না, গলায় কি যেন বিঁধে আছে।

ঘামে জবজবে হয়ে না এলে চলবে কেন? এসব লোকের নজর আর কত উঁচু হবে? রেঁধে-বেড়ে রাখলুম, তা একবার দেখাও দিলে না। রাস্তায় টো টো করে ঘুরে এমন কি রাজ্যি জয় করে এলে বাপু? দেখ, আমাকে চটিও না! বাবা, আমার যেন উঁচোন মুগুর কারো ঘাড়ে পড়লেই হোলো—আমি তো তারই মেয়ে, হেন কাজ নেই আমি করতে পারি না। কাল যদি আবার আজকের মতো বেরোও, এসে দেখবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছি। হাঁ, যা বললাম, তাইই কিন্তু করব।

তাই বলে কুড়ে হয়ে বসে থাকব নাকি?

বুড়োর কাছে যাওনি কেন?

সেখানে আমি যাব না।

ওঃ যাবে না! এক পয়সার মুরোদ নেই, আবার তেজ দেখ না!

খুশি রাগে ফুসে উঠল।

আমি রিক্সা টানব, নিজে রিক্সা কিনব এই আমার ইচ্ছে। কেউ বাধা দিলে একদিকে চলে যাব, আর ফিরব না।

ও,—ও-ও—বাঘিনীর নাকটা কুঁচকে গেল। তার গর্ব, খুশির উপর তার ঘৃণা ঝরে পড়ল তার স্বরে, আবার মনে ভয় হল। খুশি বোকা হলে কি হবে খুব একরোখা। এসব লোক ঠাট্টা করে কখন কিছু বলে না। হাতের মুঠোয়ও তাদের পোরা যায় না। সেদিক দিয়ে খুশি সত্যই আদর্শ। স্বভাব ভালো, উড়নচণ্ডি নয়, তাছাড়া তাগড়াই জোয়ান। তারও তো তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এই বয়সে খুশির মতো আর একটি লোক সে জুটিয়ে নিতে পারবে না।

খুশির মতো মানুষকে বশে রাখবার ওষুধ হচ্ছে, এই গরম, আবার পর মুহূর্তেই নরম হয়ে যাওয়া। বাঘিনী গরম হয়ে উঠেছিল, এবার সে তুলো বা সোলার মতোই নরম হয়ে যাবে।

আমি তো জানি, কত আশা তোমার, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবে, বড় হবে। কিন্তু কেন যে রেগে উঠি, তুমি বোঝ না। আমার ভাবনা তো তোমার জন্যেই। তুমি যদি বুড়োর কাছে না যেতে চাও, আমিই যাবখন। হাজার হলেও তো আমি তার মেয়ে, একটু-আধটু গালাগাল দিলেও আমার সইবে

বুড়োর ওখানে যদি ফিরেও যাই, তবু আমি রিক্সা টানব। খুশি বোঝা-পড়া করে নিতে চাইল।

বাঘিনী বহুক্ষণ কোনো কথা বলল না। খুশি যে এত চালাক একথা সে কোনোদিন ভাবেইনি। যত সরল ভাবেই বলুক, বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাঘিনীর চাতুরি সে ধরে ফেলেছে। না, একেবারে বোকা গাধা নয়। বাঘিনী একটু খুশিই হয়ে উঠল। তাকে এমন জোয়ান মরদের রাশ টেনে রাখবার জন্যে বেশ বুদ্ধিই খরচ করতে হবে। কখন একগুঁয়ে খচ্চরের মতো পা ছুঁড়তে শুরু করবে কে জানে! বেশি কড়া হলে চলবে না—এটা ফসকে গেলে আর একটা এমনি জোয়ান মরদ জোটানো শক্তই হবে। অমন করে মুঠোয় পুরে রাখলে তো চলবে না, মাঝে মাঝে একটু মুঠো আলগা করতে হবে, সোহাগ ঢেলে দিতে হবে, তবে তো মানুষটা কাছে থাকবে।

বেশ তো রিক্সাই যখন টানতে চাও, আমি কি আর তোমাকে বাধা দেব। কিন্তু একটা পিতিজ্ঞে করতে হবে, মাস-মাইনের কাজ নিতে পারবে না—সন্ধ্যেয় ঠিক বাড়ি ফিরে আসবে। তুমি ভেবে দেখ না গো, সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে সন্ধ্যেয়ও যদি তোমার দেখা না পাই, তাহলে যে পাগল হয়ে যাব। শুধু বল, সন্ধ্যেয় তুমি বাড়ি ফিরে আসবে, বলো বলো?

ঢ্যাঙা লোকটার কথা খুশির মনে পড়ল। খুশি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অন্ধকার জমে উঠেছে, কতো রিক্সাওয়ালা চলেছে পথে। ওরা নিজেদের শক্তি বেচে খায়। সবল তাদের দেহ, পিট বেঁকে যায়নি, ওরা যেন উড়ে চলে। রাতে তারা মাংসপিণ্ড চটকে শক্তি ফুরিয়ে ফেলে না। খুশিও একদিন তাদের মতোই হবে। কিন্তু আজ বাঘিনীকে চটিয়ে লাভ নেই। সে শুধু রিক্সা টানতে পেলেই খুশি।

মুখে যাই বলুক না কেন বাঘিনীরও ন'কর্তার কাছে যেতে তেমন সাহস হোলো না। যখন এক বাড়িতে থাকত, বাপ-বেটিতে অষ্টপ্রহর ঝগড়াই চলত, এখন তো ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। এমন এক কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে, যাকে দুটো কথার ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাছাড়া বাঘিনী এখন আর লিউ-পরিবারের কেউ নয়। যে মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে একবার স্বামীর ঘর করতে চলে গেল, সে তো পর হয়েই গেল—আর কি বাপের সঙ্গে সে সম্বন্ধ তার থাকে? বাঘিনী বাপের বাড়ি হুট করে গিয়ে

হাজির হতে সত্যি সাহস পেল না। মামলাবাজরা যেমন মামলার সমস্ত কাগজ্-পত্র জোগাড় না করে হাকিমের এজলাসে গিয়ে দাঁড়ায় না, তারও হোলো সেই অবস্থা।

ধর, বুড়ো যদি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে দূর করে দেয়, মেয়ে বলে তাকে স্বীকার না করে? না, তার অবিশ্যি কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তবু মন্দটাই তো আগে ধরে রাখতে হয়। বাঘিনী তখন কি করবে? এক ঝগড়া সে করতে পারে, কিন্তু তাতে তো আর বুড়োর শক্ত মুঠো থেকে একটা পয়সা গলবে না—চেঁচানোই সার হবে। কেউ যদি তার হয়ে সালিসী করতে এগিয়ে আসে, তাহলেও খুব সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। বুড়ো যা একরোখা, কোনো কথা শুনবে না। তাকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে। বাপের বাড়িতে আর তার জায়গা হবে না।

খুশি বহুক্ষণ বেরিয়ে গেছে। বাঘিনী ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগল। তিন-চারবার সে তোড়ঙ্ থেকে জামা-কাপড় বার করল; সেজেগুজে বাপের কাছে সে যাবেই! কিন্তু আবার গুছিয়ে বাক্সে রেখে দিল—যাওয়ার ইচ্ছে তার খুবই আছে, অথচ ভয়ও পাচ্ছে। এ এক উভয়-সঙ্কট। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে হলে বাপের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার আর উপায় নেই; আবার আত্মসম্মানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফিরে যেতে সে পারে না। এখন সে কি করবে? বাঘিনীর একবার মনে হোলো, বুড়োর রাগ হয় তো এতদিনে পড়ে গেছে, এখন সে যদি খুশিকে নিয়ে মানবমিলনে গিয়ে হাজির হয় তাহলে বুড়ো তাদের আদর করেই ডেকে নেবে। হাজার হলেও নিজের মেয়ে তো বটে—কত দিন আর রাগ থাকে? তাহলে তো চমৎকার হয়! খুশির একটা হিল্লে হয়ে যায়, আর সেও বুড়োকে তোয়াজ করে ব্যবসাটা নিজের হাতে আনতে পারে।

ভাবনার স্রোত এইখানে এসেই ধাক্কা খেল। এ যেন এক বিদ্যুৎ-চমক, সারা মনে ছেয়ে গেছে ঠাণ্ডা আলোর বন্যা। তার বুকখানা কেঁপে উঠল। বুড়ো যদি শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়, তাহলে কি হবে? তার তো মুখ রইল না। আর শুধু কি তাই? মাথা হেট করে চিরদিন রিক্সাওয়ালার বৌ হয়ে তাকে কাটাতে হবে! সে রিক্সাওয়ালার বৌ—ফুঃ। তখন আর বাড়ির বাসিন্দেদের কাছে দেমাক দেখানো চলবে না—সে তো তখন ওদেরই সামিল হয়ে যাবে। বাঘিনী চোখে আঁধার দেখল, তার মন কালি-পড়া এনামেলের বাসনের মতো হয়ে গেছে। ইস্ কি কুক্ষণেই সে খুশিকে বিয়ে করেছে! ছোকরার যতই শক্তি সামর্থ্য থাক না, বাপ যদি ফিরে না তাকায়, তাহলে আজীবন ওকে রিক্সা ঠেলেই কাটাতে হবে, আর সে হবে ঐ রিক্সাওয়ালারই বৌ।

বাঘিনী শিউরে উঠল। না না, রিক্সাওয়ালার বৌ হয়ে ঐ অন্ধ কুঠরিতে সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে না! তার চাইতে খুশির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিলে কেমন হয়? তা আর এমন শক্ত কি? ছুরি দিয়ে একটা দড়ি কেটে দুভাগ করার মতোই সোজা। তারপর সে একাই বাপের কাছে ফিরে যাবে। খুশির জন্যে সে সবকিছু হারাতে রাজি নয়। বাঘিনী আবার ভাবতে লাগল— ভাবনার সুতো খুলে খুলে আসছে। না, খুশিকে ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। খুশির সঙ্গে এই কদিন কাটিয়ে যে সুখের আস্বাদ সে পেয়েছে, ভাষায় তাকে রূপ দেওয়া যায় না। বাঘিনী বিছানায় বসে পড়ল। শূন্য তার দৃষ্টি স্পর্শের স্মৃতি ভিড় করে এসেছে মনে— গোধূলীর মতোই আবছা—সে স্মৃতি বিয়ের পরে যে অনাস্বাদিত সুখ পেয়েছে তারই রোমন্থন চলেছে। এসুখ তো খুঁজলে মেলে না—এ যেন এক কল্পনা, এক সুগন্ধ, যার নাম নেই, যাকে বর্ণনা করা যায় না। এতদিন তার দেহ ছিল যেন এক গুচ্ছ আধফোটা কুঁড়ি, সূর্যবীজের সোহাগ পেয়ে দলে দলে পাপড়ি মেলেছে।

না, খুশিকে সে ছেড়ে দিতে পারবে না! তার যখন মরজি হয়েছে, রিক্সাই সে টানুক। এমনকি পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়ালেও খুশির সঙ্গেই সে থাকবে। অসুবিধে পোয়াতে হলে হবে, উপায় কি? দেখ না, এই বাড়ির বাসিন্দে মেয়েদের দিকেই তাকিয়ে দেখ না! তারা যদি দুঃখ দারিদ্র্য মুখ বুজে সয়ে যেতে পারে, সেইবা পারবে না কেন? হাঁ, সেও পারবে। তারপরও যদি খুশি কোনোদিন তাকে ছেড়ে চলে যায়, তাহলেও সে বাপের বাড়ির চৌহদ্দি মাড়াবে না। বাপ বুঝুক, বাঘিনীও তেজে একেবারে কম যায় না!

এদিকে খুশির অবস্থাও বাঘিনীরই মতো। মানবমিলন ছেড়ে আসার পর থেকে সে আর পশ্চিমে শান্তির দরজার রাস্তাই মাড়ায়নি। রিক্সা নিয়ে সে এখন শহরের পুবদিকে যায়। মানবমিলনের রিক্সাওয়ালারা কাজে এদিকে বড় একটা আসে না বলেই সে এই দিকটা বেছে নিয়েছে। দেখা হলে সেই তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করে তুলবে, প্রশ্ন না করলেও তাদের দেখে খুশি লজ্জাই পাবে। কি দরকার ওসব হাঙামায়! তার চেয়ে পুবদিকটাই ভালো। পুবেই সে ভাড়া খাটবে।

আজ কিন্তু রিক্সা রেখে সে হাঁটতে হাঁটতে মানবমিলনেই এসে পৌছল। ফটকের সুমুখ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াল! বাঘিনীর কথাগুলো সে ভুলে যায়নি। তার মনে হোলো, একবার ভিতরে গিয়ে বাঘিনীর কথাগুলো পরখ করে দেখলে কেমন হয়! টুপিটা সে চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে রাস্তার ওপাশে চলে গেল। তার মনে একমাত্র ভয়, তাকে যদি কেউ চিনে ফেলে।

দূর থেকে সে রিক্সা শেডের আলোটা দেখতে পেল। ভরে উঠল তার মন, ভিড় করে এল পুরনো দিনের স্মৃতি। প্রথম দিনের কথা তার মনে পড়ল—গাঁয়ের ছেলে যেদিন মানবমিলনে এসে আস্তানা গাড়ল; তারপর এলো বাঘিনীর প্রলোভন; বুড়োর জন্মদিনের স্মৃতিও ভেসে উঠল তার চোখের সুমুখে। স্মৃতি তো নয় যেন হাজার হাজার পট তার চোখের সুমুখে কে যেন দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে, কিছুই তার নজর এড়াচ্ছে না—সব সে দেখতে পাচ্ছে। এই ছবির প্রদর্শনীতে বহু পুরনো দিনের ছবিও আছে—সেই পশ্চিম পাহাড়, উটের সার, চাও-বাড়ি, গোয়েন্দা—সবই সে দেখতে পাচ্ছে। একটুও তারা আবছা হয়ে যায়নি, বরং এত জীবন্ত যে দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। জীবন্ত—জীবন্ত ছবির প্রদর্শনী! খুশির মাথাটা ঘুরে গেল। বাস্তব যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, স্বপ্ন এসে কায়েম হয়ে বসেছে সেখানে। অনিশ্চয়তা বাস্তবের পথ রোধ করে রয়েছে। সে হতভম্ব হয়ে গেল। স্মৃতি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে তার মুখে—তাকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

খুশি তার ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলল। আবার তার মনে পড়ল নিজের কথা। প্রশ্ন জাগল, সেইবা কেন এত অত্যাচার অবিচার সইবে জীবনে? উত্তর খুঁজে পেল না। তার মনে হোলো, বহুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের স্রোত যেন তার চারপাশে বদ্ধজলার মতো থই থই করছে, বয়ে যেতে পথ পাচ্ছে না। তার নিজের বয়েসের হিসেবও গুলিয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে মানবমিলনে সে যখন এসেছিল, তার অনেক, অনেক অনেক বেশি বয়েস বেড়ে গেছে। তখন ছিল আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যম, এখন আছে শুধু ভয়। এইতো ছবির পর ছবি ভেসে উঠছে তার চোখের সুমুখে, কিন্তু তারা কি আশা নিয়ে এল? না, না, আশা তো নয়ই, নিরাশা—শুধু নিরাশা!

মানবমিলন দেখা যাচ্ছে; ইলেকট্রিক আলোটা আলো ছড়াচ্ছে। কি জোরালো আলো! একটা ঘেরাটোপ নেই যে ওর চোখ-ধাঁধানো আলো একটু কমিয়ে দেয়। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কেঁপে উঠল বুক। ফলকের উপর সোনালি লেখাগুলো কিরকম বদলে গেছে যেন। সে হরফ চেনে না, পড়তেও পারে না—কিন্তু এই হরফ চারটের প্রথমটা তার বহু পরিচিত। যেন দুখানা লাঠির ডগা দুটো নুয়ে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। ঠিক ত্রিভুজ হয়নি, কিন্তু আর একটা দিক জুড়ে গেলেই হোতো। এই হরফটার মানে হচ্ছে 'মানব'। কিন্তু তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। মানবমিলনের নামই পাল্টে গেছে। খুশি কোনো কারণই খুঁজে পেল না। সে আবার পুব ও পশ্চিমের ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে দেখল—এই দুটো

ঘরের স্মৃতি জীবনে সে ভুলতে পারবে না। কিন্তু ব্যাপার কি? দুটো ঘরই বন্ধ, একটা আলো পর্যন্ত নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে বিরক্ত হয়ে গেল! মাথা নিচু করে এবার পথ চলতে শুরু করল। তখনো তার মাথার ভিতরে ভাবনা ফুট কাটছে; ব্যাপারটা কি, মানবমিলন লাল বাতি জ্বালালো নাকি? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? সে ঠিক করল, ভাই-বেরাদারদের কাছ থেকে ধীরে সুস্থে কথাটা জেনে নেবে, সব না জেনে বাঘিনীকে জানানো ঠিক হবে না।

বাড়ি ফিরে সে দেখল, বাঘিনী বসে বসে তরমুজের বীচি চিবুচ্ছে, কি আর করবে —একা একা সময় কাটাতে তো হবে।

আবার দেরি করে ফিরলে? বাঘিনী খেঁকিয়ে উঠল। তুমি যদি এমনি ব্যাভার শুরু কর, তোমার সঙ্গে থাকা পোষাবে না বাপু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরুলেই দিন কাবার করে ফিরবে? এদিকে মরণ হয়েছে আমার। ঘর আগলে বসে থাকতে হয়—চারদিকে সব চোর ভিখিরীর দল—কখন কি নিয়ে যায় ঠিক নেই। একটু নড়বারও উপায় নেই, কারো সঙ্গে যে দুটো কথা বলে সময় কাটাব, তারও কি ছাই জো আছে। বলে দিচ্ছি বাপু, এ আমি সইব না, আমি কাঠের পুতুল নই!—যা হয় কর—আমি এসব সইতে পারব না।
খুশি টু শব্দটি করল না।

চুপ করে রইলে যে? না হয়, মুখের কথাই একটা খসাও, শুনে কৃতার্থ হই! তুমি কি আমাকে রাগাতে চাইছ নাকি? ঠোঁট নেই, কথা বলতে পারছ না? কি, কি হোলো তোমার? কলের বন্দুক থেকে যেমন অবিরাম গুলী-বৃষ্টি হতে থাকে তেমনি একটার পর একটা ঝাঁঝালো কথা বাঘিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

খুশি কি বলবে, ভেবে পেল না।

এস এক কাজ করা যাক, রাগে সে আর কথা বলতে পারল না, হঠাৎ থেমে গেল। কিন্তু এই প্রচণ্ড রাগের ভিতরেও এইটুকু বোঝা গেল, বাঘিনীর এখন আর খুশি ছাড়া অন্য উপায় নেই; যেভাবে হোক খুশিকে আঁকড়ে ধরেই তাকে থাকতে হবে। বাঘিনী কান্নায় ভেঙে পড়ল না, জোর করে হাসিও সে মুখে টেনে আনল না। তার মুখ দেখে মনে হোলো আগুন ধুঁইয়ে উঠছে বটে, কিন্তু জ্বলে উঠবার উপায় নেই।

দুখানা রিক্সা কিনে ভাড়া খাটালে কেমন হয়? তোমাকেও আর টো টো করে ঘুরতে হবে না, রিক্সা ভাড়া থেকেই আমাদের দুজনের চলে যাবে। কি, তাই করবে নাকি?

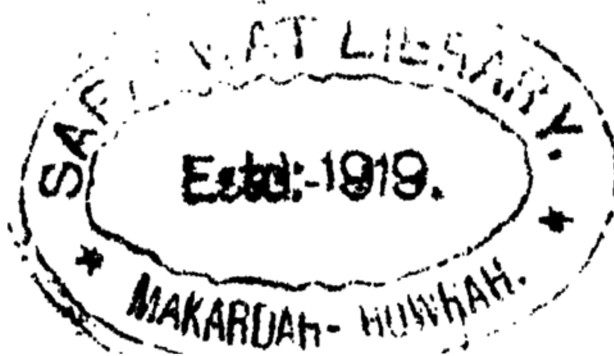
দুটো রিক্সা ভাড়া খাটালে কত আর রোজগার হবে—বড় জোর তিরিশ-
য়িতিরিশ সেণ্ট—তাতে কি আর কুলোবে? তার চাইতে একটা তুমি ভাড়া
াটাও, আর একটা আমি টানবোখন—তাতে আমাদের বেশ চলে যাবে। খুশি
ুব আস্তে আস্তে অথচ স্বাভাবিক ভাবেই বলল। রিক্সা কেনার কথা শুনে সে
ব ভুলে গেছে, মন আনন্দে ভরে গেছে।

ওঃ, তাহলে তো তোমারই সুবিধে! বাড়ি আরো দেরি করে ফিরবে।

না, না, দেরি করে ফিরব কেন? রিক্সা কেনার কথা শুনে খুশির মাথায় বহু ফন্দি এল। ধর: একখানা রিক্সা আমরা ভাড়া খাটালাম, আর একখানা রিক্সা নিয়ে আমি ভোরে বেরিয়ে যাব, তিনটের ভিতরেই ফিরে আসব, তারপর সেখানাও কাউকে ভাড়া দিয়ে দেব। কোনোদিন বা ভোরের দিকটা ভাড়া দিয়ে রাতের দিকটা নিজেই টানব—তোমার কি মনে হয়—মতলবটা ভালো নয়?

বাঘিনী মাথা নাড়ল। দাঁড়াও, ভেবে দেখি। অন্য কোনো মতলব মাথায় না এলে, তখন তোমার বুদ্ধি মতোই চলব।

খুশির খুব আনন্দ হোলো। এই মতলবটা যদি কাজে খাটানো যায়, তাহলে সে আবার নিজের রিক্সা নিজেই টানতে পারবে। অবিশ্যি, পরিবারের টাকায় কেনা রিক্সা তো আর নিজের নয়, সেকথা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু কিছু কিছু টাকা জমিয়ে নিজের একখানা রিক্সা কিনতে কদিন লাগবে তার? তার মনে হোলো, বাঘিনীরও মূল্য আছে বইকি। হঠাৎ খুশি বাঘিনীর দিকে তাকিয়ে হাসল—সহজ, স্বাভাবিক হাসি, একটুও কৃত্রিমতা সেখানে নেই। সব দুঃখ দারিদ্র্য যেন কলমের খোঁচায় খতম হয়ে গেছে, পুরনো পৃথিবীর বুকে জেগেছে নতুন জীবন। পুরনো পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরবার মতোই অতি সহজ আর সুন্দর এই পরিবর্তন।



সতেরো

খুশি মানবমিলনের ব্যাপারটা বহুলোককে জিজ্ঞেস করে তবে জানতে পারল। এক একজন এক একরকম বলল, কিন্তু তাদের সেই টুকরো টুকরো গল্পগুলি জোড়া-তাড়া দিয়ে আসল ব্যাপারটা সে আঁচ করে নিল। ন'কর্তা লিউ কতগুলি রিক্সা বিক্রি করে ফেলেছেন, বাকিগুলো আর এক আস্তানার মালিকের হেফাজতে রেখে দিয়েছেন। খুশি বুঝতে পারল, এই বুড়ো বয়েসে সাহায্য করবার লোক না পেয়েই তিনি একাজ করেছেন। কিন্তু বুড়ো কোথায় গেল? খুশি বহু চেষ্টা করেও সে খোঁজ পেল না।

বুড়ো উধাও হয়েছে জানতে পেরে খুশি খুশি হবে কিনা ভেবে পেল না। খুশি হবার কারণ আছে বই কি! বাঘিনীর আর জারিজুরী খাটবে না! এতদিন বাপের পয়সার দেমাকে সে খুশির রিক্সা টানায় বাধা দিয়েছে। এবার হোলো তো! বুড়ো একটা পয়সা না ঠেকিয়ে সরে পড়ল! কোথায় থাকবে বাঘিনীর দেমাক, আর নানা ফন্দি ফিকির? এখন সে নির্বিঘ্নে রিক্সা টেনে নিজের রুজি রোজগার করতে পারবে, কেউ বাধা দেবে না। আফশোষও হোলো। ন'কর্তার এতগুলো টাকা একেবারে উড়ে গেল! বাঘিনীর হাতে একটা কানা কড়িও এল না!

যাক গে, যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? অতগুলো টাকা হাত-ছাড়া হওয়ায় একটু আফশোষ হয়তো হতে পারে, কিন্তু মনে কোনো ধাক্কাই লাগেনি। যতদিন তার শক্তি আছে, নিজের রুটি সে রোজগার করে খাবেই। কোনোরকম ভণিতা না করে সে বাঘিনীকে সবকথা খুলে বলল।

বাঘিনী কথাটা শুনে একেবারে ভেঙে পড়ল। সে বুঝতে পারল, আর কোনো আশা নেই। ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেছে। এখন রিক্সাওয়ালার বৌ হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া তার আর উপায় নেই। এই গর্তেই তার জীবন কাটাতে হবে। সে ভেবেছিল, বুড়ো বাপ হয়তো মেয়ের উপর চটে আর একটা বিয়ে করে বসবে, কিন্তু সব বেচে দিয়ে শেষটায় বুড়ো উধাও হয়ে যাবে—একথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। বুড়ো একটা ছুঁড়িকে বিয়ে করলে বাঘিনী ঠিক করে রেখেছিল সে কি করবে। প্রথম গিয়ে ছুঁড়িটার উপর চড়াও হয়ে গালাগাল দেবে, সম্পত্তি নিয়ে গোল বাধাবে। দরকার হলে সৎমাকে তোয়াজ করে সে তাকেই বাপের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। হায় হায়, সব ভেস্তে গেল।

স্বপ্নেও যা সে কোনোদিন ভাবতে পারেনি তাইই হোলো। সে কি আর কোনোদিন ভেবেছিল যে, একগুঁয়ে বুড়ো এতটা নিষ্ঠুর হয়ে সব বেচে দিয়ে নগদ টাকা নিয়ে সরে পড়বে! বুড়োর সঙ্গে সে বহু ঝগড়া করেছে বটে, কিন্তু তখন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল যে, যখন সময় আসবে তখন বুড়োকে তোয়াজ করতেও সে কসুর করবে না। এমন মিষ্টি কথা বলবে যে, বুড়োর মন না ভিজে পারবে না। আর মানবমিলন সে ছাড়া কেউ চালাতে পারবে না এই তো ছিল তার ধ্রুব বিশ্বাস। কিন্তু বুড়োর মনে এই ছিল কে জানত? শেষটায় কিনা মানবমিলনের মতো চালু ব্যবসাটা তছনছ করে দিয়ে চলে গেল? বাঘিনীর মাথা ঘুরে গেল। সে গুম মেরে বসে রইল।

বাইরে বসন্তের আগমনের কানাকানি শুরু হয়েছে, গাছের ডালে ডালে লাল কুঁড়িগুলো ফুটবার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু আঙিনায় বসন্তের কানাকানি লাল কুঁড়ির সমারোহ নিয়ে দেখা দেয়নি। গাছ বা ফুলের এখানে চিহ্নও নেই। তবু বসন্তের আগমনী এসে এখানে পৌছেচে। বসন্তের দাগের মতো উঠোনের গর্তগুলিতে এত দিনের জমাট বরফ গলতে শুরু করেছে, উঠোনের আবর্জনার গন্ধ ছড়িয়ে বইছে হাওয়া। মুরগীর ঝরা পালক, রসুনের খোসা, ছেঁড়া কাগজের টুকরো উড়ে উড়ে দেয়ালে এসে পড়ছে, ঘূর্ণি তুলছে। বাড়ির যারা বাসিন্দে বারো মাস ধরেই তাদের দুর্ভোগ। তবুও বুড়োরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে রোদ পোয়াচ্ছে, ছেলেমেয়েদের মুখের ময়লার প্রলেপের ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক রং উঁকি মারছে। মেয়েরাও ছেলেপুলেদের উঠোনে এনে ছেড়ে দিয়েছে। তারা চেঁচাচ্ছে, হুটোপুটি করছে। কেউ কেউ বা এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে ঘুড়ি তৈরী করতে চেষ্টা করছে, দৌড়ঝাঁপ করছে। এখন আর শীতের ভয় তো নেই যে ঠাণ্ডা লাগলেই হাত ফেটে যাবে। কিন্তু বসন্ত এদের জন্যে বিপদও মুখে করে নিয়ে এসেছে। লঙরখানার উনুনের আগুন নিবে গেছে; দাতারা সব হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এখন আর একহাতা কাঞ্জির জন্যে ছেলেমেয়েদের ভিড় সেখানে দেখা যায় না। দাতারা গরীব দুঃখীদের সূর্যের আলো আর বসন্তের হাওয়ার তদারকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

এখনও ক্ষেতে পয়লা খন্দের গম ঘাসের মতোই সবজে দেখাচ্ছে, ছড়াও দেখা দেয়নি। চাল আর যবের দাম ক্রমাগতই চড়ছে। দিনগুলিও বড় লম্বা। বুড়োরা শীতের দিনে যেমন তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত, এখন আর তা পারছে না। এখন আর ভালো খাবার-দাবারের স্বপ্ন দিয়ে খালি পেটকে ফাঁকি দেওয়া চলে না, অন্ত্রে অন্ত্রে খিদের জ্বালা ধরে, বিছানায় টেকাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। বসন্ত এসেছে গাছের ডালে ডালে, বিলাসীর মনে, কিন্তু সর্বহারাদের

উঠোনে সে কি নিয়ে এল? কি আবার নিয়ে আসবে, এনেছে চরম দুঃখ আর দুর্দশা।

উকুনগুলো পর্যন্ত সেয়ানা হয়ে উঠেছে। এখন আর বিছানাপত্র কি কাপড়ের ভিতর থেকে সহজে তাদের বার করা যায় না। হয়তো বুড়োদের পোশাকের ভিতর ঢুকে বসে রইল। বুড়োরা উঠোনে রোদ পোয়াতে এলে তাদের সঙ্গে ওদেরও একটু রোদ পোয়ানো হোলো আরকি!

বাঘিনী উঠোনের দিকে তাকাল। বরফ গলে গেছে, আবর্জনার পচা গন্ধ আসছে; বুড়োদের দীর্ঘ নিশ্বাস আর ছেলেমেয়েদের চিৎকার একসঙ্গে মিশে গেছে। শীতের দিনে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সবাই নিজের নিজের ঘরে বসে ছিল; আবর্জনা চাপা পড়েছিল বরফের নিচে, এখন আবার সবাই ঘরের বাইরে এসেছে, আবর্জনার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে হাওয়ায়। এমন কি ইঁটের দেওয়াল থেকে পর্যন্ত ঝুর ঝুর করে ধুলো ঝরে পড়ছে, মনে হয় জোরে বৃষ্টি পড়লেই ধসে পড়বে। এত দুঃখ দুর্দশা, তবু বসন্ত এসেছে বই কি! সমস্ত আঙিনায় ফুল ধরেছে, সবুজ পাতা উঁকি দিচ্ছে। এ-ফুল দারিদ্র্যের ঝড়া ফুল, আর তার সবুজ পাতা আবর্জনার বিষাক্ত ঘন সবুজ রং। শীতের চেয়েও নির্মম নিষ্ঠুর এই বসন্ত, দরিদ্রের বসন্ত। আর এই সময়েই কিনা বাঘিনীর কাছে বাপের উধাও হবার খবর এল। এখন আর উপায় কি? সারা জীবন তাকে এই গর্তেই কাটাতে হবে; আস্তে আস্তে তার হাতের টাকা কটা উড়ে যাবে; আর সে হবে রিক্সাওয়ালারই বৌ!

খুশিকে বাড়িতে রেখে দক্ষিণ পার্কের কাছে তার পিসির বাড়িতে গিয়ে সে হাজির হোলো। পিসি বললেন, বুড়ো লিউ ওমাসের বারো তারিখে এসে ছিলেন। এসে নাকি বলেছেন, তিনি টিয়েণ্টসিন কি সাঙহাই যাচ্ছেন। জীবনে তো পিকিংএর ফটকের বাইরে কখনো যাননি, এবার যখন সুযোগ হয়েছে তখন একবার ঘুরে আসতেই হবে। এখনো তার শক্তি সামর্থ্য আছে, একেবারে বুড়ো হাবড়া হয়েও পড়েননি। ফুর্তি করে কটা দিন ফুঁকে দেওয়াই তার ইচ্ছে। এদিকে মেয়ে তো তার মুখে কালি লেপে দিয়েছে! এখন এখান থেকে মানে মানে সরে পড়াই ভালো। পিসি এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না। তবে একথাও বললেন যে, বুড়ো নাও যেতে পারে, এই শহরের কোনো গলিঘুঁজিতেই হয় তো কোনো আস্তানা গেড়েছে। তা শহরে গলিঘুঁজিও তো বড় কম নয়, কে এখন তাকে খুঁজে বার করবে?

বাঘিনী বাড়ি এসে বিছানার উপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ দুটো লাল হয়ে ফুলে উঠল। তারপর চোখের জল মুছে খুশিকে

ডেকে বলল, তুমিই জিতলে! যা প্রাণ চায়, তাই কর, ভুল করে ফেলেছি, আর শোধরাবার উপায় নেই। আমি তোমাকে একশো ডলার দিচ্ছি, যাও রিক্সা কিনে নিয়ে এস।

বাঘিনী আগে ঠিক করেছিল দুখানা রিক্সা কিনে একখানা ভাড়া খাটাবে, আর একখানা খুশিই টানবে। এখন সে মত বদলাল। একখানা রিক্সাই সে কিনবে, বাকি টাকাটা হাতে রাখবে। হাতে যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণ আছে ক্ষমতা। সে এই নিয়েই অনেক ভেবেছে: ধর, মানুষের মন তো! দুখানা রিক্সা কিনে দিলে, তারপর খুশি যদি তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন কি হবে? আগে থেকেই তৈরী থাকতে হবে বইকি। বুড়োই যখন এমনি করে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেল—তখন আর পুরুষের উপর বিশ্বাস নেই। কাল কি হবে কে জানে। আজ যতটুকু পার ফুর্তি করে নাও। কিন্তু তার জন্যে চাই টাকা। সেই টাকা হাত ছাড়া করে একেবারে ফকির বনতে রাজি নয়। এই তো সে পাঁচরকম জিনিস খেতে ভালোবাসে—কেনবার টাকা না থাকলে তখন কি হবে? সুখ বলতে তো আর কিছুই নেই, একটু ভালো খাওয়া—তাও টাকার অভাবে হয়ে উঠবে না।

কিন্তু অত বুঝেশুনে চললেও ঐ কটা টাকায় আর কদিন চলবে? একদিন ফুরিয়ে যাবেই। তখন তো আর পাঁচজন রিক্সাওয়ালার বৌয়ের মতোই জীবন কাটাতে হবে! তাছাড়া উপায়ই বা কি? আচ্ছা তখনকার কথা দেখা তখন যাবে। আজকেই তো আর খুশির কাছে একটা পয়সার জন্যে হাত পাততে যাচ্ছে না! বরং খুশিই রুজি রোজগারের জন্যে তার টাকায় রিক্সা কিনছে।

বাঘিনীর মন খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল, কিন্তু সে বুঝতে পারল ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হোক না অন্ধকার, আজ যে তার মাথা নোয়াতে হবে না—এই তো যথেষ্ঠ! সে যেন এক পথিক, সূর্যাস্তের সময় পথ চলছে, দূরে ঘন হয়ে আসছে রাত, কিন্তু এই মিউনো আলোয় যতটা পারে এগুচ্ছে, আসন্ন রাতের কথা তখন তার ভাববার আর সময় নেই।

খুশি তর্ক বিতর্ক করল না। একখানা রিক্সা সে পাচ্ছে—এই তো যথেষ্ট। যে করে হোক রোজ সে ষাট-সত্তর সেণ্ট দিনে রোজগার করবে আর তাতে দুজনের সংসারও বেশ চলে যাবে। তর্ক তো সে করলই না, বরং আনন্দ হোলো। রিক্সা কেনার জন্যেই না এতদিন সে দুঃখদুর্দশা সয়েছে? এবার সে আর একখানা কিনবে, তার তো কোনো অভিযোগ নেই! কিন্তু একটা কথা—দুজন লোকের খাওয়া পরা একখানা রিক্সা টেনে চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু কিছুই যে জমবে না। রিক্সার তো আর অখণ্ড পরমায়ু নেই। কিছুদিন পরেই টায়ার

ক্ষয়ে যাবে, চাকা ঝরঝরে হয়ে যাবে, তখন তো পাল্টাবার উপায়ও থাকবে না। ভাবনার কি আর কুলকিনারা আছে? রিক্সা কিনছে এই তো যথেষ্ট, ভেবে কি হবে? অত দূরের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখনকার আনন্দটুকু মাটি করতে রাজি নয়।

এই বাড়িরই বাসিন্দে মেজ জোরমন্ত, এই সময় তার রিক্সা বিক্রি করবে ঠিক করল। গত বছর গ্রীষ্মকালে সে তার উনিশ বছরের মেয়ে খুদে লক্ষ্মীকে এক সামরিক কর্মচারীর কাছে বিক্রি করে দুশ ডলার পেয়েছিল। খুদে লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পরন্তু জোরম নবাবী শুরু করল। যত জিনিস বাঁধা দিয়েছিল, ছাড়িয়ে নিয়ে এল, নতুন কাপড়-চোপড় কিনল—সমস্ত পরিবারেরই তখন ভোল বদলে গেছে।

জোরমন্তের স্ত্রী বাড়ির বাসিন্দের ভিতরে সবচেয়ে কুৎসিত। মাঠকপাল; চোয়ালের হাড় জেগে উঠেছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, সারা মুখ ব্রণে ছেয়ে গেছে। ওর দিকে তাকাতেও ঘেন্না হয়। মেয়ের জন্যে সব সময়ে কাঁদে বলে চোখ দুটো তার ফুলো আর লাল হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে সাজপোশাকে অরুচি নেই, মেয়ে বেচা টাকায় নতুন পোশাক পরতে তার একটুও বাধেনি। জোরমন্তের মেজাজটা মেয়ে বেচার পর থেকে কেমন তিরিক্ষে হয়ে গেছে, এখন সে সুযোগ পেলেই মদের দোকানে ঢুকে পেয়ালার পর পেয়ালা মদ উজাড় করে আর যাকে-তাকে গায়ে পড়ে গালাগাল দেয়!

নতুন পোশাক পরলে কি হবে তার বৌয়ের মনে সুখ নেই। একে তো মেয়ের জন্যে তার দুঃখ, তার উপর স্বামীর মার-পিটের মাত্রাটাও চড়ে গেছে।

জোরমন্তের বয়েস চল্লিশের উপর হবে। তাই মেয়ে বিক্রি করে দিয়ে সে ঠিক করল রিক্সা না টেনে অন্য কিছু করবে। দুটো বেতের ঝুড়ি কিনে এনে একটা বাঁকের দুপাশে ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঝুড়ির ভিতরে হরেক কিসিমের জিনিস! তরমুজ, নানা রকমের ফল, বাদাম, সিগারেট আরো কত কি! দুমাস চলল ব্যবসা, তারপর সে মোটামুটি একটা হিসেব করে দেখল, লোকসানের অঙ্কটা বেশ মোটা দাঁড়িয়ে গেছে। রিক্সা টেনেই যার জীবন কেটে গেল, অন্য ব্যবসায় সে তো হিমসিম খেয়ে যাবেই। রিক্সাওয়ালারা পথে পথে সোয়ারির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়: সোয়ারি পেলে ভালোই, না পেলে হয়রান হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু অন্য ব্যবসায় তা হয় না। একটা আধটা পয়সার জিনিস গছাতেও ফেরিওয়ালার ঘাম ছুটে যায়। তার উপর খদ্দেরকে ঠকানোর ফন্দি-ফিকিরগুলোও রপ্ত করা চাই। জোরমন্তের সে ক্ষমতা ছিল না।

রিক্সাওয়ালারা ধারে জিনিস কেনে বলেই পরিচিতদের ভিতরে সে ধারে জিনিস বিক্রি করল; কিন্তু একবার বাজারে ধার পড়ে গেলে তখন আদায় করা যে কি কষ্ট—একথা বেচারার জানা ছিল না।

ব্যবসা তার বেশিদিন টিকল না। ভালো খদ্দের একটাও জুটল না। যা বা জুটলো, তারা সবাই ধারে জিনিস নিয়ে জোরমস্তের ব্যবসা দুদিনে লাটে তুলে দিল। টাকাকড়ি নষ্ট করে এবার সে মদে ডুবে গেল। মাতাল হয়ে পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় দাঙ্গা বাধাল, বাড়িতে এসে বৌয়ের উপর তুলল তার শোধ—এমনি করেই কেটে চলল জোরমস্তের জীবন।

মাঝে মাঝে যে জ্ঞান না ফিরত এমন নয়, অনুশোচনা এসে দেখা দিত। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে? আবার মেয়ের শোকে পাগল হয়ে ভাড়ের পর ভাড় মদ গিলে মাতাল হয়ে যেত, বৌকে পেটাত। তার নিজেরই মনে হোতো, সে আর মানুষ নেই, পশু হয়ে গেছে। ঘুমেই সে পেত তার একমাত্র শাস্তি।

জোরমস্ত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ঠিক করল, আবার রিক্সা টানবে, টাকাগুলো নয়ছয় করে দিলে তো চলবে না! সে একখানা রিক্সা কিনে ফেলল। মাতাল অবস্থায় সে যা তা বলত, ভদ্রতারও কোনো বালাই তার ছিল না। কিন্তু জ্ঞান হলে তার ভিতরে আভিজাত্য বোধ চাগিয়ে উঠত। জাঁক দেখাতেও সে ছাড়ত না। গরীবদের এই রীতি—সুবিধে পেলেই জাঁক দেখাতে তারা ভালোবাসে। জোরমস্ত আনকোরা নতুন রিক্সা কিনল, কাপড়-জামাও তখন তার ধোপ-দুরস্ত—রিক্সা-ওয়ালাদের একেবারে পয়ালা দলে সে কল্‌কে পেল। ছোটখাট চা-খানায় ঢুকলে আর তার মান থাকে না, বাবুভায়া না হলে সে সোয়ারি নেয় না—এমনি তার অবস্থা।

গলির মুখে ধবধবে পোশাক পরে দাঁড়িয়ে নতুন রিক্সার উপর রোদের খেলা দেখে গল্পগুজব করেই তার দিন কাটতে লাগল, রোজগারের চেষ্টাই সে করত না। কয়েক মিনিট অন্তর নীলরঙের ঝাড়ন দিয়ে রিক্সা ঝেড়ে, কখন বা নতুন জুতোর গোড়ালী ঠুকে, রিক্সার চাকার উপর দুপা তুলে দিয়ে দিনগুলি ফুঁকে উড়িয়ে দিত। মাঝে মাঝে কাউকে ধরে এনে তর্কও জুড়ে দিত। এরই মধ্যে কোনোদিন হয়তো বাবু সোয়ারি মিলেও যেত কিন্তু অমন আনকোরা নতুন রিক্সা আর ধোপ-পোশাকের মান রাখবার মত সামর্থ্য তার আর ছিল না; সে ছুটতে পারত না। কেমন যেন মুষড়ে পড়ত জোরমস্ত। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের কথা তার মনে পড়ত; সে ছুটত শুঁড়িখানায়। এমনি সে করে মেয়ে-বেচা টাকা উড়িয়ে দিল, রইল শুধু রিক্সাখানা।

শীতের শুরুতে একদিন সে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ছেলেদুটো তো ভয়ে অস্থির। তারা পালাবার পথ খুঁজছে, এমন সমন জোরমস্ত গিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জুতো দিয়ে বেদম মার মারল। বৌ কি বলতে এসেছিল,

তাকে চিৎ করে মাটিতে ফেলে তলপেটে লাথি মারতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল! ছেলে দুটোর কতই বা বয়েস হবে—বড়টা তেরো আর ছোটটা এগারোয় পড়েছে—তারা কিন্তু আর সহ্য করতে পারল না। কয়লা ভাঙবার হাতুড়ি আর লাঠি নিয়ে দুজনেই বাপের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ল। তিনজনে ধস্তাধস্তি চলল; পাড়াপড়শীরা এসে তবে বহু কষ্টে ছাড়ায়। জোরমস্ত গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, ছেলেরা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

জোরমস্তের বৌ ধকল সামলে উঠতে পারল না, চান্দ্রমাসের তিন তারিখে সে মারা গেল। মেয়ে-বেচা টাকায় কেনা নীল পোশাক পরে বিছানায় শুয়ে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বৌয়ের মরবার পর তার বাপের বাড়ির দিক থেকে জোরমস্তের নামে মামলা রুজু করবার কথাও উঠেছিল, কিন্তু বন্ধুরা মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিল। বাপের বাড়ির ওরা এই সর্তেই রাজি হোলো যে, জোরমস্ত বৌকে গোর দেওয়ার ভালো ব্যবস্থা করবে, আর তাদের খেসারৎ দেবে পনেরো ডলার। জোরমস্ত রাজি হয়ে গেল।

হাতে টাকা যা ছিল উড়ে গেছে, কি আর করবে, সে রিক্সাখানা আট ডলারে বাঁধা দিল। নতুন বছরের উৎসবের পর রিক্সাখানা একেবারে বিক্রি করে ফেলতেই সে চাইল। তাছাড়া উপায়ও নেই, রিক্সা ছাড়িয়ে আনার টাকাই বা সে কোথায় পাবে? মাঝে মাঝে মাতাল অবস্থায় তার মনে হোতো, ছেলে দুটোর একটাকে বেচে দিলে কেমন হয়। চেষ্টাও করে সে দেখেছিল, কিন্তু কেউ কিনতে চায়নি। একবার খুদে লক্ষ্মীর স্বামীর কাছে গিয়েও হাত পেতেছিল, কিন্তু সে তাকে চেনে না বলেই হাঁকিয়ে দেয়।

খুশি এই ইতিহাস জানতো বলেই জোরমস্তের রিক্সা কেনার তার ইচ্ছে ছিল না। কত রিক্সাই তো রয়েছে—এইখানাই যে কিনতে হবে তার মানে কি। মেয়ে-বেচা টাকায় কেনা রিক্সা তো অপয়া হবেই। না না, ও রিক্সা সে কিনতে পারবে না।

বাঘিনী কিন্তু ওসব চিন্তা আমোলই দিল না। সে ভেবে দেখল, আশী ডলারের কিছু বেশি দিলেই রিক্সাখানা কিনতে পারবে—এ এক মস্ত দাঁও! দাঁও সে কিছুতেই ছাড়বে না। রিক্সাখানা জোরমস্ত সেদিন কিনেছে, এখনো ছমাস হয়নি, চাকার রং এখনো চটেনি। তাছাড়া যে সে কারখানা নয়—পশ্চিম চকের নামকরা কারখানা ধার্মিক কোম্পানীর তৈরী—না, না, এ দাঁও ছাড়তে সে পারবে না। পুরনো রিক্সা কিনতে গেলেও পঞ্চাশ ষাট ডলার খরচা পড়বে, তাছাড়া নতুন বছরের উৎসবের পর সকলেরই এখন টানাটানি যাচ্ছে—দাম বেশি চাইলেই বা দিচ্ছে কে? আর জোরমস্ত রয়ে বসে তো বিক্রি

করতে পারবে না—তার এখন টাকার খুব দরকার। বাঘিনী নিজে দেখে দরদস্তুর করে রিক্সাখানা কিনে ফেলল।

খুশি আর কি করবে; রিক্সাখানা কবে এসে পৌছবে সেই আশায়ই বসে রইল। মুখফুটে কোনো কথাই সে বলল না। বলবারও কিছু নেই; টাকা তো আর তার নয় যে বলবে! রিক্সাখানা এসে পৌছতেই ভালো করে সে দেখে নিল। বেশ মজবুতই আছে। কিন্তু তবু মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে। রিক্সার গায়ের কালো রংটা তার পছন্দ নয়, পিতলের বদলে চারদিকে সাদা এনামেলের কাজকরা—কালো আর সাদায় মিশে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। জোরমন্তের পছন্দ বলে কিছু নেই, এমন অপয়া রং কেউ পছন্দ করে? এ যেন গোরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে। খুশির ইচ্ছে হোলো, অন্তত ঢাকনাটা সে বদলে চাঁদের আলোর রঙে চুপিয়ে নেয়—তাহলে এই গা ছম-ছমে ভাবটা খানিকটা কেটে যাবে। কিন্তু বাঘিনীকে বলতে সাহস হোলো না। এখুনি আবার যা-তা বলতে শুরু করবে।

রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল খুশি। সবাই তার রিক্সাখানার দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কেউবা চেঁচিয়ে উঠল, কিহে 'কড়ে রাঁড়ি' তোমার বেলাই শেষে জুটল নাকি? রিক্সার কালো রং দেখে ওরা ঐ নামই রেখেছে। খুশি চুপ করে রইল। মনের রাশ সে টেনে ধরল। কিন্তু মন বাগ মানে কই? রিক্সাখানা সেই ভোর থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত তার সঙ্গে—সব সময়েই সে তটস্থ হয়ে থাকে—এই বুঝি রিক্সাখানা উলটে গিয়ে বিপদ বাধায়। কখনো বা সে জোরমন্তের দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবে। রিক্সা তাকে বিনে ভাড়ায় আজীবন টেনে নিয়ে চলতে হবে—উপায় নেই।

অকারণে অস্থির হয়ে উঠল। অনবরত শুধু টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ, কিন্তু রিক্সা নিয়ে কোনো হাঙামাই বাধল না। কয়েক সপ্তাহ যেতেই গরম পড়ল। এবার খুশি তার তুলোর কামিজ ছেড়ে সুতীর কামিজ পায়জামা পরল। বসন্ত পিকিঙ-এ বেশিদিন টিকতে পারে না। এবার পড়ল গরম—দীর্ঘ দিন। শহুরে লোকেরা হাঁপিয়ে উঠল গরমে। কর্মব্যস্ততা নেই—সামান্য খেটেই ক্লান্তি আসে, ঘুম পায়। খুশি ভোরে উঠেই আজকাল বেরোয়, বেলা চারটে পর্যন্ত সোয়ারির খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তারপর আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু সূর্য তখনো মাথার বেশ উপরে, বাড়ি ফিরতেও ভালো লাগে না, কোথাও রিক্সা থামিয়ে বসে বসে হাই তোলে।

সত্যিই, সে কেমন নিরুৎসাহ হয়ে গেছে। বাঘিনীও যেন কেমন মুষড়ে পড়েছে। শীতকালে উনুনের পাশে হাত পা সেঁকে, বাইরে দমকা হাওয়ার মাতামাতির শব্দ শুনে কোনোরকমে তার দিনগুলো কেটেছে। ঘরে বন্ধ হয়ে

বসে থেকে মন খিঁচড়ে গেলেও বেরুবার তখন উপায়ই ছিল না। শুধু সে ভেবেছে, শীতটা একবার শেষ হোক না, তারপর কে আর ঘরে বন্ধ হয়ে পচে মরে।

এখন শীত শেষ হয়ে গেছে, বাড়িতে বসে উনুনে হাত সেঁকেও আর সময় কাটানো চলে না। উঠোন থেকে পচা গন্ধ ভেসে আসছে; জীবন্ত ঘাসের শিষও সেখানে নেই যা দেখে চোখ জুড়োনো যায়। এক বাইরে বেরুতে পারে—কিন্তু পড়শীরা কখন কি চুরি করে নিয়ে যায় কে জানে! এমন কি দুএকটা সওদা করতে বেরুলেও তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসে। সে যেন এক ভোমরা, ঘরের ভিতরে তাকে বন্ধ করে রেখেছে। বাইরের সূর্যের আলো দেখে সে আনন্দে নেচে উঠছে, কিন্তু উড়ে যাবার উপায় নেই। বাড়ির বাসিন্দে মেয়েদের সঙ্গে দুদণ্ড গল্প করবে সে উপায়ও নেই। তারা পাড়ার কেলেঙ্কারী নিয়ে আসর জমায়, বাঘিনীর তা ধাতে সয় না। সে এতদিন পাহাড়ি বুনোদের গানের মতো জীবন কাটিয়ে এসেছে—তার সুর নেই, ছন্দ নেই, কিন্তু মুক্তির আনন্দে সে উদ্ভাসিত। তাই আর যাইই করুক এতখানি নীচে নামতে এখনো পারেনি। তাদের এই নীচতার মূলে আছে দুঃখময় জীবন, তারা কারণে-অকারণে ঝরঝর করে চোখের জল ফেলে। কিন্তু বাঘিনীর জীবন তাদের থেকে স্বতন্ত্র। বাঘিনী নিজের জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, তার চোখে নেই জল, তার মনের ভার হাল্কা করতে হলে সে গালাগাল দেয়। ওদের সঙ্গে তার ভাব হওয়া অসম্ভব, ওরা ওদের মতো থাকুক, সে তার নিজের মতো থাকবে—এই সে ঠিক করে ফেলল।

চারমাস পরে এই বাড়িতেই তার একটি বন্ধু জুটে গেল। বন্ধুটি খুদে লক্ষ্মী। সে তার স্বামীর সংসারের পালা সাঙ্গ করে ফিরে এল। তার 'মানুষটি' একজন সামরিক কর্মচারী। সে যেখানেই যায়, সেইখানেই সংসার পাতিয়ে বসে। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার এ এক সহজ ব্যবস্থা। একশো কি দুশো ডলার দিয়ে একটি অল্পবয়েসী মেয়ে, একটা বড় তক্তপোশ, দুখানা চেয়ার—এই তো সংসার। কটা দিন দিব্যি আরামে কেটে যায়।

তারপর যখন বদলির হুকুম আসে, তখন বিয়ে-করা স্ত্রী আর লটবহরের হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। পোশাকটা পরে বেরিয়ে পড়লেই হোলো। মেয়েটা আর আসবাব-পত্র পড়ে থাক না, ক্ষতি কি? এতে লোকসান তো নেইই, বরং যথেষ্ট লাভ। দুই কি আড়াই বছরে একশো কি দুশো ডলার তো মোট খরচা! কাপড় কাচা, জামা রিপু করা, রান্না, সংসারের আরো টুকিটাকি কাজ মেয়েটাই করবে। একটা চাকর রাখলে মাসে আট-দশ ডলার তো মাইনেই দিতে হোতো, তার উপরে তার খাওয়া আছে, জল খাবার আছে। এ চাকরকে চাকর, বৌকে বৌ। এক বিছানায় শোয়া চলবে; রোগেরও ভয় নেই।

তারপর মেয়েটাকে খুব ভালো লাগলে না হয় ডলার খানেক খরচ করে সস্তা কালিকো ছিটের একটা পোশাকই তৈরী করে দিলে। ভালো না লাগলে কাপড়-চোপড় দিতেই হবে না। ছেঁড়া কানি পরেই থাক না!

…খুদে লক্ষ্মীর স্বামী বদলি হয়ে চলে গেল। খুদে লক্ষ্মী, তক্তপোশ আর চেয়ার দুখানার দিকে ফিরেও তাকাল না। খুদে লক্ষ্মী মহা ফাঁপরে পড়ল। তার 'মানুষটি' দুমাসের ভাড়া বাকি ফেলে পালিয়েছে। কি আর করে, চেয়ার তক্তপোশ বেচে কোনো রকমে ভাড়া দিয়ে কালিকো ছিটের পোশাক আর একজোড়া রুপোর গিলটি-করা দুল নিয়ে বাড়ি ফিরল।

রিক্সা বিক্রি করে দিয়ে জোরমন্তের হাতে বিশ ডলারের কিছু বেশি রইল। আধা-বয়েসী লোক, বৌ মরে গেছে; সান্ত্বনা দেওয়ারও কেউ নেই। সে মদের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল—এখন তো মদেই তার একমাত্র সান্ত্বনা। হাতের টাকা-গুলোও যেন শত্রুতা করছে। সে ঠিক করল হাতের টাকাকটা উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। মাঝে মাঝে অবশ্য ছেলেদুটোর কথা যে তার মনে পড়ত না তা নয়। তখন সে ভাবত, আবার রিক্সা টেনে ছেলেদুটোকে কোনোরকমে বড় করে তুলবে। তাহলে অন্তত ভবিষ্যতের খানিকটা আশা রইল। এমনি অনুশোচনা এলেই সে ছুটে গিয়ে একগাদা খাবার এনে ছেলেদের খেতে দিত। ছেলেরাও গোগ্রাসে গিলত; আর জোরমন্ত তাদের দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে বলত: আহা, মা-হারা ছেলে দুটো! কি খারাপ তোদের বরাত! বাপ সারাদিন তোদের জন্যেই খেটে মরছে। আমি খেতে পাই না পাই তোদের পেট ভরে খেতে দেবোই। যা, খাগে যা। শুধু তোদের কাছে এইটুকু বলে রাখছি, বড় হলে তোদের বুড়ো বাপকে যেন ভুলে যাসনে।

এমনি মানসিক অবস্থা যে, বহু টাকা ছেলেদের খাবার আর খেলনা কিনে দিতে ব্যয় হয়ে গেল। একদিন বিশ ডলার পুঁজি গেল ফুরিয়ে।

টাকা ফুরিয়ে গেল, এদিকে মদের নেশাও পেয়ে বসেছে। জোরমন্ত রেগে উঠল। এখন আর ছেলেরা খেল না খেল, দেখবার তার সময় নেই। সে মদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে ছেলেরা ভারি মুশকিলে পড়ল। কি করবে ভেবেই পেল না। এক উপায় আছে: বিয়ের শোভাযাত্রা কি শবযাত্রার সঙ্গে গেলে দুএকটা পয়সা মেলে; ময়লার গাড়ির সঙ্গে ঘুরলেও দুএকটা পয়সা কি ছেঁড়া খবরের কাগজ দুএকখানা পেয়ে যেতে পারে।—তারা এই উপায়ই ধরল। মাঝে মাঝে তাদের ভাগ্যে মোটামুটি ভালো খাবার জুটত, কখনো বা খুদের জাউ খেয়ে কাটাতে হোতো। খুদের জাউও যেদিন জুটত না সেদিন তারা এক পয়সার বাদাম চিবিয়েও সারাদিন কাটিয়ে দিত। খিদে না মিটলেও কিছুক্ষণ চিবোনো তো যাবে।

খুদে লক্ষ্মী ফিরে আসতে তাদের মনে আশা হোলো। এবার তারা এমন একজনকে পেয়েছে যার উপরে খানিকটা ভরসা করা চলে। বোনকে দেখে তারা কোনো কথা বলল না, শুধু দুজনে দুহাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরল জল। মা মরে গেছে, এখন দিদিই তো তাদের মা।

মেয়ে ফিরে আসায় জোরমস্ত হাঁ, হুঁ, কিছুই বলল না। আর একটা পেট বাড়ল আর কি! কিন্তু ছেলে দুটোকে খুশি হতে দেখে তার মনে হোলো, ঘরে মেয়েমানুষ না হোলে কি মানায়! রান্না বান্না করবে, কাপড় কাচবে, তবেতো ঘরের শ্রী ফিরবে! তাই আপত্তি সে করল না। চলুক না, যতদিন চলে।

খুদে লক্ষ্মী বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। এমনিতে রোগা আর বেঁটে দেখতে ছিল, দুবছর সামরিক কর্মচারীর ঘর করে বেশ শাঁসে-জলে ভরে উঠেছে, একটু লম্বাও হয়েছে। মুখখানা বেশ ভরাপুরো, চোখ দুটোও বড় বড়, এমন কিছু সুন্দরী সে নয়—কিন্তু শ্রী আছে বইকি। উপরের ঠোঁট একটু চাপা—তাই রাগলে বা হাসতে গেলে সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে। সামরিক কর্মচারীটি এই দাঁতের শোভা দেখেই ওকে পছন্দ করেছিল। পছন্দ করবার কথাও বটে! ঝকঝকে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়লে মনে হয় ও যেন কেমন অবাক হয়ে গেছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। একেবারে যেন আদুরে ছোট্ট খুকুটি!

গরীব ঘরে সুন্দরী মেয়েদের মুখে এমনি শ্রীই দেখা যায়—এ যেন বনের ফুল বা ঘাসের মতোই স্বাভাবিক সৌন্দর্য, একটু সবুর করে তুলে তোড়া বেঁধে বাজারে অনায়াসে বিকোনো চলে।

পড়শীদের দিকে বাঘিনী এতদিন মুখ ফিরিয়েই ছিল, খুদে লক্ষ্মীকে দেখে তার মনে হোলো—হাঁ এর সঙ্গে মিতালি পাতানো চলে বটে! খুদে লক্ষ্মীর রূপ আছে, তার উপরে সে কালিকো ছিটের বুটিদার জামা পরেছে; তাছাড়া এতদিন সামরিক কর্মচারীর ঘর করে এল, অনেক ফুর্তিই লুটেছে নিশ্চয়! ওর সঙ্গে মিতালি পাতালে তার সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। এমনি মেয়েরা চট করে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না, কিন্তু বন্ধুত্ব করে ফেললে অন্তরঙ্গ হতে তাদের দেরী হয় না। খুদে লক্ষ্মী আর বাঘিনী দেখতে দেখতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

বাঘিনী রকমারি খাবার খেতে ভালোবাসে। যখনই তরমুজের বিচি বা অন্য কোনো খাবার কেনে খুদে লক্ষ্মীকে ডেকে খাওয়ায়। খেতে খেতে তারা হাসে, গল্প করে। দাঁত বার করে খুদে লক্ষ্মী বাঘিনীকে এমন সব গল্প বলে যা সে কোনোদিন শোনেনি। সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে সুখে ঘরকন্না সে করেনি, কিন্তু যখন তার মেজাজ ভালো থাকত, তখন সে খুদে লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়ে হোটেলে

খাওয়াত থিয়েটার দেখাত। এই সবগুলিই সে বলে আর বাঘিনী শুনে অবাক হয়ে যায়।

তার জীবনের দুঃখের কথাও সে বলি বলি করে বলে ফেলল। তার 'মানুষটি'র অত্যাচার, অবৈধ উপায়ে যৌনলালসা পরিতৃপ্তির কাহিনী। বাঘিনী উত্তেজিত হয়ে উঠল। খুদে লক্ষ্মী বলতে না চাইলেও বন্ধুর অনুরোধে তাকে বলতে হোলো।

খুদে লক্ষ্মী দেখতে তো সুশ্রী বটেই, তাছাড়া জীবনে নানা অভিজ্ঞতার আস্বাদ সে পেয়েছে—বাঘিনী তাকে ভালোবেসে ফেলল, আবার তার উপর হিংসেও হোলো! কতদিন খুদে লক্ষ্মীর অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে সে নিজের কথা ভেবেছে। তার চেহারা, বয়েস, স্বামী—সবদিক দিয়েই বিধাতা তাকে মেরে রেখেছেন। কামনার বসন্তের খবর সে কোনোদিন পায়নি, ভবিষ্যত তার অন্ধকার, আর বর্তমানেই বা আনন্দ কোথায়? খুশির সে কামনা নিবে গেছে, এখন সে ইঁটের মতোই ভারী আর অক্ষম। খুশির উপর যতই রাগ বাড়তে লাগল, বাঘিনী ততই খুদে লক্ষ্মীকে আঁকড়ে ধরল। হোক সে গরীব, সুখের মুখ সে দেখেছে, জীবনের আস্বাদ পেয়েছে। আজ যদি খুদে লক্ষ্মী মরেও যায়, অভিযোগ করবার তার কোনো কারণই থাকবে না। জীবনের সুখ নিংড়ে চুষে উপভোগ করে নিয়েছে, আবার কি চাই!

বাঘিনী বন্ধুর এই দিকটাই শুধু দেখল, বুঝতে পারল না তার অভাব! তার দারিদ্র্য। খুদে লক্ষ্মী স্বামীর ঘর থেকে কিছুই নিয়ে আসেনি; তাছাড়া ভাই দুটির ভরণ-পোষণের ভার এসে পড়ল তারই কাঁধে। এখন কোথায় সে টাকা পাবে, কি করে সে অপোগণ্ড ভাইদুটিকে ভরণপোষণ করবে—একথা বাঘিনী ভেবেও দেখল না।

জোরমন্ত নেশার ঘোরে পথ বাতলে দিল: ভাইদুটোর জন্যে যদি অত দরদ, এক কাজ কর না; তাহলে টাকা রোজগারও হবেখন, ভাইদুটোও দুমুঠো খেয়ে বাঁচবে। তা না আমাকেই খাটতে হবে; উদয়াস্ত ঘোড়ার মতো মানুষ বয়ে বয়ে টাকা নিয়ে আসব, আর উনি ওর ভাইদুটোকে গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়াবেন। এদিকে আমি কি খালি পেটে খাটব নাকি? যদি চিৎপটাং হয়ে পড়ে মরে থাকি তখন খুব মজা দেখবি, তাই না? কেনরে ভাই-সোহাগী, তোর তো তৈরি মাল রয়েছে, বেচতে চাইলেই খদ্দের মিলবে—তাই কর না? যা না, নিজেকে ভাড়া খাটা না?

খুদে লক্ষ্মী একবার তার বাপ আর ইঁদুরের মতো রোগা ভাইগুলির দিকে তাকাল। উপোসে উপোসে কি চেহারাই ওদের হয়েছে! খুদে লক্ষ্মী কাঁদল।

কিন্তু কান্নায় তো বাপের রাগ কমবে না, ভাইয়ের পেটও ভরবে না; ওদের সাহায্য হতে পারে এমন কিছু করতে হবে। ভাইদের মুখের ভাত জোগাতে সে তার নিজের দেহ বিক্রি করবে—তার নারীত্বের আঙিনা খুলে দেবে, পয়সা যারা দিতে পারে তারা এসে ভিড় করবে সেখানে। কয়েকটা পয়সার জন্যে সে পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়বে; আর পুরুষের লালসা তাকে বিদ্ধ করবে, ক্ষতবিক্ষত করবে।

সে ছোট ভাইটাকে বুকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল। ছোট ভাইয়ের মাথার চুল তার চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু সে তা টের পাচ্ছে না। তার ঠোঁট দুটো শুধু বলতে চাইছে, দিদি, দিদি, খিদে পেয়েছে! দিদি! দিদি যেন এক তাল মাংস; ভাইরা সে মাংস খাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছে।

বাঘিনী তাকে এই নতুন ব্যবসায় সাহায্য করতে এগিয়ে এল। এমন কি ব্যবসা ফাঁদতে পোশাক-আশাক, রুজ, পাউডার যা লাগে সে সব নিজের টাকা খরচ করে কিনে দিতে চাইল। পরে রোজগার করে শোধ দিলেই হবে। তার ঘরখানাও সে ছেড়ে দিতে চাইল। খুদে লক্ষ্মীদের ঘরখানা বড় নোংরা, বাঘিনীর ঘরগুলো বরং সে হিসেবে যথেষ্ট সাজানো-গোছানো! একটু খোলা-মেলাও বটে। আর খুশি তো দিনের বেলায় ফেরে না, তাই অসুবিধেও কিছু নেই। বাঘিনী বন্ধুর এই উপকারটুকু করতে পেলে যেন বর্তে যায়—এমনি তার ভাবখানা। তাছাড়া ঘরে কাগজের পার্টিশন; আঙুল জলে ভিজিয়ে নিয়ে কাগজের উপর রাখলে খুদে লক্ষ্মীর ঘরের কাণ্ডকারখানা দেখে সে বহু জিনিস শিখতে পারবে—যা সে চিরদিন কামনাই করে এসেছে, কিন্তু পায়নি।

কিন্তু বাঘিনী একেবারে নিছক উপকার করতেই বসেনি। সে একটা সর্তে ঘর দিতে রাজি হোলো, খুদে লক্ষ্মী তাকে ফি-বারে ঘর ভাড়া বাবদ বিশ সেণ্ট করে দেবে। বন্ধুত্ব আছে থাকুক না, কিন্তু ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা, এখানে মাগনা কিছু চলতে পারে না; ঘরদোর সাজাতে বেশ কিছু পয়সা ব্যয় হবে—ঝাঁটা, জঞ্জাল ফেলবার টব এ সবের কি দাম নেই নাকি? বিশ সেণ্ট এমন কিছু বেশি নয়—বন্ধু বলেই না বাঘিনী এত সস্তায় রাজি হয়েছে!

খুদে লক্ষ্মী দাঁত বার করে হেসে রাজি হোলো। মনের কোণে উথলে উঠল কান্না।

রাতে খুশি ফিরে এলে বাঘিনী তাকে কোনো কথাই বলল না। কিন্তু তার ঘুম ভাঙিয়ে বিছানার ভাড়া আদায় করতে বাঘিনী ছাড়ল না। বাপকে সে দেশ ছাড়া করেছে, যে-বন্ধুকে সে ঘৃণা আর হিংসা করে তার সর্বনাশ এইমাত্র করে এসেছে, খুশিকেই বা ছাড়বে কেন? পরিপূর্ণ লালসা নিয়ে খুশির উপর বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আঠারো

বছরের ছমাস কেটে গেছে। দিনের বেলা উঠোনে আর ছেলেদের গোলমাল শোনা যায় না। তারা ভোরে উঠেই ভাঙা ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পথে যা পায় তাইই কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরতি করে। বেলা নটায় চড়া রোদে তাদের পিঠের চামড়া তেতে উঠলে তারা বাড়ি ফিরে যা পায় তাইই খায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে বড়রা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে যায়; বরফের কল থেকে বরফ কিনে এনে পথে পথে বিক্রি করে।

পয়সা না থাকলে দলবেঁধে তারা নদীতে স্নান করতে যায়। ফেরবার পথে রেল স্টেশন থেকে কয়লা চুরি করে নিয়ে আসে। কেউ কেউ বা রং-বেরঙের পোকা মাকড়টা ধরে আনে—বড়লোকের ছেলে মেয়েদের কাছে বিক্রি করবে।

ছোটরা আর অতদূরে যেতে পারে না, তারা ফটক পার হয়ে কাছেই কোনো গাছের ছায়ায় গিয়ে খেলা করে। কত রকমের খেলা—কেউ ছুটে ছুটে ফড়িং ধরে বেড়ায়, কেউ বা মাটি খোঁড়ে; কেউ বা মাটির ঘর বানাতে বসে যায়।

ছেলে মেয়ে আর পুরুষরা বেরিয়ে গেলে মেয়েরা কোমর পর্যন্ত আলগা গা করে বসে থাকে—বাইরে বেরুতে তাদের সাহস হয় না। না, আলগা গার জন্যে নয়; উঠোন তপ্তখোলার মতো তেতে আছে বলেই তারা বেরুতে পারে না। খালি পায়ে উঠোনে পা দিলেই ফোস্কা পড়বে, এই তাদের ভয়।

সূর্য ডুবলে পুরুষ আর ছেলেমেয়েরা একে একে বাড়ি ফিরতে শুরু করে। হাওয়া বয়ে যায়—মিঠে হাওয়া। বন্ধ ঘরের ভিতরে পৌঁছয় না—সেখানে ভ্যাপসা গরমে বসে বসে মেয়েরা ভাত রাঁধে। যতক্ষণ না রান্না শেষ হয়, সবাই উঠোনে বসেই জটলা করে। চারদিকে বাজারে গোলমাল শুরু হয়। সবাই দুপুরের গরমে সেদ্ধ হয়ে ক্ষেপে আছে, তার উপরে খিদেও পেয়েছে,—মুখ চোখ বসে গেছে, মেজাজ তিরিক্ষে না হয়ে উপায় নেই।

একটা কথা বেফাঁস বেরুলে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যায়: কেউ ছেলে-পুলেদের, কেউ বা বৌকে ধরে বেধড়ক পিটুনি দেয়। পিটুনি না দিতে পারলে গালাগাল তো আছেই। হৈ-হল্লা মারপিটের ভিতর দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ হয়। ছেলে মেয়েরা কেউ উঠোনেই ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ বা পথে খেলতে বেরিয়ে যায়।

পেটে ভাত পড়ে বড়োদের মেজাজও এখন শান্ত। তারা গোল হয়ে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করে।

যাদের চাল বাড়ন্ত, তাদের খাওয়া জোটে না। এই ঘোর সন্ধ্যে বেলায় যে জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে বা বিক্রি করে চাল আনবে তারও উপায় নেই। এইসব পরিবারের পুরুষরা উঠোনে আড্ডা জমায় না, তারা এসেই বদ্ধঘরের ভ্যাপসা গরমে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, কেউ বা রাগের চোটে বৌকে বকতে শুরু করে। বৌরা আর কি করবে, কোনো রকমে চোখের জল চেপে বেরিয়ে গিয়ে টাকা ধার করে এক ভাড় কাঞ্জি কিনে নিয়ে আসে। সমস্ত পরিবার সেই কাঞ্জি খেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দেয়।

বাঘিনী বা খুদে লক্ষ্মীর জীবনধারা এদের থেকে একেবারে আলাদা। বাঘিনী এবার সত্যিই গর্ভবতী। খুশি ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়; বাঘিনী আটটা-নটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। পোয়াতি মেয়ের নড়াচড়া করতে নেই—এই ভুল বিশ্বাস বহুদিন ধরে চলে আসছে; বাঘিনীও এই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাছাড়া এতে তার বনেদি চাল দেখাবারও সুবিধে হয়েছে: বাড়ির বাসিন্দেরা সবাই ভোরে উঠতে বাধ্য, কিন্তু সে ওসব বাধ্য-বাধকতার ধার ধারে না; যতক্ষণ খুশি ঘুমিয়ে যখন খুশি সে উঠতে পারে, কেউ বাধা দেবে না। বাঘিনী দেরিতেই ওঠে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ আড়ামোড়া ভাঙে; তারপর তার দিন শুরু হয়। সন্ধ্যে বেলা একটা বেঞ্চি নিয়ে বাইরে বসে সে হাওয়া খায়; বাসিন্দেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে এসে বাড়িতে ঢোকে। ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বকবক করে ও নিজেকে খাটো করতে চায় না।

খুদে লক্ষ্মীও দেরি করেই ওঠে, কিন্তু তার দেরি করে ওঠার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়ির পুরুষরা ভালো লোক নয়, ওকে দেখতে পেলেই হয়তো চোখ মারবে, অশ্লীল রসিকতা করবে—তাই ওরা কাজে বেরিয়ে না গেলে সে উঠতে সাহস করে না। দিনের বেলা বাঘিনীর সঙ্গে গল্পগুজব করে কিছুটা সময় তার কাটে, তাছাড়া কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেও হয়। কি করবে বেচারা! নিজের ব্যবসার একমাত্র বিজ্ঞাপন তার দেহ। দেহ দেখিয়ে না বেড়ালে খদ্দের জুটবে কেন? সন্ধ্যেবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে খদ্দের নিয়ে এসে বাড়ি ঢোকে।

বাড়ির বাসিন্দেদের ভিতরে জোরমস্ত আর খুশিই বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে। খুশির উঠোনে ঢুকতেই ভয় হয়, ঘরে ঢুকতে তো বটেই। বাসিন্দেদের কথাবার্তা তার ভালো লাগে না; তাই কোনোদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে উঠোনে একটা নিরালা জায়গা দেখে বসে পড়ে। ঘরে ঢুকতে গেলেই মনে হয়, এইবার মাদীকুত্তাটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে দেবে, তার জীবনীশক্তি শুষে নেবে। একে তো বদ্ধ

ঘর, তার উপরে বাঘিনী রয়েছে, সুতরাং তাড়াতাড়ি ঢোকা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আগে আগে বাধ্য হয়েই তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বাঘিনীর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হোতো—নইলে তার মুখের চোটে তিষ্ঠোনোই ভার হয়ে উঠত। আজকাল কিন্তু বাঘিনী খুদে লক্ষ্মীকে সই পেয়ে রাশ ঢিলে দিয়েছে। খুশি আজকাল বেশ রাত করেই ফেরে। বাঘিনী কিছুই বলে না।

আর জোরমন্ত—আজকাল সে প্রায়ই বাড়ি ফেরে না। তার মেয়ে কি ধরনের বেসাতি ফেঁদে বসেছে সে তা জানে, তাই বাসিন্দেদের কাছে এখন তার মুখ দেখানোই ভার। এদিকে মেয়েকেও যে ব্যবসা তুলে দিতে বলবে, তারও উপায় নেই। তার তো মেয়ে আর ছেলেদুটোকে খাওয়াবার সামর্থ নেই, তাই সে বাড়িতে না ফিরতে হলেই বেঁচে যায়। চোখে তো আর মেয়েকে ব্যবসা করতে দেখছে না, মনই বা তার খারাপ হবে কেন? কখনো কখনো মেয়ের উপর তার ঘেন্না ধরে যায়। মেয়ে না হয়ে ও যদি ছেলে হয়ে জন্মাত, তা হোলে কি আর এই হয়। মেয়েটা কেন যে বৌয়ের পেটে এসে হাজির হোলো! কখনো বা দুঃখ হয়—আহা বেচারী, ভাইদের জন্যেই না ভাড়া খাটছে!

কিন্তু ঘৃণা বা দুঃখ করেই বা ফল কি? সে তো আর কিছুই করতে পারবে না। তাই রেস্ত ফুরিয়ে গেলে লাজের মাথা খেয়ে মেয়ের কাছে এসেই সে হাত পাতে। তখন ওর মনে হয়, মেয়েটা ব্যবসা করে টাকা করেছে; সে বাপ, শাস্ত্রমতো সে-টাকার উপর তার অধিকার আছে বই কি। তাছাড়া মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছে মেয়েটা। সবাই ওকে ঘেন্না করে না? বাপ হয়ে সেও কি ওকে মাপ করতে পারে? জোরমন্ত টাকা চায় আর গালাগাল দেয়—সবাইকে সে জানিয়ে দিতে চায় মেয়ের বেসাতির জন্যে সে দায়ী নয়, খুদে লক্ষ্মীই নষ্ট মেয়ে, ওর মান সম্ভ্রম বলে কিছু নেই।

বাপ যখন এমনিধারা গালাগাল দেয়, খুদে লক্ষ্মী চুপ করে থাকে, একটু নিশ্বাসও ফেলে না। বাঘিনী বন্ধুর পক্ষ হয়ে রুখে আসে—গালাগাল দেয়, কখনো বা চলে যেতে অনুরোধ করে। জোরমন্ত কিন্তু শুধু হাতে ফিরতে রাজি নয়, কয়েকটা পয়সা তার হাতে গুঁজে দিতেই সে ঠাণ্ডা হয়। যা পায় তাই দিয়ে মদ কিনে সে খায়। নেশা ছুটে গেলে রাগের মাথায় হয়তো নদীতেই ঝাঁপিয়ে পড়বে—এই ভয়েই ওরা টাকা দেয়।

মাসের পনের তারিখ। গরম পড়েছে খুব। সূর্য উঠতে না উঠতেই মাটি তেতে উঠেছে। ধুলোর মেঘ কুয়াশার মতো চারদিক ঘিরে আছে, নিশ্বাস যেন বন্ধ করে দিচ্ছে। একটুও হাওয়া নেই। খুশি উঠোনে বেরিয়ে ধুলোভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর ঠিক করল, বিকেলে চারটে নাগাত সে রিক্সা নিয়ে

বেরুবে। যদি তেমন পয়সা রোজগার না হয়, রাতভোর রিক্সা টানবে। রাতটা নিশ্চয়ই দিনের বেলার চাইতে বেশ ঠাণ্ডাই হবে।

বাঘিনী তাকে জোর করে তখুনি পাঠাতে চাইল। খুশি বাড়ি থাকলেই মুশকিল। খুদে লক্ষী খদ্দের নিয়ে এলে তখন কি হবে?

ঘরই কি রাস্তার থেকে ঠাণ্ডা নাকি? দুপুরে তো কোনোদিন থাকনি—বাবাঃ মনে হয় দেয়ালগুলি পর্যন্ত কে যেন ভাজছে।

খুশি কোনো কথা বলল না। এক ঘটি ঠাণ্ডা জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

উইলো গাছগুলো পর্যন্ত নেতিয়ে পড়েছে; পাতার উপরে ধুলো জমে উঠেছে, কুঁকড়ে গেছে পাতা; ডালগুলোর যেন নড়ে উঠবারও সাধ্য নেই। তারা নুয়ে পড়েছে মাটিতে। পথে একবিন্দু জল নেই, শুকনো খটখটে রাস্তা ধূ ধূ করছে, ঝলসে উঠছে একটা সাদা আলো যেন। গলি ঘুঁজিতে ধুলোর ঝড় বইছে; কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধুলো—আকাশের ধূসরতায় মিশে এক প্রকাণ্ড জাজিম তৈরী করছে। নিচ দিয়ে যারা চলেছে তাদের মুখ পুড়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, চারদিক ফুটি ফাটা; কিছু ছুঁতে গেলে আঙুল পুড়ে যায়; দম বন্ধ হয়ে আসে; সারা শহর যেন এক জলন্ত ইঁটের পাঁজা। লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কুকুরগুলো ধুঁকছে গরমে, লাল জিভ বেরিয়ে পড়েছে; পথ ঘাট নিঝুম। ফেরি-ওয়ালাদের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে না, রাস্তার পিচ গলে উঠেছে; এমন কি দোকানের গায়ে আঁটা পিতলের ফলকগুলি পর্যন্ত যেন গরমে গলতে শুরু করেছে।

খাঁ খাঁ করছে নিস্তব্ধ পথঘাট; মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতার উপর তামা আর লোহার দোকানের টুং-টাং শব্দ আছড়ে পড়ছে, মনে কেমন যেন অস্বস্তি ঘনিয়ে উঠছে। রিক্সা না টানলে ভাত জুটবে না জেনেও রিক্সাওয়ালারা সোয়ারি নিতে চাইছে না। কেউ কেউ দরজায় রিক্সা রেখে ছাউনি তুলে দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে; কেউ বা চা-খানায় ঢুকে চায়ে চুমুক দিচ্ছে; অনেকেই রিক্সা না নিয়ে হালচাল দেখতেই পথে বেরিয়েছে। যাদের ভাগ্যে দুএকটা সোয়ারি জুটছে, তাদেরও অস্বস্তির অবধি নেই। জোরে ছোটা অসম্ভব, হেঁটে হেঁটেই চলেছে তারা। যখনি পথে কুয়ো দেখছে, রিক্সা থামিয়ে জল খেতে ছুটছে—জল যেন তাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। পথে কুয়ো না পেলে ঘোড়া বা খচ্চরের জন্যে চৌবাচ্চায় রাখা জল আঁজলা ভরে খেয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছে। কেউ কেউ সূর্যাহত হয়ে নেতিয়ে পড়ছে—কলেরার প্রথম লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে। মাথা নিচু করে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খুশিও ভয় পেয়ে গেছে। রিক্সা নিয়ে কয়েক পা যেতেই তার মনে হোলো গরম হাওয়া এসে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে; হাতের চেটো পর্যন্ত

ঘেমে উঠেছে। কিন্তু এমনি অবস্থায় সোয়ারি পেলে কি আর সে নেবে না? নেবে বই কি! ছুটতে পারলে একটু হাওয়াও পাওয়া যাবেখন। খুশি সোয়ারি পেল, ছুটতে ছুটতে সে বুঝতে পারল, এমনি আবহাওয়ায় কাজ করা অসম্ভব। ছুটতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে, গলা শুকিয়ে যায়; শুধু জল খেতে ইচ্ছে করে। আবার রিক্সা থামিয়ে খানিকক্ষণ যে জিরিয়ে নেবে তারও উপায় নেই। চড়া রোদ, পিঠের চামড়া পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। কোনোরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে সোয়ারিকে সে পৌঁছে দিল। পাজামা আর কামিজ ঘামে ভিজে গায়ে লেপটে গেছে। তাল পাতার পাখা বার করে বহুক্ষণ সে হাওয়া খেল—কিন্তু ওতে কি আর আরাম হয়? —ঠাণ্ডা নয়, গরম হাওয়া। কতবার সে এরই মধ্যে জল খেয়েছে তার ঠিক নেই। এবার সে ছুটল কাছের চা-খানায়। ছপেয়ালা গরম চা খেয়ে শরীরটা তার বুঝি জুড়োবে। গরম চায়ে চুমুক দিতেই আবার সারা গায়ে ঘাম ছুটল। তার মনে হোলো শরীরের ভিতরে একটা বিরাট গর্ত হয়ে গেছে, সেই গর্ত থেকে উপচে পড়ছে ঘাম। খুশি ভয় পেল। তার আর ছুটবার সাহস নেই।

চা-খানায় বহুক্ষণ কেটে গেল। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। কি আর করবে সে? বাইরে যেতে তার সাহস নেই। রোদ আরো চড়ছে, বেরুনো অসম্ভব। তাই বলে চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? না, এইতো আর প্রথম সে রিক্সা টানছে না, আর গ্রীষ্মকালও এই প্রথম আসেনি। বহু গ্রীষ্মই সে কাটিয়ে এসেছে। আজকের দিনটাকে বুদ্বুদের মতো সে উড়িয়ে দিতে পারবে না, একেবারে নিষ্ফলা হতে দেবে না। সে বেরুবার জন্যে উঠতে গেল; পা চলে না, শরীর কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। এত ঘাম ঝরল, তবু শরীরটা একটু হালকা লাগছে না; আরো কিছুক্ষণ সে বসে রইল। কিন্তু কাহাতক বসে থাকবে? এখানে বসে বসে ও তো ঘামছে, তার চাইতে বাইরে গিয়ে কাজের চেষ্টা করাই তো ভালো। একবার চেষ্টা করে সে দেখুক না।

বাইরে বেরিয়ে সে তার ভুল বুঝতে পারল। আকাশের ধূসর আস্তরণ মিলিয়ে গেছে, গাঢ় নীল রং দেখা দিয়েছে। দমআটকানো ভাব আর নেই। কিন্তু সূর্য আরো প্রখর হয়ে উঠেছে; কারো তাকাবার জো নেই—শুধু চোখ ধাঁধানো আলোর কণা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে, বাড়ির ছাদে, দেয়ালে আর পায়ের নিচের জমিতে। সব কিছু সাদা—একেবারে সাদা—তারই ভিতরে আগুন যেন লকলকে জিভ বার করে আছে। সমস্ত আকাশটা যেন আতশী কাচ, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেইখানেই তার লক্ষ্য। গরম গলে গলে পড়ছে, মনে হচ্ছে, এখুনি তোমার আশেপাশের সব কিছুতে আগুন ধরে যাবে। এই সাদা আলোয়

চোখ চাওয়া যায় না; যে কোনো রং চোখে ঘা দেয়; প্রতিটা শব্দ যেন চিৎকারে পর্যবসিত হয়, প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে পোড়া মাটির গন্ধ এসে নাকে লাগে।

পথে লোকজন নেই; সড়কগুলি যেন আরো চওড়া হয়ে গেছে। পথ তো নয়, এক পরিত্যক্ত চোখ ঝলসানো আলোর বদ্ধ জলা। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার উজ্জ্বল নিস্তরঙ্গতায় আলোড়ন তুলছে না।

দেখলে সত্যিই ভয় হয়। খুশি ভেবে পেল না, কি করবে। ঘাড় নিচু করে রিক্সা টেনে নিয়ে সে চলল। তার মন যেন উত্তাপের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। চলতে চলতে পা তার গরম হয়ে উঠল, ঘামে ভিজে গেল। মোজা পর্যন্ত জুবড়ে একাকার হয়ে গেছে, মনে হয় যেন কাদা ভেঙেই সে চলেছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। সে ঠিক করল, আর জল সে খাবে না। কিন্তু কুয়োর কাছে এসেই তার প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েক গণ্ডুষ জল সে খেয়ে নিল। না, তেষ্টা তার পায়নি; জল খেয়ে শুধু গলাটা ভিজিয়ে নিচ্ছে মাত্র। তাছাড়া জল গলায় গেলেই কেমন একটা ঠাণ্ডা আমেজে শরীর শির-শিরিয়ে উঠছে। এক মুহূর্ত—কিন্তু কি মধুর এই মুহূর্ত। তারপরেই তো ঢেঁকুর উঠে জল বেরিয়ে আসছে।

কিছুক্ষণ সে মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিয়ে পথ চলল। সোয়ারি নেওয়ার মতো সামর্থও আর নেই। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে, এখনো খিদে পাচ্ছে না। খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সে খাবে ঠিক করল। কিন্তু খাবার দেখেই পেট কিরকম গুলিয়ে গেল। না, না কুয়ো থেকে জল খেয়ে পেট ভরে গেছে, পেটের ভিতরে জলের শব্দ হচ্ছে—গাধা বা ঘোড়ার পেটে এমনি শব্দ সে বহুবার শুনেছে।

গ্রীষ্মের সঙ্গে শীতের তুলনা করলে, খুশি আগে হলপ করে বলতে পারত, শীতকালকেই সে বেশি ডরায়। কিন্তু গ্রীষ্মের যে এমনি ভয়াল চেহারা তা আগে কে জানত! এই শহরেই বহু গ্রীষ্ম সে কাটিয়েছে, কিন্তু এত গরম আর কোনোদিন পড়েনি। সত্যিই কি এবার খুব গরম পড়েছে, না তার শরীরে আর সে তাগদ নেই? এই ভাবনা হতেই তার মনের কুয়াশা কেটে গেল; শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠিকই তো! তার শরীরে আর সে জোর নেই! সে ভয় পেল, কিন্তু করবারও তো কিছু নেই। বাঘিনী তার শেষ শক্তিটুকুও নিঙড়ে নিচ্ছে। রাতের পর রাত এমনি চলছে। ভোরে ক্লান্তি লাগে; মনে হয়, হাত পা বুঝি আর নাড়তেও পারবে না। অথচ বাঘিনীকে সে তাড়িয়ে দিতেও পারে না। আর বেশিদিন নেই, জোরমন্ত বা সেই ঢ্যাঙা লোকটার মতোই তার দশা হবে। টাট্টু ঘোড়ার ঠাকুরদার মতোই বরাতে তার দুর্ভোগ আছে। খুশি একেবারে ফুরিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ঠিক দুপুরের পরেই আর একটা সোয়ারি সে পেল। গ্রীষ্মের দিনে এই সময়টাই সব চাইতে বেশি গরম পড়ে। কিন্তু সে ঠিক করে ফেলল, সোয়ারি নেবে। গরম বেশি পড়েছে তো বয়েই গেল। যদি সোয়ারিকে পৌঁছে দিয়ে সে খুব ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, তাহলে বুঝবে তার শরীরটা এখনো একেবারে বিগড়ে যায়নি। আর তা যদি না হয়, নিজের কাছেই যে সে ছোট হয়ে যাবে! সোয়ারি নিতেই যদি রিক্সাওয়ালা ভয় পায়, তার চাইতে তার মরে যাওয়া ভালো নয় কি?

সোয়ারি নিয়ে কিছুদূর এগুতেই হঠাৎ এক ঝাপটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার গায়ে লাগল। এ যেন গুমোট আবহাওয়ায় মুহূর্তের জন্যে দরজা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকল। সে নিজের ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করতে পারল না, উইলো গাছের ডালের দিকে তাকাল। হাঁ, হাঁ, ডালগুলো যেন দুলছে। এবার দলে দলে লোক আশেপাশের দোকান আর ঘর থেকে বেরিয়ে এল; হাতে তাদের তালপাতার পাখা। সবাই পরস্পরকে চিৎকার করে বলছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে! আঃ, গা এতক্ষণে জুড়োল। কি আনন্দ! সবাই যেন এখুনি ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করবে। উইলো গাছের পাতারা যেন স্বর্গের দূত, স্বর্গের বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে। উইলো গাছের ডাল নড়ছে! দোহাই স্বর্গের বুড়ো বাবারা, আরো হাওয়া দাও, আমাদের গা জুড়োক—সবাই চেঁচিয়ে কামনা করল।

গরম এখনো কমেনি, কিন্তু মন একটু সুস্থির হয়েছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া মনে আশা জাগিয়ে তুলেছে। সূর্যের তেজও যেন খানিকটা কমে এসেছে। এবার হাওয়া আরো জোর বইল, উইলো গাছগুলো সারাদিন চুপটি করে ছিল, এবার যেন সুখবর পেয়ে আনন্দে আর গর্বে নেচে উঠল। প্রবল বালির ঝড়ে আকাশ ঢেকে গেল, সূর্য ডুবে গেল। ঝড় কমতেই দেখা গেল, আকাশের উত্তর কোণে কালো মেঘ জমেছে। খুশির গায়ের ঘাম শুষে গেছে। উত্তর দিকে তাকিয়ে সে রিক্সার পর্দা ফেলে দিল। গ্রীষ্মের বৃষ্টি কখন যে এসে হাজির হয়, বোঝাই দায়! তৈরী হওয়ার ফুরসৎও দেয় না।

পর্দা ফেলতে না ফেলতেই আর একবার দমকা হাওয়া বয়ে গেল; কালো মেঘ যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। মাটি থেকে উত্তাপ উঠে ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে; চারদিকে ধুলোর গন্ধ। আকাশের দক্ষিণ কোণে এখনো মেঘ নেই—গ্রীষ্মের দীপ্ত আকাশ হাসছে, কিন্তু উত্তরে কালো কালির মতো মেঘের আড়ম্বর। এ যেন প্রকৃতির এক পরিহাস; ভয়ে বুঝি সকলের মাথা বিগড়ে গেছে। রিক্সাওয়ালারা তাড়াতাড়ি পর্দা ফেলছে, দোকানিরা সাইনবোর্ড খুলছে; ফেরিওয়ালারা পথ থেকে জিনিসপত্র তুলছে। পথিকরা জোরে পা চালিয়ে চলেছে, বাড়ি

ফিরবার জন্যে কি তাদের তাড়া! আর একবার দমকা হাওয়া বয়ে গেল। ধুলো ছেঁড়া কাগজগুলো উড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল। পথ একেবারে সাফ; শুধু উইলো গাছের ডালগুলো ঝড়ের গানের তালে তালে পাগলের মতো নাচছে।

আকাশ কালোয় কালো, তারই ছায়া পড়েছে মাটিতে। দীপ্ত গ্রীষ্মের বিকেল এখন নিশুতি রাতের আঁধারে ডুবে গেছে। হাওয়ার সঙ্গে এবার বড় বড় ফোঁটায় ধেয়ে এল বৃষ্টি। কাকে যেন সে খুঁজছে, এদিক ওদিক বারবার ধেয়ে যাচ্ছে। দূরে উত্তর আকাশে কালো মেঘ ছিঁড়ে খুঁড়ে বিদ্যুতের লাল আভা পোড়া মাংসের ভিতর দিয়ে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তধারার মতোই ঝলসে উঠল।

হাওয়ার জোর এখন কমতির দিকে। কিন্তু এখনো চাবুকের মতো মুখের উপর পড়লে শিউরে উঠতে হয়। সব কিছুকে জোরে নাড়া দিয়েই সে চলে যাচ্ছে—পিছনে রেখে যাচ্ছে অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কা। উইলো গাছগুলোও যেন ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে—কখন কি হয় কে জানে! মাথার উপরে আর একবার বিদ্যুৎ চমকাল। রুপোলি আলোর শানিত হাসির সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা ধুলোর উপরে পড়তে লাগল। খুশি ভিজে একসা হয়ে ঠক ঠক করে শীতে কাঁপতে শুরু করল।

হাওয়ার জোর এবার আগের চাইতেও ভয়ানক হয়ে উঠল। উইলোর ডাল ভেঙে ধুলোর ঘূর্ণি তুলে মুষলধারে নেমে এল বৃষ্টি। হাওয়া, ধুলো, বৃষ্টি—সব যেন মিশে গিয়ে এক অসীম শক্তিশালী রাক্ষসে পরিণত হয়েছে। সে আকাশ ঢেকে ফেলেছে, পৃথিবীকে গ্রাস করতে চাইছে। গাছপালা, মাটি, মেঘ, জল, সব একাকার হয়ে গেছে; দিক-দর্শন-যন্ত্রের কাঁটা বিকল; চারদিক থেকে শুধু উঠছে দীর্ঘ গোঙানি। হাওয়া কমতেই বৃষ্টির জোর আরো বেড়ে গেল, থেমে থেমে আকাশ ছিঁড়ে খুঁড়ে পড়ছে বৃষ্টি, মাটি চষে ফেলছে যেন। আকাশ আর পৃথিবীকে চেনা দায়, এমনি আঁধার। মাঝে মাঝে শুধু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চোখের সুমুখে মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠছে অসীম জলরাশি।

খুশির জামা-কাপড় আগেই ভিজে গেছে; শরীরের কোনো জায়গা শুকনো নেই; টুপির নিচে চুলগুলি পর্যন্ত ভিজে গেছে। পায়ের নিচে বৃষ্টির জলে নদী হয়ে গেছে; চলতে কষ্ট হচ্ছে, উপর থেকে মাথায়, পিঠে মুখে ঝরছে বৃষ্টি। মাথা তোলা, চোখ মেলা বা নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলাও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুশি জলের ভিতরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পথ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে—সামনে না পিছনে যাবে ভেবে পেল না। ঠাণ্ডা জল ঝরছে, কাপড়-জামার ভিতর দিয়ে তীরের ফলার মতো হাড়ে এসে ঢুকছে ঠাণ্ডা। কানে বাজছে বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ, শরীরের ভিতরে জ্বালা করছে। খুশি রিক্সা থামাতে চাইল, কিন্তু কোথায়

থামাবে? ছুটতে গেলে পায়ে জল বাধছে, এগুতে পারছে না। উপায় কি? কোনোরকমে মাথা নিচু করে সে রিক্সা ঠেলে নিয়ে এগিয়ে চলল। সে যেন আধমরা মানুষ, কোনোরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে। সোয়ারির অবস্থাও তাই। কোনো সাড়া শব্দ নেই—খুশির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সে মড়ার মতো বসে আছে।

এবার বৃষ্টি ধরে এল। খুশি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কত্তা, আসুন কোথাও গিয়ে দাঁড়াই। একেবারে ধরে গেলে বেরিয়ে পড়ব।

না, না, জলদি চল! এই জলঝড়ে কোথাও দাঁড়াতে পাবে না! সোয়ারি জোরে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠল।

খুশির ইচ্ছে হোলো, রিক্সা নামিয়ে রেখে সে কোথাও ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু নিজের চুপচুপে ভিজে কাপড়-জামার দিকে তাকিয়ে সে নিরস্ত হোলো। এখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। কোথাও গিয়ে খানিকক্ষণ জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই হয়েছে আর কি! ঠাণ্ডা লেগে ঠিক জ্বর হবে। দাঁতে দাঁত পিষে সে আবার ছুটতে লাগল; কিছুদূর যেতে না যেতেই আকাশ কালো হয়ে গেল, আবার চারদিক ঝাপসা হয়ে নামল বৃষ্টি। তবু খুশি থামল না। সে জলঝড় তুচ্ছ করেই ছুটল।

সোয়ারিকে ঠিকানায় পৌছে দিতেই সে নেমে পড়ে আগে যা ভাড়া ঠিক হয়েছিল তাইই তার হাতে গুঁজে দিল। এক পয়সা বকশিসও দিল না। খুশি কোনো কথা বলল না, হাত পেতে পয়সা কটা নিল। অনেক ধকলই তো তার উপর দিয়ে আজ গেছে, সামান্য দুএক পয়সার জন্যে ঝগড়া করতে সে রাজি নয়। একেই তো বাঁচবার জন্যে সে প্রাণান্ত হচ্ছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল, কিন্তু আবার বড় বড় ফোঁটায় বর্ষণ শুরু হোলো। খুশি এবার রিক্সা ঠেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চলল। কোথাও সে একটুও জিরোলো না। আগুনের পাশে বসে হাত পা সেঁকে নিল। সারা শরীর যেন পাতার মতো কাঁপছে। বাঘিনী এবার এক পেয়ালা আদা-চা করে নিয়ে এল। বাহাত্তুরে বুড়োর মতোই কাঁপতে কাঁপতে পেয়ালাটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিয়ে খুশি বিছানায় গা এলিয়ে দিল। চেতনা তার আর নেই। চারদিকে কি ঘটছে সে জানে না। শুধু কানে বাজছে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ। এ যেন এক ঘুমহীন ঘুম—ঘুমে সারা দেহ অবশ হয়ে গেছে, অথচ কোথাও যেন রয়েছে বেদনার এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

চারটের সময় কালো মেঘের দল যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ল। বিদ্যুতের যেন আর সে শক্তি নেই। আকাশে চকমকির মতো সামান্য একটু আভা ছড়িয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সোনালি ইঙ্গিতে দেখা দিল; বাজের

হাঁকডাকও কমে গেল। পুব আকাশে দেখা দিল সাতরঙা রামধনু। ধনুকের একপ্রান্ত মেঘের ভিতরে, আর একপ্রান্ত নীল আকাশে উঁচিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরেই রামধনু মিলিয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘেরও আর চিহ্ন রইল না। এবার দেখা দিল নীল; নীল আকাশ। অন্ধকারের গহ্বর থেকে সে যেন ঔজ্জ্বল্য আর সৌন্দর্যের মহিমা নিয়ে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করেছে।

দুএকটা রঙ-বেরঙের পোকা উড়ে এসে উঠোনে বসেছে। ছেলেমেয়েরা খালি পায়ে তাদের পিছনে তাড়া করছে, সোর-গোল তুলছে। কিন্তু বাসিন্দেদের সেদিকে দৃষ্টিই নেই। ঝড় থেমে গেছে এই তো যথেষ্ট, কে আবার রঙ-বেরঙের পোকা, রামধনু বা নতুন পৃথিবীর কথা নিয়ে মাথা ঘামায়! এতক্ষণ জলঝড়ে তারা দেখবার সুযোগ পায়নি, কি সর্বনাশ তাদের হয়ে গেছে। এবার লোকসান খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে। রামধনু আর বিচিত্র রঙের পোকার দিকে চেয়ে সময় কাটিয়ে দিলে চলবে না। ক্ষুদে লক্ষ্মীর ঘরের পেছনের দেয়াল ধ্বসে গেছে। সে আর তার দুটো ছোট ভাই মাদুর দিয়ে দেয়ালের গর্তগুলি ঢাকবার চেষ্টা করছে। উঠোনের দেয়ালও জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে। ভাঙা ইঁট আর মাটি ছড়িয়ে রয়েছে উঠোনে। কিন্তু কেউ সেদিকে নজর দিচ্ছে না, সবাই নিজের নিজের ঘর নিয়েই ব্যস্ত। কতকগুলো ঘরের মেঝে একেবারে নিচু, বাইরে থেকে জল ঢুকে সব ভিজিয়ে দিয়েছে। এখনো ঘরে জল থই থই করছে। সমস্ত পরিবার ভাঙা বাটি ঘটি নিয়ে জল সেঁচছে। কোনো কোনো ঘরে ছাদ চুইয়ে ঝাঝরির মতোই জল পড়ছে, বিছানাপত্র সব ভিজে গেছে। পরিবারের সবাই জিনিসপত্র টানাটানি করে বাইরে আনছে, কেউ বা উনুনের ধারে অথবা রোদে মেলে দিচ্ছে। জলঝড় হলে তাড়াতাড়ি ওরা ঘরে গিয়ে ঢোকে, অথচ ঘরও তেমন মজবুত নয়, যে কোনো সময় মাথায় ভেঙে পড়ে তাদের জ্যান্ত গোর দিতে পারে; ঝড় থেমে গেলে নিজেদের ক্ষতি খতিয়ে দেখতে বসে যায়। এই বাড়ির বাসিন্দেদের এই হাল। বৃষ্টি হলে চালের দর কয়েক পয়সা নামে বটে, কিন্তু তাতে তাদের কিছু সুবিধে হয় না। তাদের তখন বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে, দুএক পয়সা বাঁচিয়ে সে ক্ষতি পূরণ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। তারা মাসে মাসে নিয়মিত ভাড়া গোনে বটে, কিন্তু বাড়ি সারাবার জন্যে বাড়িওয়ালা কোনোদিনই লোক পাঠায় না। এক যদি বাড়ি ঘর পড়ে গিয়ে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠে তখনই তার টনক নড়ে। তখন মিস্ত্রী আসে, কিছু কাদা আর ভাঙা ইঁট দিয়ে দায় সারা গোছের করে দেয়াল মেরামত করে দিয়ে যায়। কিন্তু সেকি আর মেরামত? কিছুদিনের জন্যে ঠেকনা দিয়ে কোনোরকমে দাঁড় করিয়ে রাখা আর কি? তেমনি পড়ে যেতেও খুব দেরি হয় না। অথচ বাড়িওয়ালার

ভাড়া আদায়ের দিকে কড়া নজর। কারো এক পয়সা ভাড়া পড়ে থাকবার উপায় নেই। যদি কেউ ভাড়া দিতে না পারে, তাহলে তার বাক্স, বিছানাপত্র কেড়ে রেখে তাকে পরিবার শুদ্ধ বাড়ির বার করে দেয় বাড়িওয়ালা। কিন্তু ছাদ ভেঙে পড়ুক বা দেয়াল পড়ে গিয়ে তোমাকে পিষে ফেলুক, সেদিকে তার নজর নেই। যে কটা টাকা তারা ভাড়া দেয় তাতে অতো-শতো দেখতে গেলে চলে না। দেয়াল গর্ত হয়ে ভাড়াটেদের জীবন বিপন্ন হয়েছে? তাতে হয়েছে কি? এ তো ওদেরই দোষ—ওরা যে গরীব! এদের কাছে ঝড়ের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ অসুখ। এখানকার বুড়ো থেকে শুরু করে বয়স্ক এবং ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে বাঁচবার জন্যে লড়াই করছে, তাদের শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। তাদের গা দিয়ে বেরুচ্ছে ঘাম, লোমকূপ দিয়ে বেরুচ্ছে ঘাম, কিন্তু তবু তারা কোনোরকমে জীবন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু ঝড় এলে তাদের আর উপায় নেই। ঝড়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে তারা পারে না। ঝড়ের পরেই নানা রোগ দেখা দেয়। নিজেদের এক-আধ দিন জ্বর হলে তারা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু যদি ছেলে-মেয়েদের কারো হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়ে তাহলেই বিপদ। টাকা তো নেই যে ডাক্তার ডাকবে, কিনে আনবে ওষুধ। বৃষ্টি ভালো বইকি। কাওলিয়াঙের শীষ বৃষ্টির জল পড়লেই ফনফনিয়ে বেড়ে উঠে। কিন্তু যারা চাষ-বাস করে তাদের পক্ষেই তা ভালো। শহরের গলি ঘুঁজিতে দারিদ্র্যের আঁস্তাকুড়ে যারা জীবন কাটায়, তাদের কাছে বৃষ্টি আসে রোগ আর মৃত্যু নিয়ে। বৃষ্টিধারা তাদের ছেলে-মেয়েদের মৃত্যুর বিষ ছড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। আর শুধু ছেলে-মেয়েরাই বা কেন? বয়স্করাও রেহাই পায় না, বরং মৃত্যু আরো ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়।

তবু স্বপ্ন দেখে কবিরা। বর্ষার ছোঁয়া পেয়ে পদ্মকে মুক্তোর মতো পাপড়ি মেলতে দেখে আনন্দে মেতে উঠে কবিতা লেখে, রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গরীবরা? তারা স্বপ্ন দেখবার ফুরসৎ পায় না। ঝড় থেমে গেলে তারা অসুখে পড়ে, সমস্ত পরিবার উপোস করে। এক একবার ঝড় হয়, আর বেশ্যা-বাড়িতে তাদের মেয়েদের সংখ্যা বাড়ে, ছেলেরা চুরি করে; জেলখানাগুলো ভরে ওঠে। বৃষ্টি পড়ে ধনী আর দরিদ্র সকলের উপরই। বৃষ্টির কাছে অত্যাচারী আর অত্যাচারিত কেউ বাদ যায় না! কিন্তু সেখানেও দেখা দেয় এর থেকে এক হীন শ্রেণী-বৈষম্য, কারণ যে পৃথিবীতে সে পড়ে সে তো অন্যায় আর অসাম্যে ভরা।

খুশি বৃষ্টিতে ভিজে অসুখে পড়ল। সে একা নয়!

উনিশ

দুদিন দুরাত খুশি অচেতন হয়ে রইল। বাঘিনী তো ভয়ে দিশেহারা। সে দয়ার দেবীর মন্দিরে গিয়ে ধর্না দিল। গোল একটা বাক্সে কতগুলো বাঁশের ছোট ছোট টুকরো ঝাঁকিয়ে সে মাটিতে ফেলল। যদি এক একখানা করে মাটিতে পড়ে—তাহলে সে বুঝতে পারবে খুশি এযাত্রা বেঁচে যাবে। তারপর ধূপকাঠি পোড়া ছাই নিয়ে দুতিন রকম লতাপাতার রসে গুলে তাকে খেতে দিল। এমনি নীল ওষুধ খাওয়াবার পর খুশি একবার চোখ চেয়ে আবার পাশ ফিরে ঘুমোলো। এবার তার গলা দিয়ে বেরুতে লাগল বিদঘুটে আওয়াজ।

বাঘিনী এবার ডাক্তার ডাকল। ডাক্তার এসে খুশির গায়ে দুবার ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন, তারপর খেতে দিলেন একদাগ ওষুধ। রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। চোখ চেয়েই সে বলল, এখনো বিষ্টি পড়ছে নাকি ?

বাঘিনী আর একদাগ ওষুধ খাওয়াতে যেতেই কিন্তু খুশি আপত্তি করল। আবার অনর্থক টাকা নষ্ট করে ওষুধে লাভ কি হোলো ? নিজের উপর তার ঘেন্নাও হোলো। ছিঃ ছিঃ, সামান্য বৃষ্টি তাকে বিছানায় পেড়ে ফেলল—এই তার শরীর ! এখন কিনা শুয়ে শুয়ে ঐ তেতো ওষুধগুলো গিলতে হবে ? আর ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই একথা প্রমাণ করবার জন্যে সে উঠে পড়বে ভাবল এখুনি সে উঠে পড়বে, কামিজটা কোনোরকমে গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যাবে কিন্তু বিছানায় উঠে বসতে না বসতেই একি বিভ্রাট। মাথাটা অসম্ভব ভারী ঠেকছে। এক বিরাট পাথর যেন চেপে বসেছে মাথায়। পিষেই ফেলবে বুঝি তার ঘাড়টা যেন কেমন পলকা, মাথার ভার সইতে না পেরে মট করে বুঝি ভেঙেই যাবে। চোখে তো সোনালি তারার ফুলঝুড়ি দেখতে শুরু করেছে আপত্তি করে আর লাভ নেই। নাক মুখ সিঁটকে কোনোরকমে সে ওষুধ গিলে ফেলল।

দশদিন বিছানায় পড়ে রইল খুশি। যত দিন কাটতে লাগল, খুশি ততই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বালিস আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে সে কত কাঁদল। বাইরে গিয়ে রোজকার করবার তার উপায় নেই। বাঘিনীই এখন তার সামান্য যা কিছু জমানো টাকা আছে তাই ভেঙ্গেই সংসার চালাচ্ছে। কটা বা টাকা ? টাকা কটা ফুরিয়ে গেলে তখন কি হবে ? একমাত্র রিক্সাখানা ছাড়া আর কোনো সম্বলই থাকবে না। তারপর বাঘিনীর

যেমন ভালোমন্দ খাওয়া আর টাকা ওড়ানো স্বভাব, সে কি করে সংসার চালাবে? তার উপরে আবার পোয়াতি! ভালো জিনিসের উপর এখন তার লোভ হওয়া স্বাভাবিক—বাঘিনী তো সেই কথাই বলছিল সেদিন। খুশি অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু অসুখ তাতে বাড়ল বই কমল না।

কদিনেই ভয় কেটে গেল। খুশি এখন সারবার মুখে। বাঘিনীকে সে একদিন জিজ্ঞেস করল, রিক্সাখানা কি হোলো?

ভয় নেই গো! রিক্সাখানা আমি ভাড়া দিয়েছি।

কাকে?

সেজ ডিঙকে দিয়েছি।

ওঃ! খুশির কেমন যেন অস্বস্তি লাগল। সে যা ভেবেছিল ঠিক তাইই! সেজ-ডিঙকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে বাঘিনী! অসুখের ভেতরেও এই কথা ভেবে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। সেজ ডিঙ কি আর রিক্সার মায়া করবে? হয়তো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ভেঙেচুরে একাকার করে দেবে। যদি নাও ভাঙে, রিক্সার আয়ু কমিয়ে দেবেই। কিন্তু উপায় কি? সে নিজে তো আর চালাতে পারছে না, রিক্সাখানা বসিয়ে রেখেই বা লাভ কি? ভাড়া দেওয়াই ঠিক হয়েছে। সে মনে মনে হিসেব করতে লাগল। সে নিজে যদি রিক্সা টানত, রোজ যেমন করে হোক পঞ্চাশ-ষাট সেণ্ট রোজগার করতে পারতই। দুজনের সংসারের বাড়ি ভাড়া, কয়লা, চাল, জ্বালানিকাঠ, লম্পো, তেল, চা—এসব কিনতে হলে ও রোজগারে কুলোয় না। নতুন পোশাক কেনা তো দূরের কথা, একটা পয়সা করে ঐ রোজগার থেকে বাঁচানোও শক্ত। তার উপর সে তো আজ কদিন শুয়ে রয়েছে। এখন তো পঞ্চাশ-ষাট সেণ্টের বদলে রিক্সা ভাড়া দিয়ে দশ সেণ্টের বেশি রোজ পাওয়া যাবে না। এই এখন তাদের রোজগার। কিন্তু এতে সে কুলোবে কি করে? আর চল্লিশ কি পঞ্চাশ সেণ্ট কোথা থেকে আসবে? ওর মধ্যে ওষুধের দামের দরুণ কিছুই ধরা হয়নি।

যদি সে একেবারেই সেরে না ওঠে? হাঁ, হাঁ, তাই! জোরমস্তকে তার মাতলামোর জন্যে দোষ দেওয়া যায় না; নিজের গরীব ভাই-বেরাদারকে তাদের বোকামি আর খারাপ স্বভাবের জন্যেও গালমন্দ করা চলে না। ওদের দোষ কি? রিক্সাওয়ালার ঐ ভাগ্য! একেবারে বন্ধ রাস্তা—কোনোদিকে এগুবার উপায় নেই। তুমি যতই পরিশ্রম কর, যতই উঁচুনজর তোমার থাক, বিয়ে করলে, কি একবার রোগে পড়লে তুমি গেলে! এ যেন চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে বেলাইনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়া আর কি! ওঃ! তার প্রথম রিক্সা আর জমানো টাকার কথা মনে পড়ল। সে জীবনে কারো মনে দাগা দেয়নি, কারো অনিষ্ট করেনি, এমন কি তখন তার বিয়েও হয়নি। অসুখ-বিসুখও তো তার

ছিলই না। কিন্তু তার জমানো টাকা, আর নতুন রিক্সাখানা সে হারাল কেন? উত্তর কে দেবে? তাইতো বার বার তার মনে হয়েছে, জীবনে ভালো আর মন্দ যাই-ই তুমি হও না কেন, রিক্সাওয়ালার ভাগ্যই এক অলাদা। যে পথে তারা চলেছে, সে মরনের পথ—সেখান থেকে কারো রেহাই নেই। যখনই হোক মৃত্যু ঠিক এসে হানা দেবেই—তা যেরকম ভাবেই আসুক। চিন্তা নিয়ে এল নিরাশা। হুঁ! বেজন্মার দল! উঠতে না পারলে, এমনি করে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেবে—আর উপায় কি? আর উঠতে পারলেই বা এমন কি সুবিধে? একই তো তাদের পথ—একই জায়গায় গিয়ে শেষ হবে। তার চেয়ে চিন্তা ভাবনা ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে সে শুয়ে থাকবে। কিন্তু কতক্ষণই বা শুয়ে থাকা যায়? অসহ্য হয়ে উঠল চিন্তা। বিছানায় উঠে বসতে চেষ্টা করল। আবার রোজগার করতে বেরুবে। রাস্তা বন্ধ—মৃত্যু হাঁ করে আছে—কিন্তু মানুষের মন তো আর কুলুপ বন্ধ নয়। সে জেগে আছে, বেঁচে আছে: যতদিন পর্যন্ত কফিনে না শুয়ে পড়ছে ততদিন পর্যন্ত আশা আকাঙ্ক্ষার তার অবধি নেই।

খুশি আর একবার উঠে বসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কি আর করবে, এবার সে বাঘিনীর দিকে চেয়ে বলল:

আগেই বলেছিলাম রিক্সাটা বড় অপয়া।

সেরে ওঠবার কথা ভাব না গা, তা না শুধু রিক্সার কথা। তুমি কি রিক্সা-পাগলা হয়ে উঠলে নাকি?

খুশি চুপ করে রইল। হাঁ, সে ঠিক রিক্সা-পাগলাই বটে। যেদিন সে প্রথম রিক্সা টানতে শুরু করেছে, সেইদিন থেকেই রিক্সাই তার ধ্যান জ্ঞান, তার আশা আকাঙ্ক্ষা।

অসুখ একটু ভালো হতেই খুশি উঠে আয়নায় মুখ দেখল। একি! যার ছায়া পড়েছে, তাকে তো সে চিনতে পারছে না! সারা মুখ দাড়িতে ভরে গেছে; তার কপাল আর গালে বুড়ো-বুড়ীদের মতো খাঁজ পড়েছে; চোখ তো নয় যেন দুটি গর্ত; এমন কি মুখের সেই ক্ষতটায় পর্যন্ত খাঁজ দেখা দিয়েছে। খুশি আয়না রেখে উঠে দাঁড়াল। উঃ কি ছোট ঘর, অসহ্য গরম লাগছে! বাইরে একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই ভালো। কিন্তু উঠোনে নামতে পর্যন্ত সে সাহস করল না। পা যেন কেমন টলছে, হাড় বলে কোনো পদার্থ বোধ হয় আর নেই। তাছাড়া এমনি অবস্থায় দেখে ফেললেই বা লোকে ভাববে কি? শুধু এই বাড়িতেই নয়, শহরের দক্ষিণ তল্লাটের রিক্সার আড্ডায় তাকে পয়লা নম্বরের রিক্সাওয়ালা বলেই জানে। কড়া তার জান। খুশি আর এই নড়বড়ে

দুর্বল লোকটায় অনেক তফাত—এরা এক লোক হতেই পারে না! খুশি বাইরে যেতে পারল না, এদিকে ঘরে বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠল। নিজের উপর বিরক্তি ধরে গেল! একসঙ্গে একগাদা খাবার গিলে আগের তাগদ ফিরে পাওয়া যায় না কেন? তাহলে তো সে এখুনি রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু তা আর হয় না। অসুখ তার শিকারকে বিছানায় পেড়ে ফেলতেই উদয় হয়, আর খুব সহজে চম্পট দেওয়ারও তার কোনো লক্ষণ নেই।

আস্তে আস্তে খুশি সেরে উঠতে লাগল। পুরোপুরি আগের তাগদ ফিরে না পেলেও সে রিক্সা টানতে শুরু করল। তাগদ ফিরে আসতে এখন ঢের দেরি ততদিন বসে থাকাও মুস্কিল। সে এখন আর জোরে ছোটে না, কেউ তাকে তো আর চিনতে পারবে না যে জোরে ছুটবে। টুপিটা সে চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দেয়। খুশি—এই নামে পরিচয় দিতে আর তার ইচ্ছা নেই। খুশি নামের মানেই যেন জোরে ছোটা—কিন্তু এখন তো সে আর জোরে ছুটতে পারে না। এখন আস্তে আস্তে পা ফেলে কোনোরকম নেঙচে নেঙচে তাকে চলতে হয়—এখন আর ও-নামে পরিচয় দিয়ে লাভ কি? সবাই তো ঈর্ষার চোখে ওর দিকে তাকাবে না, বরং ঘেন্নাই করবে।

একে তো শরীরটা জুতসই নেই, তার উপরে খুশি এতদিনের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবার জন্যে দুএকটা বেশি সোয়ারি টানতে শুরু করল। কিন্তু অতো ধকল সইবে কেন? আবার অসুখ হোলো, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল আমাশা। খুশির রাগে নিজেকে নিজেই চড়াতে ইচ্ছে হোলো, কিন্তু তাতে লাভ কি। শরীরও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, এমন কি, বুকে আর পেটে যেন এক হয়ে গেছে। তবু আমাশা কমল না। যখন আমাশা থেকে সে সেরে উঠল তখন চলবার শক্তিই তার চলে গেছে। দু পা যেতে হলে দুবার জিরিয়ে নিতে হয়—এমনি অবস্থা। রিক্সাটা টানবার তো কথাই ওঠে না। সুতরাং আর এক মাস তাকে জিরোতে হোলো, এদিকে বাঘিনীর পুঁজি তখন ফুরিয়ে এসেছে।

অষ্টমচন্দ্রের পনেরোই সে রিক্সা নিয়ে আবার পথে বেরুল। মনে মনে শপথ করল, যদি আবার বিছানায় শুতে হয়, তাহলে সে ডুবেই মরবে।

তার অসুখের সময় খুদে লক্ষ্মী বহুবার তাকে দেখতে এসেছে। খুশির জিভে বাঘিনীর মতো ধার নেই, বরং বোবা হয়েই চিরটা কাল সে কাটিয়েছে। তবে এমনি সে খুদে লক্ষ্মীর সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি, কিন্তু অসুখের ভিতরে দুএকটা বলেছে। বুকখানা যা দমসম মেরে ছিল, কথা বলে তবু কিছুটা ভার লাঘব করে দিয়েছে, কিন্তু বাঘিনী এতে খুশি তো হয়ই নি বরং চটে গেছে। খুশি যখন বাড়ি থাকে না, খুদে লক্ষ্মী তার প্রাণের বন্ধু। কিন্তু খুশি বাড়ি

এলেই খুদে লক্ষ্মীকে শত্রু বলে মনে করে। নষ্ট দুষ্টু মেয়ে, কখন কি সর্বনাশ করে বসবে কে জানে। ওর তো আর মান-সম্ভ্রমের ভয় নেই, গায়ে ঢলে পড়ে ছেনালি করলেই হোলো।

বাঘিনী খুদে লক্ষ্মীকে চেপে ধরল। তার টাকা শোধ দিতে হবে। এও বলে দিল, রাতের অতিথদের তার ঘরে এনে সে আর বসাতে পারবে না।

খুদে লক্ষ্মী বিশ হাত জলে পড়ল। এতদিন তবু খদ্দেরদের বসাবার জন্যে একটা ঘর ছিল, এবার তাও গেল। তাদের নিজেদের ঘর তো নড়বড়ে একটা কুঠরী, তাও দেয়াল ধসে গিয়ে যে অবস্থা হয়েছে, তা আর কহতব্য নয়। কোনোরকমে চাটাই গুঁজে, ঠেকনা দিয়ে রাখতে হয়েছে। ওখানে কোনো ভালো খদ্দের ঢুকতে সাহস করবে না। এক হয়, যদি চালানী কোম্পানিতে সে নাম লিখিয়ে আসে। কিন্তু কোম্পানি তার মতো মালের ব্যবসা করে না। তাদের নজর খুব উঁচু। তাদের কারবার চলে স্কুলের ছাত্রী আর বড়ো বড়ো ঘরের মেয়ে নিয়ে। তাদের দরও খুব বেশি। বাজে জিনিস দিয়ে গুদাম ভরতি করতে তারা রাজি নয়। তার আর কোনো উপায় নেই। এবার তাকে খাঁটি বেশ্যা-বাড়িতে গিয়েই উঠতে হবে। তার তো আর অন্য কোনো পুঁজি নেই, দেহ ভাঙিয়েই তো তাকে খেতে হবে। কিন্তু সেখানে স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। না থাকলেই বা উপায় কি? ছোট ভাইগুলিকে কে দেখবে। এক মরে গেলে সে সব ভাবনা চিন্তা থেকে রেহাই পায়। কিন্তু মরা তো সোজা ব্যাপার—মরতে সে রাজি নয়। বরং বেঁচে থেকে দুঃখ কষ্টই সে সইবে, সে সাহস তার আছে। এমনি দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে ভাইদুটিকে মানুষ করে তুলতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। তারা যখন রোজগার করতে শিখবে, তখন তার মরাই ভালো। সকলের কাছে ওদের মাথা হেঁট করে আর থাকতে হবে না—আর সেও এই ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পাবে।

কিন্তু এখন কি উপায়? এখন তাকে আরো সস্তা দামে নিজেকে বিকোতে হবে। তার এই ভাঙা, নড়বড়ে গর্তে যারা আসবে, তারা নিশ্চয়ই বেশি পয়সা কেউ দিতে চাইবে না। কি আর হবে; কম পয়সা দিলেও হাত পেতে তাকে নিতে হবে। তবু তো ছোট ভাইগুলোর পেটে দানা পড়বেখন। তাছাড়া এখন আর পোশাক আর রুজে পয়সা খরচ করতে হবে না। যারা তার খদ্দের হবে, তারা পোশাক আর রুজের ধার ধারে না। দুচার পয়সা ফেলে একটা মেয়ের শরীর নিয়ে চটকাতে পেলেই অটুট শান্তি। যেমন দান, তেমনি তো দক্ষিণা; সে বুড়িয়ে যায়নি এইতো তাদের কাছে যথেষ্ট।

বাঘিনীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সন্তান দিন দিন বেড়ে উঠছে। এখন আর নড়তেও তার ইচ্ছে করে না। এমন কি কিছু কিনে খাবার ইচ্ছে

হলেও বাইরে যেতে তার আলিস্যি লাগে। খুশি আজকাল কাজে বেরিয়ে যায়, সারাদিনে আর ফেরে না। খুদে লক্ষ্মীও আর আসে না। বাঘিনীর মনে হয়, সে যেন খালি বাড়িতে শিকলে বাঁধা একটা কুকুরের মতোই একা পড়ে আছে। সবাই যেন তার বিরুদ্ধে ষড় করেছে, তাকে একা রেখে পালিয়ে গেছে। খুশির তো সারাদিনে দেখা নেই। খুদে লক্ষ্মীটাও ওকে জ্বালাবার জন্যেই এই সস্তার ব্যবসা খুলে বসেছে। বাঘিনী হিংসেয় জ্বলে উঠল। না, ওকে এমন নিশ্চিন্তে সস্তা ব্যবসা করতে সে দেবে না। সে ওকে জব্দ করবে। বাঘিনী এবার সুমুখের ঘরটায় এসে ঝাঁকিয়ে বসল। সে ওৎ পেতে রইল, কখন খুদে লক্ষ্মীর খদ্দের আসে। খদ্দের এসে ঢুকতেই শুরু হোলো গালাগাল, খদ্দের আর খুদে লক্ষ্মী দুজনেই লজ্জায় মরে গেল। এমনি করে দিনের পর দিন চলতে লাগল। খুদে লক্ষ্মীর খদ্দের কমে এল। গাল খেতে কে আর আসবে। পুরনো বন্ধুর ভাত মেরে বাঘিনী আবার খুশি হয়ে উঠল।

খুদে লক্ষ্মী বুঝতে পারল, এমনি ধারা গালাগাল চললেই হয়েছে আর কি! ব্যবসা করে তো খেতে হবেই না, বরং উঠোনের আর আর বাসিন্দেরাও এবার বাঘিনীর সুরে সুর মেলাতে শুরু করবে। হয়তো, বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দেবে। খুদে লক্ষ্মী ভয় পেল; রেগে উঠতেও আর সাহস হোলো না। তার মতো অবস্থায় যখন মানুষ পড়ে তখন চোখের জল বা রাগের আগে তারা বাস্তবকেই তলিয়ে দেখে। উচ্ছ্বাস দেখাবার তাদের উপায় নেই। খুদে লক্ষ্মী তার দুইভাইকে নিয়ে বাঘিনীর পা জড়িয়ে ধরল, কোনো কথা সে বলল না। তার মুখ দেখে বোঝা গেল, এই চূড়ান্ত অপমান সইবার পরও যদি বাঘিনীর মন টলাতে না পারে, তাহলে সে মরবে। কিন্তু বাঘিনী তো কারো মরাবাঁচার ধার ধারে না।

অপমান মুখ বুজে সয়ে যাওয়াই মানুষের জীবনের সবচাইতে বড় ত্যাগ। এর থেকেই তীব্র প্রতিরোধশক্তি দেখা দেয়।

হঠাৎ এমন ব্যাপার হবে বাঘিনী ভাবতে পারেনি। সে থ' মেরে গেল! মুখে তার কথা সরল না। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে, কিন্তু এই ফুলে-ওঠা পেট নিয়ে লড়াই করতে যাওয়াও বিপদ। যখন সে যুদ্ধং দেহি বলে এগিয়ে আসতেই পারল না তখন সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে পড়া। বাঘিনীও ঠিক তাই করল। আরে, খুদে লক্ষ্মীর সঙ্গে সে একটু ঠাট্টাই করেছিল। কি বোকা মেয়ে গো! ঠাট্টাকে সত্যি বলে ধরে নেবে এমন সে ভাবতেও পারেনি। খুদে লক্ষ্মীর চোখ নেই বলেই তো সব জিনিসই অমনি করে ভাবে। এমনি করে যে জট দুজনের মধ্যে পাকিয়ে উঠেছিল, তা আলগা হয়ে গেল তারা আবার বন্ধু হয়ে উঠল। বাঘিনী আবার খুদে লক্ষ্মীকে রীতিমত সাহায্য করতে শুরু করল।

আগস্টের মাঝামাঝি থেকে খুশি আবার রিক্সা টানতে শুরু করেছে। কিন্তু এখন সে খুব সাবধান হয়েই চলে। দুদুবার অসুখে পড়ে এইটুকুই সে বুঝতে পেরেছে যে, শরীর তার লোহা দিয়ে তৈরী নয়। এখনো তবু তার টাকা জমানোর আশা কমেনি, কিন্তু পর পর ধাক্কা খেয়ে এই সে শিখেছে যে, একা মানুষের শক্তি-সামর্থ্য আর কতটুকু। জীবনে একটা সময় আসে, যখন মানুষ নিজের তাগদ জাহির করে বেড়ায়; কিন্তু এত বড়াইয়ের শেষ কোথায় সে তা জানে। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে, থুথুর সঙ্গে পড়ে রক্ত—এই তো মানুষের তাগদের গর্ব! খুশির আমাশা সেরে গেছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে পেটের ভিতরে কেমন একটা মোচড় দেয়। হয়তো সে জোরে ছুটতে যাবে এমন সময় পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। আস্তে আস্তে চলা ছাড়া তখন উপায় নেই। কখনো বা একেবারেই থেমে পড়তে হয়। মাথা নিচু করে, পেট চেপে ধরে কোনোরকমে ব্যথা সহ্য করে। যখন সে একা সোয়ারি টানে, তখন কোনোরকমে না হয় সামলে নেওয়া চলে, কিন্তু একটা দলের মধ্যে থাকলেই হয় মুশকিল। সবাই সোয়ারি নিয়ে ছুটে চলেছে, তার মাঝে সে হঠাৎ থেমে গেলে চলবে কেন? সবাই অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি সাঙাৎ থামলে কেন? তারপর ওর অক্ষমতায় হেসে ওঠে। সবে বিশের কোঠায় বয়েস চলছে, এখনই সে একটা হাসি-তামাসার পাত্র হয়ে উঠেছে। তারপর তিরিশ-চল্লিশ বছর তো পড়েই রয়েছে—তখন কি হবে? খুশি এসব কথা যখন ভাবে, নিজের উপরে তার বিরক্তি ধরে যায়।

তার খুব ইচ্ছে হোলো, সে মাস মাইনের চাকরী নেয়। কাজও হালকা, পয়সাও মন্দ আসে না। কিন্তু এখন ইচ্ছে করলেই মাস মাইনের কাজ নেওয়া চলে না! বাঘিনী তো তাকে ছাড়বে না। বিয়ে করলে কি আর স্বাধীনতা রাখা চলে। তার উপরে বাঘিনীর মতো স্ত্রী, সে তো তাকে হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে! তার শাসন মেনে চলা ছাড়া তার উপায়ও নেই।

এমনি করেই চার-পাঁচ মাস চলে গেল। হেমন্ত গিয়ে এল শীত। এর মধ্যে খুশি কখনো খুব খেটেছে, কখনো বা বসে বসে তারই ধকল সামলেছে। মাথা নিচু করে সে তার এই দাসত্ব মুখ বুজে সয়ে গেছে। এখন তার মাথা নিচু হয়েই থাকে, কোনো কিছুকে গ্রাহ্য না করে যে-খুশি আগে চলতো, সে-খুশি আর নেই। টাকা সে এখনো অন্যান্য রিক্সাওয়ালাদের থেকে বেশিই রোজগার করে। এক পেটে বেশি ব্যাথা উঠলেই সে সোয়ারি নেয় না। একবার যে সোয়ারি তার রিক্সায় চড়বে, সে ঘুরে ফিরে আবার তার কাছেই আসবে। এর কারণ, এতদিন রিক্সা চালিয়েও ভাই-বেরাদারদের বদ অভ্যেসগুলো সে রপ্ত করতে পারেনি। যারা ভাড়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়, তাদের কাছে সে কখনও এক পয়সা বেশি নেয় না। কিছুদূর গিয়ে ঝগড়া করে সোয়ারি গাড়ি থেকে

নামিয়েও সে দেয় না, তাছাড়া ভালো সোয়ারির জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসেও সে থাকে না। তাই দিনের রোজগারে খুব তার উনিশ-বিশ তফাৎ হয় না! দিন তার চলে যায়।

কিন্তু তবু একটু খুঁত খুঁত যে মন না করে তা নয়। টাকা তেমন বেশি আমদানি হচ্ছে না, খরচ-খরচা করে কিছুই বাঁচে না। বাঁ হাত দিয়ে আসে আর ডান হাত দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছু টাকা জমাবে সে কথা তার ভাবতে সাহস হয় না। সে অবিশ্যি জমাতে জানে, কিন্তু বাঘিনী জানে শুধু ওড়াতে। নতুন বছরে তার সন্তান হবে, ভ্রূণ শীতে বেশ বেড়ে উঠেছে, এখন উপর থেকেই বেশ বোঝা যায়। হাঁ, একটু বেশি বড়ই যেন বোধ হয়। বাঘিনী আবার পেটটাকে একটু বেশি দেখিয়ে বেড়ায়, ওতে নাকি নিজের মর্যাদা বাড়ে; নিজের পেটের উপর শুয়ে শুয়ে সারাদিন হাত বুলোয়। বিছানা থেকে একবার নামতেও চায় না। রান্নাবান্না, ঘর-গৃহস্থালীর ভার সে খুদে লক্ষ্মীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। তার বদলে সে তার পাতে যা পড়ে থাকে তাই দেয়। এমনি করে বহু খরচ হয়ে যাচ্ছে।

দুবেলা খাওয়াই শুধু নয়, বাঘিনীর সব সময়েই তো মুখ চলছে। পেট যতই বাড়ছে, ততই এটা-সেটা খাবার ইচ্ছেও তার বেড়ে গেছে; শুধু নিজেই সে সব কিনে আনায় না, খুশিকেও নানা ফরমায়েস করে। যতই সে রোজগার করুক, বাঘিনী দুহাতে উড়িয়ে দেবেই। তার আয়ের সঙ্গেই বাঘিনীর চাহিদার বাড়তি আর কমতি। খুশি কিছু বলতেও পারে না। যখন সে বিছানায় পড়ে ছিল, বাঘিনীই তো নিজের পুঁজি ভেঙে তাকে খাইয়েছে, এখন তার পালা। যথাসাধ্য ওর জন্যে সে খরচ করবে, আর না করেই বা নিস্তার কি? বাঘিনী অমনি রুখে দাঁড়াবে, বলবে, পোয়াতি হয়েছি, নমাস তো এ জ্বালা ভুগতেই হবে। আর কথাটাও তো মিথ্যে নয়।

নতুন বছরের উৎসবের সময় বাঘিনী টাকা উড়িয়ে দেবার নানা ফন্দি বার করল। সে নিজে তখন নড়তে না পারলে কি হবে, খুদে লক্ষ্মীকেই এটা-ওটা কিনে আনতে চব্বিশ ঘণ্টা হুকুম চালাতে লাগল। বাঘিনীর নিজের উপর একটু যে ঘেন্না না হোলো তা নয়। সে একেবারে নড়ে চড়ে বসতেও পারছে না একি ব্যাপার! হুটকরে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। কিন্তু নিজের উপর মায়াটা তার একটু বেশি বলেই বেরুনো আর হয়ে ওঠল না। কিন্তু ঘরে বসে থাকাও তো বিরক্তিকর ব্যাপার, তাই সে নানা জিনিস ফরমায়েস দিয়ে কিনে আনাল। তবু এইগুলো নিয়ে একরকম একঘেয়ে দিনগুলো কেটে যাবে। সে খুশিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, নিজের আরামের জন্যেই এসব জিনিস

সে কিনছে না। খুশিকে সুখী করবার জন্যেই কিনছে। এই নিয়ে কথা উঠলেই সে বলে বসে :

সারা বছর ধরে তো এত খাটলে, নতুন বছরে একটু মিষ্টিমুখ করার সাধ হয় না তোমার! অসুখ থেকে সেদিন উঠেছ, এখনো তো শরীরে ভালো করে তাগদ হয়নি—একটু ভালো না খেলেই বা চলবে কেন? আর বছরের দিনে অমন শুকিয়ে মরতে আমি তোমাকে দেব না। উপোস করে করে চেহারা হয়েছে দেখনা গা, যেন উপোসী ছারপোকাটি!

খুশি এর উত্তর কি দেবে ভেবেই পায় না। তার সঙ্গে ঝগড়া করবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য তার নেই। নানা মেঠাই-মণ্ডা তৈরী করে বাঘিনী নিজেই বেশি করে খায়। তার উপর একটু হাঁটাচলাও করে না। মাঝে মাঝে ভর পেট খেয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে বলে, উঃ পেটের কাঁটাটা কি রকম বাড়ছে দেখ না!

নতুন বছরের উৎসব শেষ হবার পরে সে আবার খুশিকে রাতে কাজে বেরুতে দিল না। কখন ব্যথা উঠবে কে জানে! নিজের বয়েসের কথা ভেবে এবার তার ভয়ই হোলো। খুশিকে কোনোদিনই সে তার বয়েস জানায়নি বটে, কিন্তু নিজেতো ঠিকই জানে। এখন আর বয়েস ঢাকবার জন্যে সে খুশিকে মাঝে মাঝে শুনিয়ে দেয় না, তোমার চাইতে সামান্যই তো আমি বড়।

একটা না একটা ব্যাপার নিয়ে অষ্টপ্রহর বাঘিনীর মুখে ঘ্যানঘ্যানানি লেগেই আছে। খুশিরই হয়েছে বিপদ, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ছেলে আর মেয়ে হলে নাকি বংশ রক্ষে হয়। কিন্তু বংশ রক্ষার তার দরকার কি? তবে গর্ব যে না হচ্ছে তা নয়, ছেলে হবে, 'বাপ' বলে ডাকবে, একি কম সুখের কথা। এমন কি লোহা দিয়ে গড়া বুক যার, সেও দুদণ্ড চোখ বুজে বসে চিন্তা করবে; যত চিন্তা করবে ততোই নরম হবে তার মন। খুশির এতদিন গর্ব করবার মতো কিছু ছিল না। এক বিরাট জোয়ান চেহারা, গোদাগোদা হাত পা—কি আছে তার গর্ব করবার? কিন্তু এই কথাটি সে ভাবল, গর্বে তার বুক ভরে গেল। 'ছেলে মেয়ে,'—কি যাদুই যে আছে এই দুটি কথায়! এতদিন তার তো কিছুই ছিল না, কেউ তাকে পাত্তাও দেয়নি। কিন্তু ছেলে হলে তা তো হবে না। জীবন আর ফাঁকা লাগবে না। খুশি এবার বাঘিনীর সেবায় মন দিল। বাঘিনীকে সে দেখতে না পারুক, কিন্তু সে তো তার সন্তানের মা। সে এখন আর একা নয়। তাকে একটু সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে পারলে সন্তানও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। যতই খারাপ হোক না কেন, সন্তানের ব্যাপারে কিন্তু বাঘিনীরই ষোলো আনা কেরামতি।

কিন্তু কেরামতি যতো থাক, তার ঝগড়াটে স্বভাব মোটেই সে বরদাস্ত করতে পারে না। মিনিটে মিনিটে নতুন নতুন তার রূপ। ভূত. বা শয়তানের ভয়ও তার যেড়েছে। বাড়িতে এইসব হাঙ্গামা সহ্য করে আবার রোজগারের জন্যে ছুটতে হয়। টাকা সে যা আনে, তার এক পয়সাও জমে না। সবই বাঘিনী উড়িয়ে দেয়, তাই রাতে একটু বিশ্রাম করে আবার ভোর না হতেই শুরু হয় খাটুনি। কিন্তু বাঘিনী সেদিক দিয়েও বাধ সাধে। রাতে তো তার হুকুমে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবেই, এমনকি বহু রাতে ভালো করে ঘুমুতেও দেয় না। সারাদিন যেন একটা ঝাপসা স্বপ্নের ভিতরেই কেটে যায়! চারদিকে সব কিছু যেন ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনো কাজেও মন বসে না। কখনো বা সে অকারণে খুশি হয়ে ওঠে, কখনো বা আসে বিরক্তি; হতাশায় মন ছেয়ে যায়। তার মনের ভিতরে সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। আগে সে ছিল এক গেঁয়ে বোকা ছেলে, ভাবনা চিন্তার ধার ধারত না। এখন রাতদিনই শুধু ভাবতে হয়। ভাবতে ভাবতে এমন আনমনা সে হয়ে পড়েছে, এখন উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম জ্ঞান পর্যন্ত ভুলে যায়। এই তো সেদিন এক কাণ্ড হোলো! সোয়ারি নিয়ে সে ঠিকানা ছাড়িয়ে বহুদূর চলে এসেছিল।

নতুন বছরের দীপালীর সময় বাঘিনী একদিন তাকে ধাত্রী ডেকে আনতে বলল: তার ব্যথা উঠেছে। ধাত্রী এসে দেখে শুনে বলে গেল, এখনো সময় হয় নি। প্রসব-বেদনার কি কি উপসর্গ সে সম্বন্ধেও সে বাঘিনীকে কয়েকটা কথা বলল। বাঘিনী দুতিন দিন চুপ করে রইল, তারপর আবার চেঁচাতে শুরু করল। আবার ধাত্রী ডাকা হোলো। তখনো সময় হয়নি। বাঘিনী কেঁদেকেটে, চিৎকার করে বলতে লাগল, তার মরণ হলেই এখন ভালো, সে আর ব্যথা সহ্য করতে পারছে না। খুশি যে কি করবে ভেবে পেল না। সে বাঘিনীর কথামত কাজে না বেরিয়ে বাড়িতেই রইল। কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না।

এমনি চিৎকার আর কান্না সারা মাস ধরেই চলল। এবার খুশি বাঘিনীর চেহারা দেখেই বুঝতে পারল, সময় হয়ে এসেছে। বাঘিনীকে দেখে যেন আর মানুষ বলে মনে হয় না। ধাত্রী এসে খুশিকে গোপনে জানিয়ে গেল, প্রসব হতে বেশ কষ্টই হবে। একে তো বাঘিনীর বয়েস বেশি হয়েছে, তার উপরে একটু হাঁটা চলাও করেনি, শুধু শুয়ে শুয়ে নানারকম খাবার খেয়েছে। তারই ফলে গর্ভের সন্তান বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রসব যে খুব সহজে হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া একবার ডাক্তার ডেকে সন্তানকে ঠিক জায়গা মতো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ধাত্রীর সে বিদ্যে নেই, তবে সে এইটুকু বলতে পারে: আড়াআড়ি ভাবেই সন্তান প্রসব হবে।

যে বাড়ির তারা বাসিন্দে, সেখানে প্রসূতি আর শিশুর মৃত্যু খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু বাঘিনীর ব্যাপারটা আর একটু জটিলই বটে। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করবার দিন পর্যন্ত কাজ-কর্ম করে, হেঁটে চলে বেড়ায়। তারা আধপেটা খায় বলে তাদের গর্ভের ভ্রূণও কখনো বেড়ে ওঠে না—তাই সন্তান প্রসবেও তারা কষ্ট পায় না। তাদের বিপদ আসে সন্তান প্রসবের পর। বাঘিনীর অবস্থা কিন্তু একেবারে উলটো। তার সুখ সুবিধেগুলিই তার দুর্ভাগ্য টেনে নিয়ে এল।

খুশি, খুদে লক্ষ্মী আর ধাত্রী তিন দিন তিন রাত তার বিছানার পাশে জেগে রইল। বাঘিনী বৌদ্ধধর্মের যত দেবতা আছে সবাইকে ডাকল, বহু মানত করল, কিন্তু সবই বৃথা গেল। অবশেষে তার স্বর ভেঙে গেল, তখন আর চিৎকার করবারও উপায় নেই। শুধু অস্ফুট শব্দ করতে লাগল। ধাত্রী জবাব দিল। সত্যিই কারো কিছু করবার নেই। বাঘিনী এবার নিজেই মেজঠাকুরমা চেনকে ডেকে আনতে বলল। তিনি সেই অমর সাপের কাছে প্রার্থনা করলে যদি বাঘিনী বাঁচে। পাঁচ ডলার প্রণামী না পেলে মেজঠাকুরমা কোথাও যান না। খুশি বাঘিনীর শেষ সম্বল সাত কি আট ডলার খুঁজে পেতে বার করল।

নাও খুশি, যত তাড়াতাড়ি পার নিয়ে এস! এখন টাকাটাই আসল জিনিস নয়। সেরে উঠি তখন তোমাকে কত ভালোবাসব। যাও গো, শিগ্‌গির যাও।

মেজঠাকুরমা একটি 'বাচ্চা' ছেলে নিয়ে সন্ধ্যের সময় হাজির হলেন। বাচ্চা না হলে সেই অমর সাপকে জাগিয়ে তোলা যায় না—মন যার নিষ্পাপ সেই তো একমাত্র তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু যে বাচ্চা ছেলেটি এল তার বয়েস প্রায় চল্লিশ হবে।

ঠাকুরমাটির বয়েস প্রায় চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। পরনে তার নীল পঞ্জিসিল্কের জামা, তার চুলে গোঁজা একখানা বড় লাল পাথর, হাতে দুগাছি চুড়ি, আঙুলে গোটা কয়েক আঙটি। যাদুকরীর মতো তার চোখ দুটো জ্বলছে। এসেই হাত ধুয়ে তিনি সারি সারি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর টেবিলের কাছে বসে সেই ধূপকাঠিগুলোর জ্বলন্ত ডগার দিকে বোকার মতো খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই তার সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগল, মনে হোলো ধনুষ্টঙ্কারই হয়েছে। মাথা নিচু করে, চোখ বুজে তিনি রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঝাঁকুনী কমে গেল। এখন একেবারেই নড়ছেন না। বাঘিনীও আর কোনো শব্দ করছে না। সমস্ত ঘরে নিস্তব্ধতা, ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়।

ধীরে ধীরে মেজঠাকুরমা যেন মাথা তুলে সকলের মুখের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়লো। 'বাচ্চা খোকাটি' খুশির জামার হাতা ধরে টেনে প্রণাম করতে ইঙ্গিত করল। খুশি

দেবতায় বিশ্বাস করে কিনা সে নিজেই জানে না, কিন্তু একবার মাথা ঠুকলে আর দোষ কি! হতভম্ব হয়ে সে মেঝেতে মাথা ঠুকল। উঠে পড়েই সে দেখতে পেল, ডাইনীর চকচকে দুটি চোখ। ধূপকাঠির গোড়াগুলো তখনো জ্বলছে। খুশির আশা হোলো, বাঘিনী এযাত্রা বেঁচেও যেতে পারে। সে বোকার মতো শুধু তাকিয়ে রইল; তার হাত ঘামছে।

চড়াগলায় বিরাট শব্দ করে এবার অমর সর্পরাজ কথা কইলেন: কবচ···কবচ মন্ত্রপড়ে কবচ বেঁধে দাও। ঐ কবচেই তাড়াতাড়ি প্রসব হবে।

মেজঠাকুরমার মুখ দিয়েই সর্পরাজের একথা বেরুল। 'বাচ্চা খোকা' তাড়াতাড়ি সিল্কের মতো নরম কাগজ বার করে দিল। মেজঠাকুরমা ধূপের ছাইয়ের ভিতরে হাত দিয়ে আঙুলে করে ছাই তুলে নিলেন, তারপর থুথু দিয়ে ভিজিয়ে কাগজের ওপর লিখতে শুরু করলেন। কবচ লেখা হয়ে গেলে সর্পরাজ আবার মুখ বিকৃত করে বলতে লাগলেন—অবিশ্যি সর্পরাজের জবানি মেজঠাকুরমা বললেন। তার কথার সারমর্ম এই যে, গতজন্মে বাঘিনী এই সদ্যজাত শিশুর কাছে ধার করেছিল, সে ধার সে শোধ দেয়নি। সুদে-আসলে শিশু তারই শোধ তুলে নিচ্ছে। খুশি কপাল চাপড়াতে শুরু করল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু বড় ভয় করছে।

মেজঠাকুরমা বিরাট এক হাই তুলে আবার চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেল। তিনি যখন চোখ তুলে তাকালেন, মনে হোলো যেন এইমাত্র স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। 'বাচ্চা খোকা' তার কাছে সর্পরাজের আদেশের কথা বলল। তিনি খুশি হয়ে বললেন, আহা দেবতার দেখছি আজ খোস মেজাজ! আদেশ দিয়ে গেলেন। তিনি খুশিকে বুঝিয়ে বললেন, কি করে এই কবচ বাঁধতে হবে, একটা বড়িও বাঘিনীকে খেতে দিলেন।

খুব উৎসাহ নিয়ে মেজঠাকুরমা বসে রইলেন; কবচে কি হয় দেখা যাক। এরই মধ্যে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি বলতে ভুললেন না। খুশি খুদে লক্ষ্মীকে গিয়ে বলল। সে মাংসের পুরি, মীনের ঝোল আরো নানা জিনিস কিনে নিয়ে এল। খুদে লক্ষ্মী মদ আনতে একেবারেই ভুলে গিছল। মেজ-ঠাকুরমা খেতে বসে রাগে গজর গজর করতে লাগলেন।

বাঘিনী কবচ বেঁধে, বড়ি খেয়েও একটুও সুস্থ হোলো না। সে তখনো যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছে, গড়াচ্ছে। এক ঘণ্টার পরেও তার একই অবস্থা। এবার মেজ-ঠাকুরমা আর একটি উপায় বাতলালেন। তিনি খুশিকে ডেকে আর একটা ধূপকাটি জ্বালিয়ে তার সুমুখে গড় করতে বললেন। খুশি তখন এই বুড়ির তুকতাকের উপর প্রায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পাঁচ-পাঁচ ডলার যখন গুনে দিয়েছে, তখন তো

আর সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওরা যত ঝাড়-ফুঁক তুক-তাক আছে করুক না। হয়তো একটা লেগেও যেতে পারে। খুশি এই ভেবে ওর কথামতো কাজ করবে ঠিক করল।

একটা ধূপকাঠি জ্বেলে সে তারই সুমুখে শুয়ে রইল, পিঠে লাগছে কিন্তু উপায় নেই! কোন্ দেবতাকে প্রণাম করছে সে জানে না, শুধু জানে কাজ উদ্ধার করতে হলে ভক্তি থাকা চাই। ধূপকাঠির মাথায় জ্বলন্ত শিখা নাচছে, ওরই ভিতরে ছকোনা দেবতার ছায়া সে দেখতে পেয়েছে এমনি ভাণ করল। মিছেমিছি সে প্রার্থনাও করল। ধূপকাঠি জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে এল, ছাই ঝরছে। মাথা তার ঝুলে পড়ল, হাত মেঝের উপর রয়েছে, ঘুম পাচ্ছে। দু-তিনদিন সে ঘুমোয়নি। ঝিমুতে ঝিমুতে মাথাটা হঠাৎ আরো ঝুঁকে পড়তেই সে চমকে উঠল। ধূপকাঠির দিকে চেয়ে দেখল, কখন নিবে গেছে। উঠে দাঁড়াবার সময় হয়েছে কিনা, একথা জিজ্ঞেস করাও হোলো না। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পা যেন তার অবশ হয়ে গেছে।

মেজ-ঠাকুরমা আর তার 'বাচ্চাটি' ততক্ষণে চম্পট দিয়েছে।

খুশি তাদের উপরে রাগ করবারও সময় পেল না। বাঘিনীর কছে সে ছুটে গেল। সে বুঝতে পেরেছে, অবস্থা চরমে এসে ঠেকেছে। শেষ নিশ্বাস গলায় এসে ঠেকে আছে, এখুনি বেরিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে যাবে জীবন। কথা বলতেও বাঘিনী আর পারছে না। ধাত্রী বাঘিনীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দিল, তার বিদ্যাতে আর কুলোবে না।

খুশির বুকখানা যেন খান্ খান হয়ে গেল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। খুদে লক্ষ্মীর চোখেও জল। কিন্তু কাঁদলে তো আর চলবে না; অনেক কাজ আছে। খুশিকে সে ডেকে বলল, বড়ভাই, তুমি কেঁদো না! আমি হাসপাতালে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসছি।

খুশির উত্তর দেবার আগেই চোখ মুছতে-মুছতে সে দৌড়ে চলে গেল।

এক ঘণ্টা পরে ছুটতে ছুটতে সে ফিরে এল। এত জোরেই সে ছুটে এসেছে যে, কথাই বেরুচ্ছে না। সে টেবিল ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দম নিল, তারপর কথা বলল। ডাক্তারকে আনতে হলে প্রথমেই দশ ডলার দিতে হবে। এই টাকাটা শুধু রুগীকে একবার দেখবার জন্যে; সদ্যজাত শিশুকে দেখবার জন্যে আরো বিশ ডলার দিতে হবে। যদি প্রসব করাতে কষ্ট হয়, হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তার খরচ আরো দশ-বিশ ডলার।

বড় ভাই, এখন কি করব?

খুশি কি করবে ভেবে পেল না। এত রাতে অত টাকাই বা কোত্থেকে আসবে? এখন চুপ করে বসে থাকা ছাড়া অন্য উপায় নেই: যারা মরবার জন্যে এসেছে, তারা মরবেই।

নিজেদের বোকামি আর সমাজব্যবস্থা তাদের এই পৃথিবীতে এনে ছেড়ে দিয়েছে; এখন আর ফেরবার পথও নাই।

দুপুর রাতে একটা মরা সন্তান প্রসব করে বাঘিনী শেষ নিশ্বাস ছাড়ল।

খুশি রিক্সা বিক্রি করে দিল।

বিক্রির টাকাটা কিন্তু হাতে রাখতে পারল না, যেন আঙুলের ফাঁক গলিয়েই পড়ে গেল। খরচ না করে উপায়ও নেই। বাঘিনীর দেহটা তো গাড়ি করে কবরখানায় নিয়ে যেতে হবে, এমন কি শবাধারের সমুখে আঁটা মৃত্যুর সার্টিফিকেটের জন্যেও এক কাঁড়ি টাকা খরচ করা দরকার।

খুশি বোবার মতো শুধু তাকিয়ে রইল। সবাই সোরগোল তুলেছে, মরা নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে, কিন্তু তার সে খেয়ালই নেই। এক টাকা খরচের সময়ই তার ডাক পড়ছে; তাছাড়া কেউ ডেকেও জিজ্ঞেস করছে না। তার চোখ ভীষণ লাল হয়ে উঠেছে, চোখের কোণ দিয়ে হলদে পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। কানেও সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না; কেমন যেন অবুঝের মতো হৈহট্টগোলের মধ্যে সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। তারা কি করছে, সেই বা তাদের এখানে কেন এল. এ সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই।

বাঘিনীর শবাধার নিয়ে এবার ওরা রওনা হোলো। শহরের দেয়ালের বাইরে কবরখানা, সেইখানেই যাবে। খুশিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। এবার যেন একটু পরিষ্কার হয়ে এল; কিন্তু এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারছে না। শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে খুশি আর খুদে লক্ষ্মীর তুটি ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। ওদের হাতে কাগজের খেল্‌না টাকার তাড়া। ওরা পথে টাকা ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। সয়তানকে ওরা ঘুষ দিচ্ছে, কি জানি সয়তান যদি আবার আত্মার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

খুশি তাকিয়ে দেখল, বাহকরা শবাধার কবরের ভিতরে রাখল। সে কাঁদল না। আগুন ধুঁইয়ে উঠছে তার বুকে, তারই উত্তাপে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কাঁদতে চাইলেও সে কাঁদতে পারবে না। বোকার মতো সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, ঠিক বুঝতে পারল না ওরা কি করছে। যখন বাহকদের মুরুব্বীটি কাছে এসে দাঁড়াল, তখন সে বুঝতে পারল, কাজ শেষ হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

খুদে লক্ষ্মী এরই ভিতরে ঘরদোর গুছিয়ে রেখেছে। সে ফিরে এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। শ্রান্ত হয়ে সে পড়েছে, নড়বারও শক্তি নেই। কিন্তু চোখ বোজা মুস্কিল। চোখ তুটো এত টনটন করছে যে, বোজাই শক্ত। ছাদের জল

চুঁইয়ে পড়ে পড়ে কাগজে একটা মস্ত দাগ পড়েছে, সেই দাগটার দিকে চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল। অবশেষে ঘুমতে না পেরে উঠে বসল, কি যে করবে ভেবেই পেল না। তারপর উঠে এক বাক্স সিগারেট কিনে নিয়ে এসে বিছানায় এক কোণে বসে টানতে শুরু করল। ঘরের চারিদিকে তাকালেও না। কিন্তু সিগারেট খেতেও আর ভালো লাগল না। কষে টান না দিয়ে সিগারেটের নীল ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, সুতোর মতো নীল ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে। পিছনে রেখে যাচ্ছে মিষ্টি গন্ধ।

হঠাৎ চোখে তার জল এল। প্রথম ঠিক পুঁতির মতো ফোঁটায়, তারপর এল বন্যা। বাঘিনী আর মরা সন্তানটির জন্যেই সে শুধু কাঁদছে না, কাঁদছে সব-কিছুর জন্যে। শহরে এসেছে আজ কমদিন হয়নি কিন্তু এতদিন সে করল কি? তার এত খাটুনি শেষটায় তাকে এইখানে টেনে এনেছে। তার দুঃখ এত গভীর যে ফোঁপানোর শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা গেল না। তার রিক্সা—হাঁ, রিক্সা তার একমাত্র ভাতের হাঁড়ি। সেই হাঁড়ি সে কিনল, অথচ ভোগে এল না। হারিয়ে ফেলল। তার পর আর একখানা, সে খানাও হারানোরই সামিল। বিক্রি করেই ফেলেছে। তিন তিনবার সে উপরের তলায় উঠেছে, কিন্তু তিনবারই তাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়েছে। সে যা চেয়েছিল, তা পায়নি। হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে গেছে, তার হাত শূন্যতাকেই চেপে ধরেছে, ভূতের মতোই তাকে ঠকিয়েছে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। অথচ এই মিথ্যে জিনিসগুলোর জন্যেই জীবনে সে বহু অবিচার সয়েছে, করেছে কঠিন শ্রম। না, তার কিছু নেই, আর কিছুই নেই—এমন কি বুড়ী মেয়েমানুষটা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে চলে গেল! বাঘিনী ঝগড়াটে ছিল, বড়নিচু মন্ও ছিল তার, অথচ তাকে ছাড়া এখন ঘর বাঁধবে কি করে? ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখ না, জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে—এসবই তো তার। আর এখন কোথায়? শহরের দেয়ালের বাইরে কবরে তারা ওকে গোর দিয়ে এল, খুশির দুঃখ হোলো: বাঘিনী গেছে যাক, কিন্তু তার ছেলেও শেষটায় পেট থেকে মরাই পড়ল।

যতই সে চিন্তা করল, ততই তার কাছে ব্যাপারটা ভয়ানক হয়ে দেখা দিল। চোখের জল রাগের আগুনে শুকিয়ে গেল, সে সিগারেটে টান মারল। সিগারেট খেতেও ভালো লাগছে না; কিন্তু একটার পর একটা ধরিয়ে টেনেই চলল। সিগারেটগুলো শেষ হয়ে গেলে মাথায় হাত দিয়ে সে খানিকক্ষণ বসে রইল। তার গলা, তার বুক শুকিয়ে গেছে, কুঁচকে গেছে তিক্ততায়। সমস্ত গায়ে জ্বালা। যদি সে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠতে পারে, বুকের সবখানি

রক্ত থু থু করে বার করে দিতে পারে, তাহলেই বুঝি এ-জ্বালা কমবে, সে শান্তি পাবে।

কখন খুদে লক্ষ্মী এসে বাইরের ঘরের টেবিলটার সুমুখে দাঁড়িয়ে তার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, সে টেরও পেল না।

হঠাৎ মাথা তুলে সে তাকে দেখতে পেল। আবার চোখের জল দরদর করে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তার তখন এমনি অবস্থা—একটা কুকুর দেখলেও সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠত। অন্যায় আর দুঃখ সয়ে তার বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। তারই মতো একজন ভুক্তভোগীর দেখা পেয়ে আজ যেন হাজারো ধারায় ঝরে পড়ল। সে ওকে সব কথা বলে ওর কাছ থেকে সহানুভূতি পেতে চাইল, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না।

খুদে লক্ষ্মী এসে তার কাছে দাঁড়াল।

বড় ভাই, সে বলল, আমি সব ঠিক করে রেখেছি।

খুশি মাথা নাড়ল, কিন্তু ধন্যবাদ জানাতে পারল না; যারা দুঃখ সইছে, তাদের কাছে মামুলি ভদ্রতার কোনো মানে নেই।

এখন কি করবে, বড় ভাই ?

অ্যাঁ? সে যেন বুঝতে পারছে না এমনি করেই চমকে উঠল। কিন্তু খুদে লক্ষ্মীর কথাগুলো গিয়ে যখন চেতনায় ধাক্কা মারল; তখন শুধু মাথা নাড়ল। কোনো উপায় ভাববার শক্তিও আর তার নেই।

খুদে লক্ষ্মী আর একটু কাছে সরে এল, এবার তার মুখ লাল হয়ে উঠল, সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু কথা সে বলল না। যে উপায়ে সে রোজগার করেছে, তারই লজ্জা কাটানো তার পক্ষে শক্ত। কিন্তু মনের দিক দিয়ে এখনো সে খাঁটিই আছে।

আমার মনে হয়···শুধু এই দুটো কথাই তার মুখ থেকে বেরুল। মনে জমে ছিল বহু কথা, কিন্তু মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠতেই তারা পালিয়ে গেল। এখন আর শত চেষ্টা করলেও ভাবনার খেই খুঁজে পাবে না।

মানুষ পরস্পরকে সত্য জানায়, তার ভিতরে কথার জায়গা কোথায়? শুরুতে তো কথা খুব কমই হয়। তার চেয়ে মেয়েরা মুখে লজ্জা লালসা অনেক বেশি প্রকাশ করতে পারে। এমনকি খুশির মতো বোকা লোকও তা বুঝতে পারল। তার চোখে খুদে লক্ষ্মীকে সেরা সুন্দরীদের একজন বলেই মনে হোলো, তার মজ্জায় মজ্জায় যেন সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। যদি তার সমস্ত গা ঘায়ে ভরে যায়, মাংস খসে খসে পড়ে, তবুও খুশি মনে মনে তাকে তখনো সুন্দরীই ভাববে। সে সুন্দরী, বয়েসটাও তার কাঁচা। তার উপরে খাটতেও

পারে, খরচও কম করে। যদি আবার বিয়ে করতেই হয় তো ওর মতো মেয়েকেই সে বিয়ে করবে। এখনো অবিশ্যি সে কিছু ঠিক করেনি, আর ঠিক করবার সময়ও এ নয়। তবে মেয়েটির ইচ্ছে যে না আছে এমন নয়। অবস্থার চাপে পড়ে এমন হয়েছে যে, এখুনি বিয়ে হলে ও বেঁচে যায়। আর খুশিও তাতে অমত করবে না। অমত করার কিছু নেই। এমন ভালো মেয়ে, আর তাকে এত সাহায্য করেছে। খুশি ঘাড় নেড়ে সায়ই দেবে। তার ইচ্ছে হোলো, ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদে। তাহলে হয়তো জীবনে যত পাপ করেছে সব চোখের জলে সে মুছে ফেলতে পারবে। তারপর রইল সমুখে পথ। সে পথ যতই এবড়ো খেবড়ো হোক না, দুজনে মিলে তারা সে পথে চলতে ভয় পাবে না। তার মনে হোলো, পুরুষরা যা চায় সবই সে ওর ভিতরে পাবে—শান্তি আর সান্ত্বনা কিছুরই কমতি হবে না। এমনিতে সে খুব কমই কথা বলে, কিন্তু ওকে দেখলেই কথা বলবার ইচ্ছা তার বেড়ে যায়! ও যদি মন দিয়ে শোনে, কোনো কথাই বিফলে যাবে না। ওর ঘাড় নাড়া, হাসি, উভয়ের পক্ষে এই তো যথেষ্ট। তাছাড়া ওকে পেলে সত্যিকারের সংসারের মর্ম সে বুঝতে পারবে।

ঠিক এমনি সময় খুশির ভাবনায় বাধা দিয়ে খুদে লক্ষ্মীর ছোট ভাই ছুটে এসে বলল, দিদি, দিদি, বাবা এসেছে।

খুদে লক্ষ্মীর মুখখানা কালো হয়ে গেল। সে দরজা খুলে দিতেই জোরমন্ত ঘরে ঢুকে গেল।

খুশির ঘরে বসে কি করছিলি? বুড়ো জড়ান স্বরে বলল, তার চোখ দুটো ভীষণ লাল।—নিজেকে বেচে বেচে বুঝি আর সাধ মেটে না? আবার মাগনা গতরের সুখ করতে যাও খুশির ওখানে? ঢেম্‌নি কোথাকার!

নিজের নাম শুনে খুশি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে খুদে লক্ষ্মীর পিছনে দাঁড়াল।

কিহে খুশি, জোরমন্ত বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পা তার টলছে; কি হে এখন কি নিজেকে মানুষ বলে ভাব নাকি? খুবতো মুফোত মজা লুটছ। কি পেয়েছ বল দেখি?

এই বদ্ধ মাতালটার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে তার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু রাগ চেপে রাখাও শক্ত হোলো। সে গুমরে মরছিল নিজের দুঃখে, এবার হঠাৎ নাড়া পেয়ে জলে উঠল। সে এগিয়ে গেল; তার কান্নায় ফোলা লাল চোখের সঙ্গে সঙ্গে মাতালের লাল চোখ মিলল। মনে হোলো, তাদের ঠোকাঠুকিতে চকমকির মতো আগুন ঠিকরে পড়বে। খুশি বুড়োর ঘাড় ধরে এক ধাক্কা মেরে দূরে ফেলে দিল।

জোরমন্ত উঠোনে গিয়ে ছিটকে পড়ল। আত্মসম্মানবোধ তার চাগিয়ে উঠেছিল, সে এসেছিল খুশিকে গালাগাল দিতে, কিন্তু এখন তার লেশমাত্রও নেই। তার মাতলামোও চলে গেছে; জ্ঞান ফিরে এসেছে। খুশির উপর আবার আক্রমণ করতে তার যে ইচ্ছে ছিল না তা নয়, কিন্তু খুশি তার চাইতে ঢের জোয়ান বলেই সাহস হোলো না। এখন আস্তে আস্তে খেদানো কুকুরের মতো সরে পড়াও মুশকিল। অপমানেরও আর অবধি থাকবে না। কিন্তু কাঁহাতক বসেই বা থাকা যায়। জোরমন্ত গোলে পড়ে গেল। কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে সে এবার মুখ ছোটাল।

আমার ছেলেমেয়েকে যদি আমি দুটো গাল মন্দ করি তাতে তোর কি? তুই আমাকে মারলি? বেটা বেজন্মা কোথাকার! আচ্ছা, এই মারের শোধ না তুলি তো কি বলেছি!

খুশি জবাব দিল না; সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বেটা কখন আবার লড়তে এগিয়ে আসবে কে জানে! তৈরী হয়ে থাকাই ভালো।

খুদে লক্ষ্মী কি করবে ভেবে পেল না। তার বাবাকে শান্ত করতে চেষ্টা করা বৃথা; আবার খুশি যে তাকে ঠ্যাঙাবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতেও পারবে না। অনেক ভেবে সে একটা উপায় খুঁজে বার করল। পাগলের মতো জামার এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ে গোটা কয়েক পয়সা বার করে সে তার ছোট ভাইয়ের হাতে দিল। এমনি ছেলেরা কখনো বাপের কাছেও ঘেঁসে না, কিন্তু বাপকে এমন অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, তার একটু সাহস হোলো।

যাও, এই পয়সা কটা নিয়ে এখান থেকে চলে যাও!

জোরমন্ত হাত পেতে পয়সা কটা নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো তখনো জ্বলছে। বিড়বিড় করেই সে বলতে লাগল: একটা বাঁদীর পেট থেকে এই খুদে শয়তানগুলোকে খসিয়ে দেবতার কাছে কি অপরাধই যে করেছি! বেজন্মা বেটারা! একদিন একখানা ছুরি দিয়ে শুয়োরের মতো গলা কেটে তবে আমার শান্তি! উঠোন পেরিয়ে বাইরে যেতে যেতে খুশির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে গেল, আচ্ছারে মরদ! ওটা তোলা রইল। বাড়ির বাইরে আর একদিন হবেখন।

জোরমন্ত চলে যেতেই খুদে লক্ষ্মী আর খুশি ঘরে এসে ঢুকল!

কি যে করব জানি না! সে আপন মনেই বলল; ছোট্ট একটা কথায় তার নিরাশা ফুটে উঠল, আবার তার এ-আশাও হোলো, খুশি তাকে বিয়ে করবে। খুশি তাকে বিয়ে করলে আর এমন করে দিন কাটাতে হবে না। খুশির দিক দিয়েও সুবিধেই হবে। ছন্নছাড়া জীবন তাকে কাটাতে হবে না।

খুদে লক্ষ্মী মুখফুটে তার মনের কথা না বললেও খুশি আঁচ করে নিল। কিন্তু খুদে লক্ষ্মী তো আর একা নয়, তার ঐ রোগা লিকলিকে শরীরটার পিছনে আরো অনেক কালো ছায়া সে দেখতে পাচ্ছে। খুদে লক্ষ্মীকে তার ভালো লাগে, কিন্তু তার সঙ্গে ছোট ভাই দুটো আর মাতাল বাপের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে সে পারবে না; এখন ওসব বিষয় চিন্তাও সে করবে না। বাঘিনী এখন আর বেঁচে নেই। বাঁধন ছিঁড়ে গেছে, এখন সে যা খুশি তাই করতে পারে। এত তাড়াতাড়ি বাঁধনে জড়িয়ে পড়বারও তার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া বাঘিনী একদিক দিয়ে ছিল মস্ত সহায়; টাকা পয়সার ব্যাপারে সে তাকে খুবই সাহায্য করেছে। খুদে লক্ষ্মীই কি শুধু শুধু তার ঘাড়ের উপর বসে গিলবে? না, তা নয়, কিন্তু তার সমস্ত সংসার এসে যে ঘাড়ে চেপে বসবে! বাপ-বেটার তো এক পয়সা কামাবার মুরোদ নেই।

ভালোবাসা-টাসার কথা ছেড়ে দাও। গরীবরা কোনো সমস্যা এলেই ডলার আর সেন্টের দরেই তাকে যাচাই করে। সামান্য টাকা থাকা বা না থাকার উপরই তাদের ভালোবাসা নির্ভর করে। কি করবে উপায় নেই। ধনীরা শুষে শুষে তাদের এই অবস্থায় এনে ফেলেছে; তাদের জীবন, তাদের সংসারের স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছে। ভালোবাসা এখানে ঠাঁই পায় না, কুঁড়িতেই ঝরে পড়ে। ভালোবাসা বা কামনার ফোটা ফুল যদি দেখতে চাও, ধনীর বাড়ির আবহাওয়ায় দেখে এস। ডলার আর সেন্টের আবহাওয়ায় কামনার পদ্ম কেমন পাপড়ি মেলেছে সেখানে!

সে তার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল।

তুমি কি চলে যাচ্ছ নাকি? খুদে লক্ষ্মীর ঠোঁট দুটি ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে।

হাঁ, চলেই যাচ্ছি। খুশির মন শক্ত, কিছুতেই সে টলবে না। এই অন্যায় আর অবিচার-ভরা পৃথিবীতে গরীব যেটুকু স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারে সেটুকু বজায় রাখতে হলে নিষ্ঠুর হতেই হবে। উপায় কি? মন একটু টললেই আবার অধীনতার বেড়ি এসে পায়ে জড়াবে।

খুদে লক্ষ্মী একবার তার মুখের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নিচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। খুশিকে সে ঘৃণা করে না, তার উপর রেগেও সে উঠেনি কিন্তু তার শেষ আশাটুকুও দপ্ করে নিভে গেল।

বাঘিনীর ভালো পোশাক-আশাক, গহনাগাটি শুদ্ধুই তাকে গোর দেওয়া হয়েছিল। বাড়িতে এখন পড়ে আছে একগাদা পুরনো ছেঁড়া কাপড়-চোপড়। দু-একটা কাঠের বাসন, চীনে-মাটির থালা, হাতা, বেড়ি ঘটিবাটি সংসারের আরো

নানা টুকি-টাকি জিনিস ছড়িয়ে আছে। খুশি জামা-কাপড়ের গাদার ভিতর থেকে দু-একটা একটু ভালো জামা বেছে বার করে একপাশে রেখে দিল। তারপর একটা নিলামওয়ালাকে ডেকে এনে গাদা-করা কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন সব এক সঙ্গে বিক্রি করে দিল। দর-দাম সে করল না। নীলামওয়ালা প্রথম বারে যা বলল, তাতেই সে রাজি হোলো। দরও খুব বেশি নয়—দশ ডলারের কিছু উপরে। সে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার মতলব করেছে, এইগুলো কোনো-রকমে গছিয়ে দিতে পারলে বাঁচে! একটার পর একটা লোক ডেকে দর কষাকষি করবার তার সময় নেই! নিলামওয়ালা জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল! ঘরে এবার আর খুশির গুটানো বিছানা আর বেছে রাখা কয়েকটা জামা ছাড়া কিছু নেই। খুশি বিছানায় গা এলিয়ে দিল—মাদুরটা পর্যন্ত সে বিক্রি করে দিয়েছে। ঘর একেবারে ফাঁকা, কেমন হালকা বোধ হচ্ছে মন। এতদিন একরাশ জট-পাকানো দড়ি-দড়ায় তাকে বেঁধে রেখেছিল, এবার সে বাঁধন আলগা করে বেরিয়ে এসেছে। এখন সে লম্বা লম্বা পা ফেলে যতদূরে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। পাখীর যেন পাখা গজিয়েছে, উঁচুতে আরো উঁচুতে, সে উঠবে, নীল আকাশে উড়ে যাবে।

নানা ভাবনা এসে ভিড় করল তার মনে। টেবিলটা নিয়ে গেছে, কিন্তু পায়ার দাগগুলো মেঝের উপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ময়দার মতো মিহি ধুলো জমে আছে—দাগগুলো দেখে শহরের চৌকো মিনারটার কথা মনে পড়ে যায়। ধুলো দেখে তার মনে হোলো, এরই ভিতরে সেদিনও সে বেঁচে ছিল, স্বপ্নের মতোই সে চলে গেল। সে ভালো ছিল কি মন্দ ছিল তা নিয়ে আজ মাথা ঘামাবার দরকার নেই—কিন্তু তার স্মৃতি তো মনে থাকবেই। তার স্মৃতি, এই সংসারের স্মৃতি একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেললে সে কি নিয়ে বাঁচবে? উঠে বসে সে একটা সিগারেট বার করল।

সিগারেটের সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে দশ সেণ্ট বেরুল। সে পকেট হাঁতড়ে দেখল, আরো কিছু বেরোয় কিনা! এই কদিন সে টাকার হিসেব রাখেনি—রাখবার সময় পায়নি। পকেট থেকে সে সমস্ত টাকাকড়ি বার করল। রুপোর কটা ডলার, দশ-সেণ্টের কয়েকখানা নোট, কিছু পয়সা। সে গুনতে শুরু করল। বিশ ডলারও হবে না। তাছাড়া সব জিনিসপত্র বেচে পেয়েছে দশ ডলারের কিছু বেশি—সব মিলিয়ে তিরিশ ডলারের উপরে অঙ্কটা উঠেছে। এই তার পুঁজি।

টাকা সে বিছানার এক ধারে সাজিয়ে রেখে তার দিকে চেয়ে রইল। কাঁদবে কি হাসবে সে বুঝতে পারল না, ঘর ফাঁকা—জিনিসপত্র নেই, নেই লোকজন,…

শুধু এই কটা টাকা পড়ে আছে। তার জীবনের সম্বল এই কটা টাকা—বিষ মাখানো টাকা। সে কি করবে এখন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুকে ঠেলে উঠল। হাঁ, একটা পথই শুধু খোলা আছে? সে টাকাগুলো পকেটে রাখল, পোশাকগুলো আর বিছানার মোটটা তুলে নিয়ে খুদে লক্ষ্মীর ঘরে গেল।

এই পোশাকগুলো তুমি পোরো। আর এই বিছানার মোট দু-চার দিনের জন্য রেখে গেলাম। আমি একটা রিক্সার আড্ডার সন্ধান খুঁজে পেলেই এসে নিয়ে যাব।

খুদে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাতেও তার সাহস হোলো না। এক নিশ্বাসেই সে কথাগুলো বলে ফেলল।

খুদে লক্ষ্মী মুখে অস্ফুট শব্দ করে, রাজি হোলো, কিন্তু কোনো কথা বলল না।

খুশি একটা আস্তানা ঠিক করে বিছানার মোটটা নিতে এল। খুদে লক্ষ্মী বিছানার মোটটা তাকে দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, খুশি যে কি বলবে কিছুক্ষণ ভেবেই পেল না, তারপর বহু কষ্টে সে একটা কথা বলল।

কটা দিন সবুর কর—আমি একটু থিতু হয়ে নি,—তখন তোমাকে নিতে আসব, নিশ্চয়ই নিতে আসব!

খুদে লক্ষ্মী মাথা নাড়ল, কোনো কথা বলল না।

খুশি একদিনই বিশ্রাম করে নিয়ে আগের মতোই রিক্সা চালাতে শুরু করল। সোয়ারি নেবার জন্যে আগে যেমন অস্থির হয়ে উঠত, এখন আর তা হয় না। তাই বসে বসে থাকতেও সে রাজি নয়। এমনি করে দিনের পর দিন কেটে গেল, একমাস হয়ে গেল। উৎসাহ তার নেই, কিন্তু কাজে বিরক্তিও আসে না—এ-যেন কেমন এক ব্যাপার! তার মন এখন সুস্থির, শান্ত মুখখানা একটু ভরেছে, কিন্তু আগের মতো নয়। রংও আগের মতো লালচে নয়; কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে, কিন্তু শুকিয়ে সে যায়নি। চোখদুটো তার উজ্জ্বল, কিন্তু ভাবাবেগ বা সহানুভূতির বালাই সেখানে নেই, সব সময়েই অফুরন্ত উৎসাহে টলছে, কিন্তু কোনোদিকে ফিরে তাকাবার তার ইচ্ছে নেই। সে যেন একটি গাছ, ঝড় থেকে বেঁচে গিয়ে এখন শান্তভাবে তার ডালপালা সূর্যের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে; নড়তে চড়তে ভয় পাচ্ছে। আগেও আড্ডা দিতে সে ভালোবাসত না, এখন তো মুখই সে একরকম খোলে না। আবার দিনগুলোয় গরমের আমেজ দেখা দিয়েছে, উইলো গাছে কচি সবুজ পাতায় ভরে গেছে। যখন কাজ থাকে না, রিক্সা রেখে রোদে মুখ করে বসে বসে ঝিমোয়। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে, বিড়বিড় করে কি যেন বকে। তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে মুখখানা সূর্যের দিকে তুলে ধরে, আলো এসে পড়ে তার মুখে; আবার ঝিমোতে শুরু করে। এমনি করেই কেটে চলে তার জীবন। কারো সঙ্গে পারতপক্ষে কথা কয় না।

হাঁ, সিগারেট খাওয়াটা সে বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। যখনই সে কোথাও রিক্সা রেখে জিরোয়, তার হাত অজান্তে পাপোষের নিচে চলে যায়। সেইখানেই সে তার সিগারেটের বাক্স লুকিয়ে রাখে। সিগারেট বার করে ধরায়, ধোঁয়া ছাড়ে, খোসবাই নাকে গিয়ে লাগে; ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠে। খুশি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ঘাড় নাড়ে। যেন সিগারেটের ধোঁয়ার এই উর্ধ্ব গতি তার কাছে বিশেষ বাণী নিয়ে এসেছে, তাকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে।

বিশ্রামের পর আবার সে রিক্সার হাতলদুটো তুলে নেয়। এখনো সে বেশির ভাগ রিক্সাওয়ালার চাইতে জোরে দৌড়তে পারে, কিন্তু অমন প্রাণ দিয়ে দৌড়বার কোনো মানেই নেই। বাঁক ঘুরতে বা উপর নিচে করতে হলে এখন সে অতিমাত্রায় সাবধান হয়ে যায়। অন্য কোনো রিক্সাওয়ালা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়, সে বিরক্ত হলেও তাকে আমোলই দেয় না। মাথা নিচু করে আগের মতোই ছুটতে থাকে।—রিক্সা টানার ব্যাপারটার উপর তার বিরক্তি ধরে গেছে। তার আর এ সম্বন্ধে মোহ বলতে কিছু নেই। এর থেকে মান কুড়োবার তার ইচ্ছে নেই।

আস্তানায় এবার বন্ধু মিতাও সে জুটিয়েছে। কথা বলতে সে চায় না, পারে না, কিন্তু বোকা কাক হলেও নিজের ঝাঁকের সঙ্গেই সে উড়তে চায়। আগের মতো কুনো হয়ে বসে থাকতে সে পারে না। কুনো হয়ে বসে থাকলে যে তার নিঃসঙ্গতা আরো অসহ্য হয়ে উঠবে! তাই সে এসে সাঙাৎদের ভিতরে বসে তাদের গল্প-গুজব শোনে। পকেট থেকে সিগারেট বার করে বিলোয়, বাক্সে একটা সিগারেটই হয়ত আছে, সবাই হাত বাড়িয়ে আছে নেবে বলে—সে অপ্রস্তুত হয়ে বলে, যাই, কিনে নিয়ে আসি।

সবাই যখন জুয়া খেলতে বসে, তখন সে চলে যায় না। পুরনো দিনে তাই-ই করত, কিন্তু এখন সে বসে তাদের খেলা দেখে, কখনো বা দু-এক দান খেলে, হার কি জিত হোলো গ্রাহ্য করে না। সে যে তাদের দলেরই একজন এই কথাই সবাইকে জানিয়ে দেয়। তারা যাই-ই করুক না কেন, তাদের সে ঘেন্না করতে পারে না। সে তো জানে, সারাদিন খেটে-খুটে হয়রান হয়ে এসে একটু-আধটু ফূর্তি না করলে চলবে কেন? অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে তো দুশ্চিন্তার বোঝা নামিয়ে রেখে সুখী হতে পারবে!

ওরা মদ খেলে সেও মদ খায়। কিন্তু খুব বেশি নয়। আড্ডার সবার জন্যে আর এক পাত্র করে মদ আর মাংসের টাকা বার করে দেয়। অথচ এই ব্যাপারগুলো সে আগে ঘেন্নাই করত, এখন কেমন মজা লাগে, খুশি মনে ঘনিয়ে আসে। তার নিজের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, সে এখন স্বীকার না করে পারে না যে, তার ভাই-বেয়াদাররাই ঠিক কাজ করেছে। সে নিজেকে শুধু বঞ্চিতই করেছে, কিন্তু

কি হোলো তার ফল? যখন তার সাঙাতদের মধ্যে কারো পরিবারে বিয়ে হয় বা কেউ মারা যায়—সে তার চাঁদা দিতে একটুও দেরী করে না। অথচ আগে সে এসব সামাজিক ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাত না। এখন সে বুঝতে পারে যে, সমাজে থাকতে হলে এ সাহায্যটুকু তাকে করতেই হবে। শুধু টাকা দিয়েই খালাস সে হয় না, নিজে গিয়ে তত্ত্ব-তালাসি করে। এ এক সামাজিক দায়িত্ব। মানুষের সঙ্গে মানুষের বাঁধন এতে শক্ত হয়। এইসব সামাজিক ব্যাপারে হয় লোকে হাসে, নয়তো কাঁদে, অকারণ হল্লা হুল্লোড় কেউ করে না—তাই তো একে খাঁটি বলেই তার মনে হয়েছে।

তিরিশ ডলার এখনো সে ছোঁয়নি। একটা সাদা কাপড়ের টুকরো জোগাড় করে নিজেই ছুঁচ স্থতো দিয়ে একটা থলি তৈরী করে তারই ভিতরে টাকা-কটা পুরে মুখ সেলাই করে দিয়েছে। তারপর থলেটাকে গোপনে একটা জায়গায় রেখেছে, টাকা খরচ করতে সে চায় না, আবার পুঁজি বাড়াবারও তার লোভ নেই। নতুন রিক্সা কেনার কথা এখন তার মনেও হয় না। কখন কি দুর্ভাগ্য এসে দেখা দেয়, বলা তো যায় না। তাই টাকাটা রেখেছে—দুর্ভাগ্যের জন্যে তৈরী হয়ে আছে। রোগ, হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা, কি আর কিছু—যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তৈরী হতে হবে বইকি। মানুষ তো আর লোহা দিয়ে তৈরী নয়। একথা এখন সে বুঝতে পেরেছে।

এমনি করেই কেটে চলল তার দিন। শরতের শুরুতেই সে একটা মাস-মাইনের কাজ পেল! অন্য যে সব মাস-মাইনের কাজ সে আগে করেছে, তার চাইতে এ কাজটি অনেক ভালো। খাটুনি খুব কম। খাটুনি কম না হলে একাজ সে নিতোই না। সে এখন ভালোমন্দ বিচার করতে শিখেছে, বাছতে শিখেছে, এখন আর মাস-মাইনের কাজের জন্যে সে তত উৎসুকও নয়। কাজ মনের মতো না হলে তার চাইতে সদর শড়কে দাঁড়িয়ে রিক্সা টানা ঢের ভালো। সে জানে, তার স্বাস্থ্যের দাম ঢের বেশি। একজন বেশি খাটলে এমনই বা কি লাভ—শুধু নিজেকে মেরে ফেলা ছাড়া তো কোনো উপকারই হয় না। সেও তো আগে অমনিই খাটত। কিন্তু এখন ঠেকে শিখেছে, সে বুঝেছে যে, একটু চালাক চতুর না হলে চলবে না। জীবন তো আর একশটা নয় একটাই।

এবার সে যেখানে কাজ পেল সে-পাড়াটা মিলন মন্দিরের কাছে। কর্তার নাম চিয়া। পঞ্চাশের উপর তার বয়েস; স্ত্রী আর গুটি বারো তার ছেলেমেয়ে আছে। লোকটি খুব বিদ্বান, আদব-কায়দা দুরস্ত। কিছুদিন হোলো দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। এখনো আগের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জানায় নি। নিরালা

পাড়ায় এসে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে ছোটখাটো সংসার পেতে বসেছেন। বাড়িতে তাছাড়া আছে একটি ঝি আর এবার খুশি রিক্সাওয়ালা হিসেবে এল।

খুশির কাজটা খুবই পছন্দ হোলো। বাড়িতে একটা উঠোন আর ছ'টা ঘর। চিয়ারা স্বামী-স্ত্রী তিনটে ঘর দখল করে বসেছেন। একটা আছে রান্নাঘর, আর দুটোয় চাকর-বাকরদের থাকবার জায়গা। উঠোনটা ছোট, দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁসে একটা ছোট্ট খেজুর গাছ, গোটাকয়েক আধপাকা ফল ঝুলে আছে। খুশি উঠোনের এধার থেকে ওধার একমিনিটেই ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলল। কি সহজ কাজ! ফুল গাছ বা ছাঁটাই করা ঘাস নেই যে জল দিতে হবে। শুধু তার ইচ্ছে হোলো, খেজুর গাছটাকে একটু যত্ন করে, ওর বাঁকা চোরা গুঁড়িটাকে একটু ঠেকনা দিয়ে সোজা করে দেয়। কিন্তু গাছের হয়তো ধরনই এই—এই ভেবে সে কিছুই করল না।

অন্য কাজগুলোও খুবই সামান্য। শ্রীযুক্ত চিয়া অফিসে কাজ করতে বেরিয়ে যান, ফেরেন সেই সন্ধ্যেয়, খুশি তাকে অফিসে পৌছে দেয় আবার নিয়ে আসে। আর তাকে বেরুতে হয় না। কর্তা যেন পুলিসের নজর এড়িয়ে এখানে গোপনে লুকিয়ে আছে বলেই তার মনে হয়। কর্তা দুপুরটা বাইরে বাইরে ঘোরেন, কিন্তু ঠিক চারটের সময় বাড়ি ফিরে আসেন। খুশি তখন মনিবকে আনতে অফিসে ছোটে। অফিস থেকে মনিবকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেই তার কাজ একরকম শেষ হয়েই গেল। কর্ত্রীও বেশির ভাগই পুবের চকে বাজার করতে যান, কোনোদিন বা মধ্য পাহাড়ের পার্কে বেড়াতে গেলেন। বাজারে বা পার্কে পৌছে দিয়ে খুশি বহুক্ষণ বিশ্রাম করে। এমন কাজ তো খুশির কাছে খেলা!

কর্তা কিন্তু বড় কৃপণ, আঙুল দিয়ে জল গলে না। এক পয়সা এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। আর কেমন অদ্ভুত ধরনের লোক যেন। অফিসে যাবার বা ফিরে আসবার সময় রাস্তার দিকে একবার চোখ তুলেও দেখেন না। ঘাড় গুঁজে বসে আছেন তো আছেনই। ওঁর কাছে সমস্ত রাস্তাটাই বুঝি ফাঁকা মনে হয়! যেন দোকান-পাট, লোকজন কিছুই নেই!

কর্ত্রী কিন্তু একেবারে আলাদা; হাতও বেশ দরাজ, দুদিন কি তিনদিন অন্তর জিনিসপত্র কিনতে যান। রাশি রাশি জিনিস কিনে নিয়ে ফেরেন। যে জিনিস তার পছন্দ হয় না চাকরদের দিয়ে দেন; যখন নতুন জিনিস কিনতে যান, পুরনো জিনিস চাকরদের বিলিয়ে দিতে ভোলেন না। মনিবের কাছে নতুন জিনিস কেনবার টাকা আদায় করতে গিয়ে তিনি সাফ অস্বীকার করে বসেন যে, ঘরে সেইসব জিনিস রয়েছে। কর্তার এইই বরাত! তিনি খেটে-খুটে রোজগার

করেন, উপরওয়ালাকে সেলাম ঠোকেন, আর তার সেই রোজগার করা টাকা তার উপপত্নীটি নয়ছয় করে দেয়! তা উপপত্নীকে তো খানিকটা তাগদ আর রোজগার করা টাকা দিতেই হবে—তা না হলে সে শুনবে কেন? এ ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই।—লোকের কাছে শোনা যায়, তার আগের বৌ আর ছেলে মেয়েরা পাওতিং-এ থাকে, এমনও, হয় তিনি তাদের চার-পাঁচ মাস একটা পয়সাও পাঠান না।

খুশির কর্তাকে ভালো লাগেনি। পিঠ সব সময়েই কুঁজিয়ে আছে, মাথাও ঝুঁকে পড়ছে বুকে গলাটা দেখবারও উপায় নেই। সমস্ত পৃথিবীর কাছেই যেন চোর বনে আছেন। মুখ কখনো তোলেন না, কথাও বলেন না, টাকাকড়ি ব্যয় করতেও নারাজ। হাসতে সে তাকে কখনো দেখেনি। রিক্সায় গিয়ে যখন বসেন মনে হয় যেন একটা রোগা বাঁদর বসে আছে। কখনো যদি একসঙ্গে দুটো কথা বলে ফেলেন, দুটো গালাগাল ছাড়া কিছু নয়—এমন লোকের উপর মন বিষিয়ে উঠবে না তো কার উপর উঠবে? খুশি এমন লোককে পছন্দ করে না। কিন্তু কাজ হচ্ছে কাজ! যতক্ষণ পর্যন্ত মাসে মাসে সে মাইনে পাচ্ছে, ওসব নিয়ে সে ভাবতে যাবে কেন? তাছাড়া কর্ত্রীর খুব দরাজ হাত, চাকরদের সঙ্গে ব্যবহারও করেন ভালো। মাঝে মাঝে ভালো খাবারও খেতে তিনি দেন, কিছু বকশিশও তারা পায়। এই তো যথেষ্ট! তবে হাঁ, কর্তা লোকটা সুবিধে নয়! তা কি হবে? রিক্সা যখন সে টানবে, তখন মনে করলেই হবে, সে একটা মায়াদয়াশূন্য বাঁদরকে টেনে নিয়ে চলেছে!

আর কর্ত্রী? মেয়ে মানুষটি দিল খোলা, মাঝে মাঝে দুচার পয়সা বকশিশও দেয়। কিন্তু তাই বলে খুশির তাকে ভালো লাগে না। খুদে লক্ষ্মীর থেকে দেখতে ভালোই, আর সারাক্ষণে গায়ে গন্ধ মেখে, ভালো ভালো সাটিন আর সিল্কের জামা পরে যেমন সেজেগুজে থাকে, তাতে খুদে লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। অতো নাকমুখ ভালো, মুখখানাও খাসা—কিন্তু তবু যেন কেমন বাঘিনীরই আদল আসে। খুশি এ নিয়ে বহু মাথা ঘামিয়েছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেনি। হয়তো তার সারা শরীরে এমন একটা কিছু আছে, যা বাঘিনীর কথাই বার বার মনে করিয়ে দেয়। না, সাজ পোশাক নয়, চেহারাও নয়, চলার ভঙ্গিতেই কেমন একটা ছেনালি ভাব ফুটে ওঠে। খুশি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না, কিন্তু তার ঐ কথাই বার বার মনে হয়। সে জানে, এই মেয়ে মানুষটা আর বাঘিনী একই ধরনের লোক—একই জাতের মাল। কর্ত্রীর বয়েস বেশি নয়—টেনেটুনে বাইশ কি তেইশ হবে—কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় পুরনো পাকা শিকারী। নতুন বিয়ে হওয়া বৌয়ের মতো তাকে দেখায় না। সে হবে কত লাজুক, বাপের বাড়ি ছেড়ে

এসেছে বলে পদে পদে ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু এ মেয়েমানুষটি মোটেই তা নয়। সে যেন বাঘিনীর মতোই, কোনোদিন যে লাজুক মেয়ে সে ছিল তাকে দেখলে বোঝা যায় না। চুলে কেয়ারি' করেছে দেখ না! পায়ে দিয়েছে খুর তোলা জুতো, আঁটা জামার ভিতর দিয়ে দেহের প্রতিটা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যতই সাজগোজ সে করুক না, খুশিও বুঝতে পারল, এ-মেয়ে বিয়ে করা বৌয়ের মতো মোটেই নয়। কিন্তু গাইয়ে মেয়েদের দল থেকে সে আসেনি। খুশি বুঝতে পারল না, মেয়েটা কি চায়, কিন্তু সাবধান হোলো। সে বুঝতে পারল একে ভয় করেই তাকে চলতে হবে—যেমন আগে আগে বাঘিনীকে ভয় করেই সে চলত।' কিন্তু বাঘিনীর এমন যৌবন ছিল না, এমন চটকদার চেহারাও ছিল না তার। খুশি আরো ঘাবড়ে গেল। মেয়েটা যেন সমস্ত বিপদ-আপদ আর বিষ তার শরীরে জমিয়ে রেখেছে, নষ্ট মেয়েরা নাকি এমনিই রাখে। তার মুখের দিকে তাকাতেও খুশির ভয় হোলো।

কয়েক হপ্তা কাজ করবার পর তার ভয় আরো বেড়ে গেল। মনিবের রকম-সকম দেখেই তার ভয় হোলো। খুশি কর্তাকে পয়সা খরচ করতে খুব কমই দেখেছে, কিন্তু একটা জিনিস তিনি প্রায় রোজই বাড়ি ফেরবার পথে ডাক্তারখানা থেকে কিনে আনেন। সে ওষুধটা যে কি খুশি জানে না। কিন্তু ওষুধ আনবার পরই স্বামী-স্ত্রী তিন-চার দিন বেশ ফুর্তিতে কাটায় এটা সে লক্ষ্য করল। যে কর্তা একটা বড় হাই তুলতে বা নিশ্বাস নিতে পারেন না, তাকেও যেন বেশ ছোকরা বলে মনে হয়। তিন চার দিন পরে আবার কিন্তু যে কে সেই। তেমনি পিঠ কুঁজিয়ে গেছে, মাথা ঝুলে পড়েছে। এ যেন পথ থেকে জ্যান্ত মাছ কিনে নিয়ে আসা আর কি। মাছটাকে প্রথম কলসীতে ছেড়ে দিলে, খুব উৎসাহের সঙ্গে মাছটা সাঁতরে বেড়াল, জল ছিটিয়ে দিল গায়ে, তারপর একেবারে চুপ মেরে গেল। যখন চিয়াকে সে মরা মাছের মতো রিক্সায় বসে থাকতে দেখে, তার মনে হয় আজ আবার ডাক্তারখানায় তিনি যাবেন। বুড়ো চিয়ার উপর তার এমনিতে একটুও মায়া হয় না, কিন্তু ডাক্তারখানায় ওষুধ আনতে গেলে তার এই শুটকো বাঁদরটার জন্যে একটু মায়া হয় বইকি। আহা বেচারা, ওষুধ খেয়ে তাগদ রাখছে। কর্তা ওষুধের পুরিয়াটা নিয়ে বাড়িতে এসে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঘরে ঢোকেন। আবার দু-তিনদিন ফুর্তি চলে। মেয়েটাকে তখন দেখলে তার বার বার বাঘিনীর কথাই মনে পড়ে। মরা মানুষকে সে অসম্মান করতে রাজি নয়, কিন্তু বুড়ো আর নিজের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান্তেই তার মনে বাঘিনীর মুখখানা ভেসে উঠে, ঘেন্নায় গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার শরীরটা এখনো ধকল সামলে উঠতে পারেনি, আর তার কারণ তো একমাত্র বাঘিনী।

সে ঠিক করল, এ চাকরি সে ছেড়ে দেবে। কিন্তু আবার মনে হোলো, এর জন্যে চাকরি ছাড়া তো বোকামি। তার নিজের কাজের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই নেই। সে নিজেই বিড় বিড় করে প্রশ্ন করল :

কেন, কেন আমি অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব ?

একুশ

বাজারে চন্দ্রমল্লি ফুল ওঠেছে, কর্ত্রী চারটে টব কিনে নিয়ে এলেন। ইয়াঙ্-মা—বাড়ির ঝি একটা টব ভেঙে ফেলতেই কর্ত্রী গালাগাল শুরু করলেন। ইয়াঙ্-মা পাড়াগাঁ থেকে এসেছে; ফুল আর ঘাসের যে এত আদর—সে জানে না। কিন্তু পরের জিনিস তো ভেঙেছে, তা সে দামী হোক চাই না হোক—এই ভেবেই সে টু শব্দটি করতে সাহস করল না। কিন্তু কর্ত্রীর মুখ তাতেও থামল না,—তিনি তাকে গেঁয়ো ভূত, অসভ্য এইসব বলে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। ইয়াঙ্-মা এবার আর রাগ চেপে রাখতে পারল না, মুখে মুখে জবাব দিল। গেঁয়ো লোকের মুখ ছুটলে কি যে বলে না বলে তার ঠিক নেই, একেবারে পাড়া-গাঁর যত বুলি ছিল সব সে একে একে কর্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে মারল। কর্ত্রী আরো রেগে গিয়ে এবার গালাগাল দিয়ে তাকে বিছানা-পত্র গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে হুকুম দিলেন।

খুশি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চুপ করে রইল, ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করল না।—তার মুখে কথাই সরে না—ঝগড়া থামাবে কি? তার উপরে ঝগড়া করছে দুজন স্ত্রীলোক—এখানে থামাতে যাওয়ায় বিপদ আছে। তারপর ইয়াঙ-মা যখন বলেছে যে, হাজারটা নাগর কর্ত্রীর আছে, তারা তার শরীরটা নিয়ে চটকেছে, আদর করেছে—তখন কি আর কোনো আশা আছে? চাকরি থেকে বরখাস্ত সে হবেই। অন্তত ব্যাপার দেখে তাই তো বোঝা যাচ্ছে। আর ইয়াঙ-মার চাকরি গেলে তার চাকরিও খতম হয়ে যাবে। কর্ত্রীর গোপন খবর জানে, এমন চাকরকে তিনি রাখবেন কেন?

ইয়াঙ-মা চলে গেলে খুশি সব সময়েই তৈরী রইল; কখন তার চাকরি যায় কে জানে! নতুন একটা ঝি এলেই হয়তো তাকে বিছানাপত্র গুটোতে হবে। কিন্তু সে জন্যে তার চিন্তা নেই। সে কত চাকরি করল, ছেড়ে এল—তার আবার দুশ্চিন্তা কি? তার অভিজ্ঞতা তাকে এসব বিষয়ে উদাসীন হতেই শিখিয়েছে। একটা সামান্য ব্যাপারে মন খারাপ করলে তো চলবে না।

কিন্তু সে যা আশা করেছিল, ঘটল না। ইয়াঙ-মা চলে গেলে কর্ত্রী হঠাৎ খুশির উপরে খুবই সদয় হয়ে উঠলেন। ঝি তো এখন আর নেই, তিনি নিজেই আজকাল রান্না করেন। খুশিকে দিয়ে বাজার থেকে তরি-তরকারি কিনে

আনান। বাজার করা হয়ে গেলে কি করে তরকারি কুটতে বা ধুতে হয়, সে সব তিনি খুশিকে দেখিয়ে দিলেন। খুশি যখন তরকারি কোটে, তিনি মাংস বা ভাত রাঁধেন। হাতা দিয়ে হাঁড়ির ভিতরে মাংস নাড়তে নাড়তে খুশির সঙ্গে কত গল্প করেন। সাজ-পোশাকেরই বা কি ঘটা। রাঁধতে তো এসেছেন, কিন্তু পরনে বেগনে রঙের সিল্কের জামা, হালকা রঙের পায়জামা; এমন কি পায়ে পর্যন্ত সাটিনের লাল কাজ-করা চটি—হাঁটলে কেমন মিষ্টি একটা শব্দ ওঠে। খুশি বেঞ্চির উপর বসে বসে গোদা গোদা অনভ্যস্ত হাত দিয়ে খোসা ছাড়ায়; একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতেও তার সাহস হয় না। তার গায়ের সুগন্ধ নাকে এসে লাগে, মাঝে মাঝে আড়-চোখে না তাকিয়েও সে পারে না। ভোমরা যেন মধুর গন্ধে ফুলের কাছে উড়ে যায়, তার চোখ দুটোও তেমনি ছুটে যায় কর্ত্রীর দিকে।

অথচ খুশি মেয়েদের চেনে, কি সাংঘাতিক হতে পারে তারা সে জানে। পুরুষকে তারা কি দিতে পারে সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান টনটনে। মেয়েদের সম্বন্ধে ভয় পাইয়ে দেওয়ার পক্ষে এক বাঘিনীই তো যথেষ্ট। আবার মেয়ে না হলে পুরুষের চলে না এ কথাটাও বাঘিনী তাকে শিখিয়েছে। আর এই মেয়েমানুষটি তো বাঘিনীর থেকে হাজারো গুণে বেশি কাম্য। খুশি একবার আড় চোখেই তাকিয়ে দেখল। যদি সত্যিই বাঘিনীর মতোই এর স্বভাব চরিত্র হয়—তবু বাঘিনীর থেকে অনেক, অনেক উঁচু দরেরই মেয়ে সে। বাঘিনী এর কাছে দাঁড়াতেই পারত না।

দু-বছর আগে খুশি কর্ত্রীর দিকে সাহস করে তাকাতেই পারত না। কিন্তু আজ সে তাকাতে পারে। সংসারের বালাই সে চুকিয়ে দিয়েছে। মেয়ের ফাঁদে সে তো পড়েছিলই, তাছাড়া মাংসের যে-স্বাদ সে পেয়েছে তাতো আর ভুলতে পারবে না। দ্বিতীয়ত সে এখন রিক্সাওয়ালাদেরই একজন হয়ে উঠেছে, ঠিক তাদের সঙ্গে নিজের জীবনকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অন্য রিক্সাওয়ালারা যা উচিত বলে মনে করে, সেও তাই করে। নিজেকে সে এতদিন ঠকিয়ে সংযমী হয়েছিল, তার ফল তো সে হাতে হাতে পেয়েছে। অন্য রিক্সাওয়ালাদের এতদিন নিজের থেকে অনেক নিচুই সে ভাবত, কিন্তু এখন দেখছে তা ভুল। তাই সে ঠিক করেছে, অন্য রিক্সাওয়ালাদের মতো খাঁটি রিক্সাওয়ালাই হবে। তাদের হুবহু নকল না করুক, ভিড়ে মিশতে হবে। তাছাড়া পথ বন্ধ।

যারা গরীব, যারা খেটে খায়, তারা একথা স্বীকার করবেই যে, মুফোত কিছু পেলে তারা কিছুতেই তা ছেড়ে আসবে না। কেন না, এমন সুযোগ তো তাদের ভাগ্যে খুব কমই জোটে। খুশিই বা অমন সস্তা মাল ছেড়ে দেবে

কেন? মেয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়েছে তো হয়েছে কি? সে তো আরো পাঁচটা মেয়ের মতোই, আর যদি কিছু করতে ইচ্ছে থাকে, খুশিই তাকে আটকাতে পারবে? অবিশ্যি, সে বিশ্বাস করে না যে, তার কর্ত্রী অতটা নীচে নামবে, ধর সে যদি হঠাৎ নেমেই বসে? যদি তার দিক থেকে কোনো সাড় না পাওয়া যায়, খুশি কিছু করতে যাবে না; কিন্তু সে যদি হঠাৎ তার ইচ্ছেটা ওকে জানিয়ে দেয়, তখন খুশিও চুপ করে বসে থাকবে না। ঠিক রাজি হয়ে যাবে। কেন, এরই মধ্যে দু-একটা ইসারা কি আর ও করেনি? তাই যদি না হবে, তাহলে ইয়াঙ-মাকে জবাব দিল কেন? খুশিকেই বা রান্না ঘরে এনে রান্না-বান্নার সাহায্য করতে বলল কেন? রাঁধতে তো এসেছে, গায়ে অত গন্ধ মাখাই বা কেন?

খুশি এর থেকে কোনো সিদ্ধান্তে এসেই পৌছতে পারল না। আশাও তার এমন কিছু নেই, কিন্তু মনে একটা সন্দেহ জেগেই রইল। কামনার প্রথম শিহরণও সে বোধ করল দেহে। সে যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক সুন্দর অবাস্তব স্বপ্ন দেখছে: সে জানে এ স্বপ্ন, তবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নই দেখতে চায়, আশা নেই তবু আশা হয়, এ স্বপ্ন তার ভাঙবে না। তার ভিতরে উষ্ণ জীবন জেগে উঠছে, তাকে জোর করে স্বীকার করিয়ে নিচ্ছে যে, সে অপদার্থ। কিন্তু কি সে করবে, এই অক্ষমতায় সে আনন্দ পাচ্ছে—হয়তো পরে আসবে ভীষণ বিপদ, কিন্তু কে গ্রাহ্য করে?

কামনার এই অস্ফুষ্ট ফিসফিসানি তার সাহস বাড়িয়ে দিল, বুকে জ্বলে উঠল আগুন। কেন, এতে নিজেকে সস্তা করবার কি আছে? কেউ কারো কাছে নীচু হবে না: দেহের কামনা তো সব মানুষেরই আছে।

আবার পর মুহূর্তেই ভয় এসে তার মন জুড়ে বসল, সঙ্গে সঙ্গে এল বুদ্ধি এবার কামনার আগুন নিবু নিবু হয়ে এল, তার মনে হোলো, এখান থেকে একছুটে সে পালিয়ে যাবে। এখানে থাকলে আছে বিপদ, আছে ভোগান্তি, এই পথে চলে নিজেকে বোকা বানাতেও সে চায় না।

এক একবার সে গরম হয়ে উঠল, পর মুহূর্তেই ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তার যেন ম্যালেরিয়া হয়েছে, একবার কাঁপিয়ে জ্বর আসছে, আবার চলে যাচ্ছে—এমনি অবস্থা। বাঘিনী তাকে বিপদে ফেলেছিল, তার চাইতেও সাংঘাতিক, তার চাইতেও এই বিপদ। তখন সে কিছুই জানত না, একটা খুদে মৌমাছির মতো প্রথম সাহস করে বেরিয়ে এসে সোজাসুজি মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু এখন সে বুঝতে শিখেছে, সাবধান হতে সে জানে, আবার সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ফাঁদে পা দিতেও পারে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। তার পিছলে

পড়ে যেতে ইচ্ছে করছে, ডুবতে সে চায়, অথচ পড়বার ভয়েও সে অস্থির।

আর একজনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; নাম-না-লেখানো এই বেশ্যাটাকে ছেড়ে যেতেও মন তার সরছে না। খাসা চেহারা। তাকে কাছে টেনে এনে আদর করাই যেন সব, আবার যেন কিছুই নয়। সে নিজে জানে তার এই বিচিত্র মনের জন্যে নিজের কাছেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু তবু ঐ শুটকো মর্কটের মত বুড়ো চিয়াকে দেখে তার মন ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে ওঠে—ওর একটা কিছু হলে সে খুশি হয়। হোক না, কিছু একটা হোক না। ওর মতো স্বামী যার, সে যা খুশি করলেও পাপ বলে ধরা যায় না। আর খুশিও ওরকম মনিবকে গ্রাহ্য করে না। খুশি উত্তেজিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কর্ত্রীর দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সে তার দিকে চেয়েছে কি না চেয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি যে জানেন এমন লক্ষণই তিনি দেখালেন না। তিনি একা রান্নাঘরে বসে খেলেন, তারপর খাওয়া শেষ হলে খুশিকে ডেকে বললেন, যাও খেয়ে নাও গে! খাওয়া শেষ করে থালাগুলো ফেলে রেখ না আবার। আর বিকেলে যখন কর্তাকে আনতে যাবে, তখন কিছু শাক-সবজী তরি-তরকারী কিনে নিয়ে এস। তাহলে কাল আবার সকালেই ছুটতে হবে না, কাল রোববার। কর্তা সারাদিনই বাড়ি থাকবেন। আমি ঝির খোঁজে বেরোবখন। তোমার কেউ জানাশুনো আছে নাকি। থেমেই বলল ঝি, পাওয়াও মুস্কিল, যাও, খেয়ে নাও গে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!

কর্ত্রী বেশ হুকুমের সুরেই কথাগুলো বললেন, কিন্তু বেশ স্বাভাবিকই শোনাল। বেগ্‌নে রঙের সিল্কের জামাটা খুশির চোখে এক নতুন রূপ নিয়েই হঠাৎ দেখা দিল। এ রূপ উগ্র নয়, শান্তই? উচ্ছৃঙ্খল নয়, পবিত্র। কেমন যেন সে নিরাশ হোলো, তারপর নিজের উপরে ঘেন্না ধরে গেল। সে নিজের উন্নতির জন্যে চেষ্টা তো করছেই না, বরং দিন দিনে বদমায়েস হয়ে উঠছে! কোনোরকমে দুগ্রাস ভাত আর কিছু তরকারী খেয়ে সে উঠে পড়ল। তারপর থালা-বাসন ধুয়ে নিজের ঘরে এসে বসল। এমন নিরুৎসাহ সে জীবনে হয়নি! একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

বিকাল। কর্তাকে আনতে যাবার সময় হতেই তার আবার ঐ শুটকো বাঁদরটার উপর ভীষণ রাগ হোলো। এর কারণ কি সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না। সত্যিই সে ঠিক করে ফেলল, বুড়ো বাঁদরটাকে নিয়ে সে আজ যত জোরে পারে ছুটবে, তারপর রিক্সার হাতল দুটো ছেড়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো রাস্তায় গিয়ে গড়িয়ে পড়বে; আধ-মরা তো হবেই। বহুদিন আগের কথা।

সে তখন এক বড়লোকের বাড়িতে চাকরি করত। মনিবের তেসরা নম্বরের উপপত্নীর সঙ্গে তার বড় ছেলের কিরকম একটা নটঘটি ছিল। ছেলেটি যখন বাপকে বিষ খাইয়ে মারবার জোগাড় করেছে, এমন সময় মনিব জানতে পারলেন। খুশি এ ব্যাপারে বড় ছেলেকে দোষী মনে করত, মনে মনে কত গাল পেড়েছে। কিন্তু এখন আর বড় ছেলেকে দোষী বলে মনে হোলো না। সে ভাবল বুড়োটার মরাই উচিত ছিল।

কিন্তু খুশির খুনখারাপির কোনো ইচ্ছেই নেই; তার শুধু মনে হোলো, বুড়ো চিয়া লোকটা খুব খারাপ, কিন্তু খারাপ হলেও তাকে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। সে শুটকো বাঁদরটাকে রিক্সায় চড়িয়ে বার বার ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু বুড়ো বাঁদরের কোনো খেয়ালই নেই। খুশির মন অনুশোচনায় ভরে উঠল। এর আগে মনিবদের সঙ্গে এমন ব্যবহার সে কখনো করেনি। সে নিজেকে সহজে ক্ষমা করতে পারল না।

তার অনুশোচনা সমস্ত ব্যাপারটার উপর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলল। সে এমন মিছেমিছি তার মনের শান্তি নষ্ট করছে কেন? সে রিক্সাওয়ালা,—হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবে, মনিবের মন জুগিয়ে চলবে; বাজে ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে তার লাভ কি?

তার মন আবার শান্ত হয়ে এল, সে তার মন থেকে ব্যাপারটা ছেঁটে ফেলল। এ যেন একটা নাটক, যার কোনো পরিণতি নেই। কি হবে ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? যদি মাঝে মাঝে এগুলো আবার মনে আসে, সে হাসবে, এতো হাসিরই কথা।

পরদিন কর্ত্রী ঝির খোঁজে বেরুলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটি ঝি নিয়ে এসে হাজির হলেন। আজ সে কাজকর্ম কেমন করে দেখবেন, কাল থেকে তাকে বহাল করবেন। খুশির যেটুকু আশা-ভরসা ছিল ফুরিয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা সে অতো তাড়াতাড়ি ভুলতে পারল না।

সোমবার, দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরই তিনি ঝিটাকে তাড়িয়ে দিলেন একে তো কাজ-কর্ম কিছুই জানে না, তার উপরে ভীষণ নোংরা—ওকে কি আর রাখা চলে? ঝিকে বিদায় দেওয়ার কিছু পরেই খুশিকে ডেকে ভাজা বাদাম কিনে আনতে বললেন।

খুশি গরম বাদামভাজা কিনে এনে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ভিতরে নিয়ে এস। ভিতর থেকে কর্ত্রী বললেন।

খুশি কর্ত্রীর ঘরে ঢুকে পড়ল। তিনি আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে গালে পাউডার ঘসছেন। পরনে তার বেগুনে রঙের হাঁটু অবধি গাউন, ফিকে সবুজ রঙে

পায়জামাটা দেখা যাচ্ছে। আয়নার ভিতর দিয়ে খুশিকে তিনি ঢুকতে দেখে ফিরে দাঁড়ালেন। তার মুখে হাসি। খুশি হঠাৎ যেন তার হাসিভরা মুখে বাঘিনীর মুখের ছায়া দেখতে পেল। ঢের কম বয়েস, আর এত সুন্দর এই বাঘিনী! কাঠ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার সাহস, আশা, ভয় সব যেন কোথায় উবে গেছে, একটা অসহ্য গরম যেন সারা দেহ তার সেদ্ধ করছে, মাঝে মাঝে সে ফুলে-ফেঁপে উঠছে, মাঝে মাঝে কুঁকড়ে যাচ্ছে,' যখন সে ঢুকতে চাইছে, ভীত হয়ে ঢুকছে, শরীরে লাগছে টঙ্কার, যখন বেরিয়ে আসছে, তখন একেবারে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। নিজের তার কোনো সত্তা নেই; অনেকদিনের অভ্যেস নেই তবু জুঝে চলেছে। এক চাষা যেন একটা মজা কুয়ো পেয়ে বালতি নামাচ্ছে আর ওঠাচ্ছে, নামাচ্ছে, আর ওঠাচ্ছে ধরনটাও একেবারে পুরোনো, আদ্যিকালের চাষীও জানে…

পরদিন সন্ধ্যেয় খুশি তার বিছানাপত্র নিয়ে এসে রিক্সার আস্তানায় উঠল।

আগে হলে এ ব্যাপার সে কাউকে বলত না, কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। লাজের মাথা খেয়ে সে সবাইকে হাসতে হাসতেই শুনিয়ে দিল। এ যেন এক মস্ত বড় ঠাট্টা; প্রস্রাব করতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, জ্বালা করছে।

দাওয়াই বাতলাবার পাল্লা দিল সবাই। কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সে পরামর্শও সে পেল। কেউ একটু লজ্জাবোধ করল না, এবং সবাই সহানুভূতিই দেখাল। কেউ কেউ তার কাছে বেশ রসালো করে নিজের রোগ হওয়ার কাহিনী তাকে শোনাল। বলাত বলতে চোখ মুখ বুঝি বা লালচে হয়ে উঠল। ছোকরারা প্রায় সবাই টাকা দিয়ে এ রোগ কিনে এনেছে, একটু যারা বয়স্ক তারা মুফোত পেয়েছে। যারা মাস মাইনের কাজ করে, তারা মনিবের উপ-পত্নীদের কাছ থেকেই এ রোগ পেয়েছে। তবে তাদের কাহিনী খুশির থেকে আলাদা। যারা এ সুযোগ পায়নি, তার মনিব আর তার উপপত্নীদের সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিয়ে দিল। খুশির এই সামান্য রোগে তাদের সকলের মনের দুয়ার যেন খুলে গেল!

খুশির আর লজ্জা নেই। সে রোগ নিয়ে জাঁক করতে চাইল না বটে, কিন্তু শান্ত হোলো। এ যেন সর্দি লেগেছে আর কি, দুদিন পরেই সেরে যাবে। ব্যাথা উঠতেই একটু আধটু অনুশোচনা যে না হোলো এমন নয়, কিন্তু ব্যাথা চলে গেলেই অভিজ্ঞতার আনন্দে মন তার ভরে গেল। না, এ নিয়ে কোনোক্রমেই সে উত্তেজিত হবে না। জীবনের কতটুকু দাম সে তা ভালো করেই জানে। এত ভাবনা করেই বা লাভ কি।

ডাক্তারি আর টোটকা ওষুধে তার প্রায় দশ ডলারেরও বেশি বেরিয়ে গেল, সেও নিজেকে সুস্থ মনে করে ওষুধ ব্যবহার করল না। কিন্তু রোগের বীজ রয়েই গেল। মেঘলা দিনে অথবা ঋতু পরিবর্তনের সময় তার গিট আর হাড়ে ব্যাথা উঠত আবার কয়েক দিন ওষুধ ব্যাবহার করত, কখনো বা তাও করত না। ব্যাপারটা তার এমন কিছু নয় বলেই মনে হোতো। জীবনটাই যখন তেতো হয়ে গেছে, শরীর দিয়ে আর কি হবে? একটা মাছি পর্যন্ত অমন ফুর্তি পেলে ছাড়ে না; তার মতো এমন জোয়ান মরদই বা একটু-আধটু ফুর্তি লুটে দুঃখ করে মরবে কেন?

রোগ একরকম সারল বটে, কিন্তু খুশির শরীর ভেঙে দিয়ে গেল। সে তেমনি আছে, কিন্তু সাহস আর উৎসাহ যেন নিবে গেছে, কাঁধটাও যেন কেমন ঝুঁকে পড়েছে। ঠোঁটে সব সময়েই লেগে আছে একটা সিগারেট। কখনো কখনো সে আধ-পোড়া সিগারেটের টুকরো কানে গুঁজে রাখে। ওইটেই যে রাখবার ভালো জায়গা তা নয়, ওটা গোঁজা থাকলে তার যেন সাহস একটু বেড়ে যায়। এখনও বক্ বক্ করতে সে ভালোবাসে না। যখন মুখ খোলে, অশ্লীল ভাষাই ব্যবহার করে। এখনো ওটা তার রপ্ত হয়নি, একেবারে তুবড়ী ছোটাতে সে পারে না, কিন্তু কাজ চালাবার মতো শিখে নিয়েছে। মনটা এতদিন যেন সব কাজেই বাগড়া দিত, এবার তার বাধন আলগা হয়েছে! তার ধরন-ধারণও বদলে গেছে। সে শান্তশিষ্ট খুশি আর নেই, বয়াটে ছাপ পড়েছে তার মুখে।

কিন্তু জাত-রিক্সাওয়ালার সঙ্গে তুলনা করলে এখনো তাকে একেবারে খারাপ বলা যায় না। মাঝে মাঝে যখন সে একা থাকে, তখন নিজেকে শোধরাবার ইচ্ছে জেগে ওঠে। এমনি করে ধাপে ধাপে নিচে নেমে যেতে সে রাজি নয়। আশা-আকাঙ্ক্ষার না হয় কোনো মূল্য নেই, কিন্তু নিজেকে এমনি করে সর্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়াও এমন কিছু ভালো ব্যাপার নয়। এই সময়ে আবার একখানা নতুন রিক্সা কেনার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসে। তার তিরিশ ডলার পুঁজির ভিতরে দশডলারের উপর রোগে খরচ হয়ে গেছে—এইখানেই সে নিজেকে নিজে ঠকিয়েছে। কিন্তু এখনো বিশ ডলার তো আছে। এই বিশ ডলার নিয়েই সে শুরু করবে, তারপর ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। অন্য সবার মতো সে নয়। সে ফাঁকা আওয়াজ করতে শেখেনি। এমনিধারা চিন্তা যখন তাকে পেয়ে বসে, সিগারেটের বাক্সটা দূরে ছুঁড়ে ফেলতেই তার ইচ্ছে করে। প্রতিজ্ঞা করে, কখনো আর মদ ছোঁবে না, টাকা জমাতে শুরু করবে। টাকা জমানো থেকে তার চিন্তা রিক্সা কেনা ব্যাপারে এসে দাঁড়ায়, রিক্সার কথা মনে হলে খুদে লক্ষীর কথা মনে পড়ে। কল্পনায়ও তার মুখখানা ভেসে উঠলে সে লজ্জায় মরে

যায়। সেই যে এল, আর যাওয়া হয়নি। যাবে কি? সে নিজের উন্নতির চেষ্টা তো করেইনি, বরং একটা খারাপ রোগে শরীর নষ্ট করেছে।

কিন্তু বন্ধুরা সঙ্গে থাকলে এ চিন্তা তার মনে থিতুতে পারে না। সে তাদের সঙ্গে বসে সিগারেট খায়, সুযোগ-সুবিধে হলে দু'এক পাত্র মদও চলে। খুদে লক্ষ্মীকে একেবারে ভুলে যায়। অবশ্য, তাদের পাল্লায় পড়লে তাকে কখনো ফুর্তির উপায় বাতলাতে হয় না। কিন্তু তারা যা করে তাতে সে সায় দিয়েই যায়। রোজ চৌদ্দ পনেরো ঘণ্টা সে খাটে, তাছাড়া জীবনে বহু অন্যায়ই সে সয়েছে, এরই গ্লানি তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ভাই-বেরাদারদের সঙ্গে গল্প করতে 'বসে যায়, তাদের সঙ্গে একটু আধটু ফুর্তি লুটতেও তার বাধে না। সব কিছু ভুলে থাকবার এই তো তার একমাত্র পথ।

তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পথে এই ফুর্তি যেন এক মস্ত বড় দেয়াল—সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে। সে সুখী হতে চায়, ফুর্তি করতে চায়, তারপর ঘুম এসে সব ঢেকে দেবে? আকাশ তখন মেঘে ঢেকে যাক, পৃথিবীতে আঁধার ঘনিয়ে আসুক, তাতে ক্ষতি কি? কেই বা তায় চায় না বলো? জীবনে তো আশার ছিটে ফোঁটাও নেই, জীবন তো নয় এ যেন এক নিরাশা।

শুধু আফিমের বিষ, মদ আর মেয়ে মানুষ খানিকক্ষণের জন্যে রোগের বীজাণুকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে—বিষে বিষক্ষয় হয়। একদিন ভোরে এই বিষের বীজাণু তার বুকে এসে পৌঁছবে, তারপর সব শেষ। কে এসব কথা জানে না? কিন্তু এর থেকে ভালো জীবনের ভালো ছক সে কোথায় পাবে?

খুশি নিজের উপর রেগে উঠল। কিছুতেই সে নিজেকে বাগ মানাতে পারছে না। জীবনে সে কোনো কিছুকে ডরায়নি, এখন কিন্তু পরিশ্রমের কাজ সে এড়িয়ে যেতেই চায়! নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই তার বেশি নজর, বৃষ্টি বা বাতাস হলে সে আর রিক্সা বার করে না। গায়ে একটু ব্যথা হলে তিন-চার দিন এক নাগাড়ে বিছানায় পড়ে থাকে। নিজের প্রতি মমতা তাকে স্বার্থপর করে তুলেছে। বন্ধু বান্ধবকে একটি পয়সা ধার দিতে সে নারাজ। সামান্য পুঁজি আগলেই সে বসে আছে। ঐ পুঁজি সে নিজের দুর্দশার সময় ভাঙবে, তার আগে নয়। সিগারেট আর মদ বিলানো যায়, কিন্তু টাকা কি আর প্রাণে ধরে কাউকে দেওয়া যায়।

তার অবস্থা অন্য সবার চাইতেও খারাপ। বিশ্রাম করে করে সে কুঁড়ে হয়ে পড়ল। এখন একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে ওঠে, কেমন একঘেয়ে লাগে যেন। এই একঘেয়েমি কাটাতে প্রায়ই মদ, মেয়েমানুষ বা নানা রকমের খাবার তার দরকার হয়। যখনই তার মনে হয়, এমনি করে দিনরাত কাটিয়ে দেওয়া ভালো নয়, তার মন

সেই ধরা-বাঁধা একই উত্তর দেয়: অনেক আশা নিয়েই তো শুরু করেছিলাম, কি হোলো আমার?

উত্তরটা কে যেন মনের ভিতরে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে খোদাই করে দিয়েছে।

কেউই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, করতে পারে না প্রতিবাদ। এমন কে আছে যে খুশিকে সোজা নরকে গিয়ে সেঁধোতে দেবে না? এমন কে আছে এখানে?

বাইশ

যখন প্রথমে পিকিং-এ এসেছিল খুশির একমাত্র আশা ছিল সে রিক্সা টানবে, কিন্তু এখন রিক্সা টানতেও তার বিরক্তি ধরে গেল। এই দুচাকার গাড়ি নিয়ে ধ্বস্তাধস্তি করবার চাইতে টাকা রোজগারের অন্য কোনো সোজা উপায় খুঁজতে লাগল। হুট করে তার পুরনো ব্যবসা ছেড়ে দিতে মন সরল না, কিন্তু যখনই অন্য কোনো ব্যাপারে দুপয়সা রোজগার হোতো, তখনই সে আর রিক্সার হাতল ছুঁত না।

এমনি করেই দিন কেটে চলল। তার শরীরটা কুঁড়ে হয়ে পড়ল, কান কিন্তু রইল খাড়া। গুজব শুনলেই সে এখন বেরিয়ে পড়ে—তা সে শোভাযাত্রা শবযাত্রা বা যে কোনো মিছিলই হোক না কেন। বিশ সেন্ট—তাই বা মন্দ কি! কখনো কখনো তিরিশ সেন্টও পায়। এই সামান্য টাকা বা এর থেকে কম টাকার জন্যেও সারাদিন নিশান হাতে করে ভিড়ের সঙ্গে এঁকে-বেঁকে চলে।

নিশানে কি লেখা আছে, এত লোকই বা কেন চলেছে—এসব সে কোনোদিন ভাবেনি। রিক্সা টানার চাইতে কাজটা ঢের ভালো এই কথাই সে জানে। খুব বেশি টাকা রোজগার হয় না বটে, কিন্তু তেমন শক্তিক্ষয়ও হয় না। ভিড়ের মধ্যে একটা সিল্কের নিশান সুমুখে ধরে শুধু এগিয়ে যেতে হবে। সিগারেটের টুকরোটা লেগে থাকবে ঠোঁটে। টু-শব্দটি করবার নেই। শুধু এগিয়ে গেলেই হোলো। খুব সোজা কাজ!

কখনো কখনো দরকার হলে চিৎকার করতেও হয়। খুশি কিন্তু চিৎকার করে না, মুখ হাঁ করে শুধু দেখায় যেন ভীষণ জোরে চিৎকার করছে, আসলে শব্দটি পর্যন্ত করে না। চিৎকার করে গলা ভাঙতে সে চায় না।

এইসব—না, শুধু এইসব নয়—কোনো কাজেই তার তেমন উৎসাহ নেই, পরিশ্রম করতেও সে চায় না। একদিন যথেষ্ট পরিশ্রমই করেছিল, কিন্তু কি ফল সে পেল? মিছিলে নিশান নিয়ে যেতে এমনি চেঁচাবার ভাণ করে, কখনো জানতে চায় না মিছিলের উদ্দেশ্য কি। এমন কি মিছিলের ভিতরে কোনোরকম গণ্ডগোল শুরু হলে সেই সবচেয়ে আগে সরে পড়ে। এখনো সে বেশ তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে। নিজের জীবন সে এমনি করেই নষ্ট করে দিচ্ছে, কিন্তু কারো জন্যে বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করতে

সে রাজি নয়। যারা নিজের জন্যেই শুধু পরিশ্রম করে, তারা জীবনটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতেও ভালো করে জানে: ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এ এক জবর বিদ্রূপ।

শরৎকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, খুশি সেদিন ভোরে রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কি আর করবে? আজকাল মিছিল-টিছিলও বড় বেরোয় না। সে আস্তে আস্তে পশ্চিম শহরের দিকে চলল। পথেই একটি মেয়ে তাকে ডাকল। মেয়েটির বয়েস বিশ বছরের বেশি নয়। সে তাকে চিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে বলল। সাদাসিদে ফিকে নীল রঙের গাউন তার পরনে। তাকে দেখে খুশির ছাত্রী বলেই মনে হোলো। 'ওদের সোয়ারি নিয়ে তেমন সুবিধে নেই, বেশি পয়সা পাওয়া যায় না! কেউ কোথাও যেতে চাইলেই যে তাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এমন কোনো মানে নেই। তাছাড়া ও জায়গাটাই অপয়া! তার প্রথম রিক্সাখানা তো ঐখানেই সে হারাল! সে খুব তাড়াতাড়ি রাজি হোলো না, দর কষাকষি শুরু করল। আসলে অতদূর যেতে তার ইচ্ছেই হোলো না। এত কুঁড়েই সে হয়ে গেছে।

কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। তার মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটি তাকে চিনতে পেরে বলল, আমি জানি চিংহুয়া কতদূর, আমাকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না! কত চাও বল? যা ভাড়া চাইবে, তাইই পাবে।

এমন সহজভাবে মেয়েটি কথাগুলো বলল যে খুশি রাজি না হয়ে পারল না।

টাওয়ার পার হয়ে পশ্চিম ফটকের কাছে পৌঁছতেই গাড়ির ভিড় দেখা গেল। গ্রাম থেকে সোয়ারি নিয়ে রিক্সা আসছে—চাষারা আসছে শহরে, বাঁধাকপির স্তূপ নিয়ে আসছে গাড়ি। ঠেলা-গাড়িই বা কত। দু-একখানা বড়লোকের চেয়ার-গাড়িও দেখা যাচ্ছে। মুটিয়ারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। খুশি সোয়ারি নিয়ে ভিড়ের ভিতরে ঢুকে পড়তে না পড়তেই ধুলোর ঝড় তুলে একটা মোটর ভেঁপু বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হোলো। খুশির মোটর আর তার ভেঁপুর উপর ভারী ঘেন্না। সে ঠিক করল, মোটরটা যতই ভেঁপু বাজাক আর ড্রাইভারটা যত গালাগালই দিক সে সরবে না। তারপর যা হয় হবে।

গাড়িটা একটু আস্তে চলছে, কিন্তু ভেঁপুটা বাজছে ঠিকই। ভিড়ের ভিতরে পথ করে এগিয়ে আসছে গাড়ি। মেয়ে-সোয়ারিটি তাকে চেঁচিয়ে সাবধান হতে বলল, কিন্তু খুশি তার চিৎকারে কান না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হাতলটা পর্যন্ত তার হাত থেকে খসে পড়ল। চোখে জ্বলে উঠল প্রতিরোধের আগুন; সে এই যন্ত্রদানবের আবছা কাচের চোখের দিকে তাকাল। যন্ত্রটা তাকে হুকুম দিচ্ছে দেখ না! ছুটে পালাও, নয়তো চাপা পড়। সরে সে যাবে না, চাপাই পড়বে।

তাকে সরতে না দেখে গাড়িটা একপাশে গাদা করা জঞ্জালের উপর গিয়ে পড়ে থেমে গেল। রিক্সা আর ঠেলা-গাড়ির ভিড়ও থেমে গেল। কেউই জখম হয়নি, কিন্তু একটা ট্রেন দুর্ঘটনা যেন ঘটেছে, এমনি চিৎকারই উঠল চারদিকে।

গাড়ির চালক রাগে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। শুধু তার আত্মসম্মানেই ঘা পড়েনি, তার বড় লোক মনিব একটা পারিবারিক উৎসবে যাচ্ছিলেন, মাঝখানে এই ফ্যাসাদ বেঁধে নাহক দেরি হয়ে গেল তো। আত্মসম্মান খানিকটা বাঁচাবার জন্যেই সে খুশির কাছে এসে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে লাগল। আজকাল মারামারি করবার অন্ধিসন্ধি সে জেনে গেছে; তাছাড়া গায়ের জোরও তার আছে। তার ইচ্ছে হোলো, সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এখুনি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলেই সম্মান বজায় থাকবে। খুশি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সূর্যের আলো যেন মুহূর্তের জন্যে আরো উজ্জ্বল বলেই বোধ হোলো।

আগে এমন করে লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হওয়ার কথা স্বপ্নেও সে ভাবেনি, কিন্তু এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। আর এই তো ফুর্তির তার একটা উপায়, মারামারির কথা মনে হলেও তার ভয়ানক হাসি পায়।

মোটর চালকটা তার সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে গালাগাল দিচ্ছে! তার পরনে বিদেশী পোশাক—পঞ্চাশ-ষাট ডলার তার দাম হবে। কথার মাঝখানে তার জামার হাতা খুশি চেপে ধরল। রোগা, একেবারে রোগা এই বড় লোকের কুত্তাটা! হাতে যেন মাংসই নেই, সবই হাড়! এত জোরে সে ধরেছে যে, লোকটা ব্যথা পাচ্ছে, তার বিরাট থাবা কালি আর ঘামের দাগ এঁকে দিচ্ছে ওর দামী পোশাকের হাতায়, ও-দাগ কিছুতেই আর যাবে না। খুশি জানে, এইসব সায়েবী পেশাক-পরা ভদ্দর লোকরা পোশাক নোংরা হবার ভয়ে কেমন তটস্থ হয়ে যায়, তাদের অমন ধোপ-দুরস্ত পোশাকের নিচে ভীতু মনেরও সে খবর রাখে। তাই যেসব বাবু-ভায়ারা তাকে ন্যায্য ভাড়া না দিয়ে চলে যেতে চায় তাদের উপর সে এই কৌশলই খাটায়। তাদের শুধু পোশাকই নষ্ট হয় না, তারা খুশির শক্তির পরিচয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। তাদের জামার হাতার দাগটা তো উপহার। এই উপহার দিয়ে দাতা কিন্তু খুবই খুশি হয়ে ওঠে।

আর একটা জিনিসও সে শিখেছে। কটমট করে তাকিয়ে থাকতে সে জানে। এই তো মোটর-চালকটার দিকে এমনভাবে সে তাকিয়ে আছে, মনে হয় যেন এখুনি বেজন্মাটাকে ভস্ম করে ফেলবে!

একটা পুলিস গোলমাল দেখে হাজির হোলো। তার কাজ হচ্ছে মোটরের যাতায়াতের রাস্তা পরিষ্কার রাখা। খুশি তাকে দেখে ভয় পেল না। এইসব

অবস্থায় মুখ ছোটাতে হয়, কিল ঘুষির এখানে দরকার নেই। সমস্ত পুলিস ফৌজ তুলে যত খুশি গালাগাল দিলেই চুকে গেল। তারপর যদি দু-তিন হপ্তা জেল খাটতে হয় তাতেই বা ক্ষতি কি! মনের সাধ মিটিয়ে এত সস্তায় গালাগাল দেওয়ার আনন্দ তো আর কম নয়।

কিন্তু পুলিস বা খুশি, কেউ কথা বলবার আগেই মেয়েটি রিক্সা থেকে লাফিয়ে পড়ল।

এবার দেখলাম মোটর চালকেরই দোষ! এত তাড়াতাড়ি লোকটা গাড়ি ছুটিয়ে আসছিল যে আমরা হকচকিয়ে গিছলাম। বেচারী রিক্সাওয়ালার কিন্তু কোনো দোষ নেই।

পুলিশটা মেয়েটির কথায় কান দিল না। কয়েকমুহূর্ত আগেও সে ঠিক করে রেখেছিল, রিক্সাওয়ালাটাকে ধরে দুচার ঘা দেবে, লাথি মারবে। একদিকে একখানা প্রকাণ্ড গাড়ির মালিক, আর একদিকে এই রিক্সাওয়ালা ছোকরাটা— এখানে আর দ্বিধা নেই: তার কর্তব্য পরিষ্কার পড়ে রয়েছে। রিক্সাওয়ালাটা অসহায়, পয়সাও তার নেই; ওদিকে গাড়ির মালিক, বড় লোক অনেক বড় বড় বন্ধুবান্ধবও তার আছে: এমনকি সরকারও তার হুকুমে উঠবে, বসবে।

ছাত্রদের ব্যাপার আলাদা। ওদের টাকা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে; কিন্তু কেউ না কেউ ওদের মুরুব্বী আছেই, স্কুলে পড়তে তো পয়সা লাগে। যতোই তুমি ঘেন্না কর না কেন, তারা বড় সাংঘাতিক চিজ। বক্তৃতা দিচ্ছে, আর মিছিল নিয়ে চলেছে। তোমার ভাতের হাঁড়ি হয় তো গাড়ির এই মালিকের দয়ায়ই উনুনে চড়ছে, কিন্তু ছাত্রেরা বিরুদ্ধে গেলেও মুশকিল। 'এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে যাতে করে তোমার চাকরিতেই টান পড়বে।

মেয়েটি বার বার একই কথা বলল, হাঁ, হাঁ, গাড়িটারই দোষ! তোমার মনে হয়, রিক্সাখানা গিয়ে গাড়ির গায় ধাক্কা মেরেছে? সে পুলিস বা মোটর চালক কারো কাছেই হার মানতে রাজি নয়। খুশি অবাক হয়ে গেল। সে চালকের জামার হাতা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। না, মেয়েটার ক্ষমতা আছে বটে!

চলো, চলো! অনেক কাজ পড়ে আছে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ওরা এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করুক না, তুমি চলে এস!

মেয়েটি আবার রিক্সায় চড়ে বসে খুশিকে ডাকল। খুশি হাতল দুটো তুলে নিয়ে ওদের দিকে একবার ফিরে তাকাল। তার মুখে তখনো তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে আছে। মোটরচালক এবার তার দাগ ধরা পোশাকের দিকে তাকিয়ে গালাগাল দিতে শুরু

করল, কিন্তু পুলিসটি নিরুপায়, সে এখনো ঠিক করতে পারেনি, ছাত্রীটির না ঐ গাড়ির মালিকের—কার বেশি প্রতিপত্তি। কাকে ধরে শেষে ফ্যাসাদে পড়বে। হঠাৎ গাড়ি থেকে একটা স্বর শুনে তার ভাবনার খেই হারিয়ে গেল। রিক্সা তখন পশ্চিম ফটকের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে।

খুশি আজকাল তাড়াতাড়ি দৌড়য় না। সে ঠিক করেছে, বেশি পয়সা না দিলে সে কখনো দৌড়বে না, এমনি ঢিমে তালেই চলবে। তাই কোনো সোয়ারি জোরে ছুটতে হুকুম দিলেই সে মাটিতে পা ফেলে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে: জোরে চলতে বলছেন তো কত্তা? ভাড়ার উপর আর কত বেশি দেবেন? নিজের বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে, অত ভদ্রতা দেখানো আর চলবে না। কেউ তাকে খুশি হয়ে কিছু বকশিস করে যাবে একথা তার বিশ্বাসই হয় না। ভাড়া বেশি না পেলে বেশি তাগদ খরচ করে কোনো লাভ নেই।

মেয়েটিকে দেখে কিন্তু বেশি ভাড়ার কথা তার মনে হোলো না। ওকে যেন খুদে লক্ষ্মীর মতই ভক্তি করতে ইচ্ছে হয়; সে তাকে নিজের পায়ের জোর দেখিয়ে দেবে। ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করেছিল বলে এখন তার লজ্জাই হোলো। ছিঃ ছিঃ, মেয়েটির সঙ্গে অমন করা উচিত হয়নি। ওকে সে ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে সে লজ্জিত। খুশি এমনিধারা ভাবতে ভাবতে পশ্চিম ফটক পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমের সোজা শড়ক ধরে ছুটে চলল। কয়েক মাসের ভিতরে এত জোরে সে আর ছোটেনি।

খানিকক্ষণ পরে মেয়েটি কথা বলল। পুলিসের সঙ্গে মেয়েটির কথা শুনে খুশি চমকে গিছল, এবারও সে অবাক হয়ে গেল।

যত ভাড়াই পাও, অত জোরে ছুটো না ভাই! তোমরা তো আর জন্তু নও। খুশি অনিচ্ছাসত্বে বেগ কমিয়ে দিল।

গোটা কয়েক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মেয়েটি বলল, কিন্তু তার আগে তোমার নাম কি বল?

খুশি ঘাড় ফিরে তাকাল; তার মুখে খুশির ছোপ লেগেছে: সে তার নিজের নাম বলল।

রাজবন্দীদের মুক্তির জন্যে সেই যে মিছিল বেরিয়েছিল, তুমি তাতে ছিলে না? তোমাকে যেন নিশান হাতে ঐ ভিড়ের ভিতরে দেখেছিলাম। কি জন্যে ওখানে গিছলে ভাই? নিজের পরিশ্রম বিকিয়ে দু-দশ সেণ্ট রোজগার করতে গিছলে নাকি?

খুশি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কোন মিছিল সে জানে না, কিন্তু মেয়েটা ঠিকই ওকে দেখেছিল। নিজের কাছে নিজেকেই বোকা মনে হচ্ছে। জীবনে এমন লজ্জা তাকে কেউ দিতে পারেনি, পয়সা রোজগার করতে গিয়েই এই লজ্জা তো সে পেল;

নিজের নামের অক্ষরগুলো পর্যন্ত চেনে না, কি করে সে বলবে বিজ্ঞাপনে কি লেখা ছিল।

লেখাপড়া জানি না বটে, কিন্তু আমাকেও তো খেতে হবে,—একটা একটা কথা সে আস্তে আস্তে স্পষ্ট উচ্চারণ করল। ছোটাও তার কমে এসেছে, এখন সে একরকম হেঁটেই চলেছে।

বুঝেছি, বুঝেছি! মেয়েটি বাধা দিল। তার স্বরে সহানুভূতি ফুটে উঠেছে। খুশিও ওর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে তা টের পেয়েছিল।

না, না, তুমি কোনো ভুল করনি। তুমি জানো কি না জানো কিছু যায় আসে না, তুমিও আমাদের সাহায্য করছ এইটিই বড় কথা।' আমি শুধু বলছিলাম, 'তুমি যদি আমাদের মিছিলের ব্যাপারটা না বুঝে থাক, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

মেয়েটি এবার রাজবন্দীদের কাহিনী বলতে শুরু করল। কেন যে আজ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করছে, এ কথাও সে বুঝতে পারল। তাকে ঐ কাহিনী বলতে গিয়ে সে আরো নানা কথা এনে ফেলল, খুশি আবছা বুঝতে পারল, কোনোটা বা পারল না। কিন্তু তার মনে হোলো, তার দুঃখদুর্দশা এতদিন বোবা হয়ে পাকস্থলীতে পচছিল, আজ যেন মেয়েটির মুখে তারা ভাষা পেয়েছে। এতদিন সে ভাবত, তার দুঃশদুর্দশা বুঝি তার একার, আজ কিন্তু তা আর মনে হোলো না। তার মনের যেন একটা নতুন দরজা খুলে গেল।

একটা কথা সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, মেয়েটি অতি সৎ, স্বার্থপর একটুও নয়। সে তার কোনো অপকার করতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌছে সে তার ন্যায্য ভাড়ার থেকে ঢের বেশি হাতে গুঁজে দিল। খুশি নিতে রাজি হোলো না, কিন্তু মেয়েটি তাকে বলল, আমরা দুজনেই গরীব, কিন্তু আমার চাইতে তোমার টাকার দরকার অনেক বেশি। নাও, টাকা নাও!

পশ্চিম শহরের এক চা-খানায় বসে খুশি এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবল, কিন্তু কুল কিনারা করতে পারল না। শেষে সে ঠিক করল, আর ভাববে না। মেয়েটি যে কথাগুলো বলে গেল, খুবই সত্যি কথা, কিন্তু ওসব কি কোনোদিন আর কাজে হবে? আর কাজে হলেই বা তার কি সুবিধে? ওতে টাকা আসবে কোথা থেকে? মেয়েটির কথাগুলো মোটামুটি ভালো, কিন্তু টাকা—ওতে টাকা নেই! অথচ টাকা দিয়ে তুমি ভালোমন্দ খাবার, মদ কিনতে পার—ইচ্ছে করলে সাদা বাড়িতে যেতে পার—টাকার যতখানি দাম, মেয়েটির কথার ততো দাম নেই।

অভিজ্ঞতা জীবনকে উর্বর করে তোলে, একথা খুশি বোধ হয় এখনো বুঝতে পারেনি। যে-অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এলে সেই অভিজ্ঞতাই তোমার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবে। চামোর মরুভূমিতে ক্যামেলিয়া গাছে কখনো ফুল ফোটে

না। খুশি জীবনের ছোট্ট খোপে ঢুকে নিজেকে চিনতে পারল, এখন সে তার ভাই-বেরাদারদের থেকে ভালোও নয়, আবার খারাপও নয়। সে তাদেরই একজন, তাদের মতোই রিক্সা টানতে টানতে ব্যবসার উপর তার ঘেন্না ধরে। এখন মনটাও তার অনেক হালকা হয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধবও তার বহু জুটেছে। সে এখন আর একঘরে নয়। সব কাকই তো কালো, তার একার পাখা সাদা হয়ে কোনো লাভ নেই, আর সে তা চায়ও না।

এখন আগের চাইতে সে আরো শক্ত হয়েছে, পুলিস-টুলিস সে কেয়ারই করে না, পুলিসরাও খুশিকে গোঁয়ার বলেই জানে, কিন্তু ঘাঁটাতে সাহস হয় না। গরীবরা তো এমনি গোঁয়ার হবেই। তারা খেটেখুটে জীবন ক্ষয় করে ফেলে, কিন্তু তাদের খাটুনির কোনো মানেই হয় না। জীবনে তারা প্রতারিত হয়, আর আসে শূন্যতা। এই শূন্যতাই তাদের একগুঁয়ে, একরোখা করে দেয়। চলিত সমাজব্যবস্থার উপর এমনি করেই তারা প্রতিশোধ নেয়।

আবার শীত এল শহরে। মরুভূমি থেকে ধেয়ে এল বালির ঝড়, এল তুষার। প্রতি রাতেই দশজন করে লোক মরল পথে। এদের বাড়ি-ঘর নেই। এতদিন পথে পথেই আস্তানা গেড়েছিল, এবার শীতে সাবাড় হয়ে গেল। খুশি রাতে বাতাসের শব্দ শুনলেই কম্বল মুড়ি দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নেকড়ে বাঘের চিৎকার, সয়তানের কান্না না থামে ততক্ষণ পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। রিক্সা নিয়ে বেরুবে কি বেরুবে না, এই কথা ভাবতে ভাবতে সময় চলে যায়। রিক্সার হাতলদুটো ছোঁওয়ার কথা মনে হলেই কাঁপুনি ধরে। উঃ কি ঠাণ্ডাই হয়ে আছে না জানি! তার উপর বাতাসটাও খারাপ। বাতাসের শব্দ শুনলেই শরীরের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে।

এত যে প্রবল বাতাস, কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় তার জোর কমে যায়। ডুবন্ত সূর্যকে ভয় পায় কিনা কে জানে। মাঝে মাঝে সূর্যাস্তের পরে একেবারেই চুপ করে যায় বাতাস। গোধূলির আলো তখন ছড়িয়ে পড়ে, পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয় গোলাপী রং। খুশি এমনি এক সন্ধ্যেয় রিক্সা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। এ-পথ সে-পথ সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল, শরীরে তার জুত নেই, মনেও নেই উৎসাহ। মুখে একটা চেপ্টে-যাওয়া সিগারেটের টুকরো গুঁজে সে ঘুরতে লাগল। আকাশে মেঘ জমে উঠছে, কালো হয়ে গেছে। সে ঠিক করল, তাড়াতাড়ি দু-চারটে সোয়ারি টেনেই সে আস্তানায় ফিরে যাবে। আলোটাও সে জ্বালল না, এত কুঁড়ে সে হয়েছে। পথে পর পর পাঁচ ছজন পুলিস তাকে সেকথা মনে করিয়ে দিতে তবে সে আলো জ্বালল।

নহবৎ দরজার কাছে সে একজন সোয়ারি পেল। কিন্তু দৌড়তে তার ইচ্ছে হোলো না। একরকম হেঁটে হেটেই সে চলল। সে বুঝতে পারল, সোয়ারি তাকে বেতো-ঘোড়াই ভেবেছে। তা কি হবে? আগের মত জোরে ছুটতে সে চায় না। ওঃ, মুখ থাকবে না তো বয়েই গেল। কেউ তাকে জোর কদমে ছোটবার জন্যে একটা পয়সা বেশি দেবে? এ অবিশ্যি রিক্সা টানা নয়; শুধু ঘসড়ে ঘসড়ে যেমন করে হোক চলা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করল না, আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

একটা সরু গলিতে ঢুকতে যাবে এমন সময় একটা রাস্তার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল। আজ খুশি লম্বা আর ঢিলে পোশাকটা পরেই রিক্সা চালাচ্ছিল, পোশাক খুলে কোর্তা পরেনি। কিন্তু আর সবাই এমন বিশ্রী পোশাকটার উপর নজর না দিলেও কুকুরটা তাড়া করল। কুকুরটার কাছে কিন্তু বিশ্রী বলেই বোধ হোলো। হাতল ছুটি নামিয়ে রেখে ঝাড়নটা নিয়ে কুকুরটাকে সে তাড়া করল। কুকুরটার ছায়াও আর দেখা গেল না। খুশি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কে জানে কুকুরটা আবার আসবে কি না। কিন্তু কুকুরটা ফিরল না, খুশি আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল: বেজন্মা বেটা! ভেবেছিলি, ভয়ে একেবারে আমি কুঁকড়ে গেছি?

সোয়ারি বিরক্ত হয়েই বলল, কি রকম রিক্সাওয়ালা হে তুমি? কি যা-তা বকছ?

খুশির বুকে হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল। স্বরটা যেন খুবই চেনা—তাই না? গলিটা একেবারে অন্ধকার; রিক্সার আলোটা অবিশ্যি খুবই জোরাল, কিন্তু ওতে শুধু নিচের পথই দেখা যায়। এইতো—সোয়ারিকে সে ভালো করে দেখতেই পাচ্ছে না। ওর মাথায় ফারের টুপি কোট আর গলায় জড়ানো উলের কম্ফর্টারের ভিতর দিয়ে মুখখানা আবছা দেখা যাচ্ছে। বেটা মুখখানা ঢেকেছে বটে, নিশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া ঢোকার জো নেই। চোখ ছুটো কুৎকুৎ করছে দেখ না! গলার স্বরও যেন কেমন চাপা লোকটার।

কে লোকটা?

খুশি ঠাহর করছে চেষ্টা করছে, এমন সময় সোয়ারি নিজেই বলল:

আরে, খুশি না?

খুশি চিনতে পারল: সোয়ারিটি ন'কর্তা লিউ ছাড়া আর কেউ নয়—ন'কর্তা লিউ! খুশির সমস্ত গা পচা ঝোলের মতোই যেন টকে গেল।

আমার মেয়ে কোথায়?

মরে গেছে! খুশি বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল। ও-ছুটো কথা সে না আর কেউ বলল—সে বুঝতেই পারল না।

কি বললে? মারা গেছে?

হ্যাঁ, মারাই গেছে!

তোমার মতো হতচ্ছাড়ার হাতে পড়ে মারা যাবে না তো বেঁচে থাকবে নাকি?

এতক্ষণ সব যেন গোলমাল হয়ে গিছল। এবার সে নিজেকে খুঁজে পেল।

নেমে যাও, আমার রিক্সা থেকে এখুনি নেমে যাও! তোমার মতো বুড়োকে আমি মারতে চাইনা। নেমে যাও।

ন'কর্তা হাতল দুটো চেপে ধরে রিক্সা থেকে কাঁপতে কাঁপতে নেমে পড়লেন।

কোথায় তাকে গোর দিলে?

তা দিয়ে তোমার কি দরকার? খুশি রিক্সার হাতল দুটো তুলে নিয়ে রওনা হোলো।

কিছুদূর গিয়ে সে পিছন ফিরে দেখল, বুড়ো তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ছায়ার মতোই তাকে দেখা যাচ্ছে।

তেইশ

খুশি পথ হারিয়ে ফেলল। রিক্সার হাতল দুটো চেপে ধরে, মাথা উঁচু করে সে চলতে লাগল। তার চোখ ঝলসে উঠছে আলো, অন্ধকার যেন দূরে সরে সরে যাচ্ছে। কোন দিকে, কোথায় সে চলেছে জানে না, কেয়ার করে না। মন তার খুশিভরা; শরীরও যেন হালকা ঠেকছে, বাঘিনীকে বিয়ে করবার পর থেকে ভাগ্যের কিল-ঘুষো খেয়ে সে শুয়ে পড়েছিল, আজ যেন সব এক নিমেষে চলে গেছে। ন'কর্তার কাঁধের উপর সে যেন কি এক যাদুমন্তরে দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে খালাস পেয়েছে।

ঠাণ্ডাও আর তেমন লাগছে না, সোয়ারি ডাকবারও তার ইচ্ছে নাই। সে চলেছে তো চলেছেই। তার মনে হোলো, এমনি করে চলতে চলতে সে তার সেই পুরনো দিনে গিয়ে পৌঁছবে, খুঁজে পাবে পুরনো খুশিকে। সে-খুশি পরিশ্রম করে, উঁচু তার আশা, মনও তার পবিত্র।

সরু গলির ভিতরে সেই কালো ছায়াটার কথা তার মনে পড়ল। বুড়ো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বুড়োকে সে জব্দ করেছে, ন'কর্তাকে হার মানিয়েছে—আর কি চাই? এখন সব কিছুকেই সে হার মানাবে। অবিশ্যি, বুড়োটাকে একটা ঘুষি কি একটা লাথিও সে মারবার সুযোগ পায়নি, কিন্তু বুড়ো খুবই জব্দ হয়েছে। সংসারে তার একমাত্র আপনার জনের মরবার খবর খুশি তাকে শুনিয়ে দিয়েছে। খুশির কিন্তু খবরটা বলতে একটুও বাধেনি। এই তো জব্বর শাস্তি। বেজন্মা বুড়োটা যদি ধাক্কা খেয়ে মরেও না যায়, মরবার দাখিল নিশ্চয়ই হবে। ন'কর্তার সবই আছে, কিন্তু খুশির কিছুই নেই; কিন্তু খুশি এখন রিক্সা টেনে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে, মনে তার ফুর্তিরও অভাব হবে না। আর ন'কর্তার কি হবে? বেচারা তার নিজের মেয়ের কবরটাও খুঁজে বার করতে পারবে না।—কি মজা! বুড়ো, তোমার টাকা আছে, মেজাজ বেশ চড়া—স্বর্গমর্ত কাঁপিয়ে তুলছ—কিন্তু কি হোলো? একটা রাস্তার ভিখিরির কাছে হেরে গেলে!

যতই সে ভাবতে লাগল, ততোই তার ফুর্তি বেড়ে গেল। তার ইচ্ছে হোলো গলা ছেড়ে সে চিৎকার করে ওঠে, গান গেয়ে সে সমস্ত পৃথিবীকে শুনিয়ে দেয়: খুশি বেঁচে উঠেছে, আবার বেঁচে উঠেছে! খুশি জিতেছে, খুশি জিতেছে! রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া মুখের উপর চাবুকের মতো এসে পড়তে লাগল। তবু সে ঠাণ্ডা

বোধ করল না; বরং আনন্দই হোলো। রাস্তার আলোর তুষারের ধূলি-পড়া ঘোলাটে চাউনি তার মনে জাগাল সাড়া। চারদিকে আলো,—তার পথে এসে পড়েছে আলোর ছটা—ঐ আলোর ইঙ্গিত ধরেই আগামীর পথে সে এগিয়ে চলবে।

এক ঘণ্টা হোলো সে একটা সিগারেট খেয়েছিল, আর সে খাবে না! এখন থেকে মদ সে ছোঁবে না, সিগারেটও খাবে না। নতুন খাতাই সে খুলল,—আবার পরিশ্রম সে করবে, নিজেকে সে শোধরাবে। আজ ন'কর্তাকে হারিয়েছে, এখন থেকে পৃথিবীর যত ন'কর্তা আছে সবাইকে হারাবার চেষ্টা সে করবে। ন'কর্তা তাকে শাপান্ত করে গেল, কিন্তু শাপে বর হয়েছে। সে এবার নিজের পথ পেয়ে গেছে। ন'কর্তারা যাদের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তারাই তো আসে এই পথে, তারাই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার দাবী করে।

এক নিশ্বাসে সে যেন যতো রাগ ছিল সব উজাড় করে দিল—বাপ আর মেয়ের প্রভাব এতদিন তাকে ভূতের মতোই পেয়ে বসেছিল, আজ দূর হয়ে গেল, এখন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নিজের হাত-পার দিকে সে তাকাল। এখনো সে ছোকরাই আছে—চিরদিন সে তা থাকবেও। বাঘিনী মরুক, ন'কর্তা মরুক, খুশি ঠিক খুশিই থাকবে—তেমনি হাসিহাসি মুখ, তেমনি উঁচু আশাভরা, তেমনি জীবন্ত খুশি। মন্দ লোকদের মন্দ ভাগ্য হবে, তারা মরে যাবে; যে সৈন্যেরা তার রিক্সা কেড়ে নিয়েছিল তারা, ইয়াঙ,—সেই মাগিটা চাকর বাকরদের উপোস করিয়ে রাখতো, বাঘিনী ন'কর্তা, তার টাকা ঠকিয়েছে যে গোয়েন্দা বেটা, আর চিয়া বাড়ির চলানো মাগীটা সবাই মরে হেজে যাবে। শুধু থাকবে খুশি—চিরদিন বেঁচে থাকবে।

এই বেটা খুশি, এখন থেকে খুব খাটবি, সে নিজেকে কড়া ধমক দিল। নিজেই আবার উত্তর দিল তার: কেনই বা খাটব না বল? আমার তাগদ আছে, আছে মন—তাছাড়া বয়েসও আমার কম!

খুশির মনের বোঝা তো আর নেই। সে এখন স্বাধীন—এমনি করেই সে নিজের মনকে ঠাণ্ডা করল। কে এখন তার পথে এসে দাঁড়াবে, তার ব্যবসা নষ্ট করে দেবে, তাকে ঘর-সংসার পাততে দেবে না—কে—কে এমন লোক আছে? তার মতো কেইবা নিজের এত দুঃখদুর্দশার ভিতরে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারত? কেউ পারত না, সবাই দুর্দশার চাপে গুঁড়িয়ে যেত—সেও তো গিছল। কিন্তু এখন সে দিন আর নেই, কাল আবার নতুন খুশিকে তোমরা দেখতে পাবে—নতুন তার আশা-আকাঙ্ক্ষা—আগের চাইতে ঢের ঢের বেশি।

এমনি ধারা বিড় বিড় করতে করতে সে পথ চলতে লাগল। পায়ে যেন জোর বেড়ে গেছে—তাহলে কথাগুলো সে মিছেই বলেনি। সে পেয়েছে নতুন

শক্তি। শরীরে তার দুষ্ট রোগের বীজাণু ঢুকেছে, অসুখে সে মাঝে মাঝেই ভোগে—কিন্তু তাতে হয়েছে কি? তার মনই যখন বদলেছে, রোগ তো ফুস মন্তরে উড়ে যাবে, বীজাণু মুখ লুকোবে—তার ছেলেপুলে স্বাস্থ্য আর শক্তি নিয়েই জন্মাবে,—হাঁ, হাঁ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

দরদর করে তার শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল, গলা শুকিয়ে এসেছে। তেষ্টা মেটাবার জন্যে সে এদিক ওদিক তাকাল। না, না, চা-খানায় সে ঢুকবে না। আস্তানায় সে এসে গেছে প্রায়। রিক্সাখানা আড্ডায় রেখে একটা ছোট্ট ছেলেকে সে ডাকল। ছেলেটা মস্ত ভাঁড়ে করে চা বিক্রি করছে। বিশ্রী চা-ই সে দু-দু ভাঁড় শেষ করল। একেবারে থালা-বাসন ধোয়া জলের মতোই বিশ্রী, গিলতে গিয়ে গলায় আটকে যায়, গা বমি বমি করে। কিন্তু এখন সে এই চা-ই খাবে।…ভালো চা আর খাবারে টাকা নষ্ট সে করবে না।

খাবারও কিছু সে কিনল। এমন কিছু খাবার নয়, খানকয়েক কচুরি—ভিতরে বাঁধাকপির পুর দেওয়া। খেতে গেলে বালি কিচকিচ করে। গিলতে তার কষ্টই হোলো, কিন্তু খুশি নাছোড়, এইই সে কোনোরকমে গিলবে। যে নতুন জীবন সে শুরু করবে, তার প্রথম পরীক্ষা হিসেবে এই কখানা কচুরি শত কষ্ট হলেও সে খাবে।

খাওয়া শেষ করে হাতের চেটোয় সে মুখ মুছল। এখন সে কোথায় যাবে?

দুজায়গায় সে যেতে পারে, দুজন লোকের উপর তার বিশ্বাস আছে। যখন সে খাটবে বলেই ঠিক করেছে তখন এই দুজনকেই তাকে খুঁজে বার করতে—হবে। খুদে লক্ষ্মী আর চাও-কর্তা এই দুজনকে এখন তার বড় দরকার। চাও-কর্তা সাধু মানুষ; নিশ্চয়ই তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, তাকে উপায়ও বাতলে দেবেন। চাও-কর্তার কথামতো চললে তার আর দুঃখদুর্দশা থাকবে না। হাঁ, খুদে লক্ষ্মীকেও তার চাই। এই দুজনকে পেলে সে পৃথিবীর সঙ্গে যুঝতে পারবে। খুশি খেটে পয়সা কামাবে, খুদে লক্ষ্মী ঘর-কন্না করবে। কখনো তাদের অভাব হবে না। তারা সংসার চালিয়ে যাবে।

কিন্তু চাও-কর্তা ফিরেছেন কিনা তাই বা কে জানে? ফিরুন, না ফিরুন সে কাল লণ্ডনর্থ স্ট্রীটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে। যদি তাকে সেখানে না পায় তো শ্রীযুক্ত চো-র বাড়িতে খোঁজ নেবে। চো-র বাড়িতে গিয়ে শ্রীযুক্ত চোকে জিজ্ঞেস করে সে জেনে নেবে চাও কর্তা এখন কোথায় আছেন? তারপর সব ব্যাপার ঠিক হয়ে যাবেখন। বেশ, আজ সে সারা সন্ধ্যেটা রিক্সা টানবে, কাল ভোরে উঠেই চাও-কর্তার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। চাও-কর্তার সঙ্গে দেখা করে সে যাবে খুদে লক্ষ্মীর কাছে। তাকে গিয়ে সুখবর দেবে। এখনো সে কিছু

করতে পারেনি, কিন্তু এখন থেকে কিছু করবে বলেই ঠিক করেছে। খুদে লক্ষ্মীকে তার চাই, দুজনে মিলে তারা কাজ করবে, ভবিষ্যতের পথ এমনি করেই তো তৈরী হবে।

এমনি করে ভবিষ্যতের ছক কষে সে ছুটে গেল প্রথম সোয়ারির কাছে। ভাড়া ঠিক হবার আগেই পরনের ঢিলে কামিজ সে খুলে ফেলল, সাঁটো কোর্তা তার গায়ে। চোখে তার ঈগলের মতো ধারালো দৃষ্টি। আগের মত পায়ে জোর না থাকলেও উত্তেজনায় তার সারা শরীর গরম হয়ে উঠেছে। রিক্সা সে চালাচ্ছে, তার জীবন যেন রিক্সার ভিতর চারিয়ে যাচ্ছে। যা কিছু ঘটুক না কেন, খুশি এখনো সেই খুশিই আছে। এখনো ছুটতে মন করলে সে সকলের থেকে জোরেই ছুটতে পারে। কারো তাকে হারাবার ক্ষমতা নেই। সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। পথে অন্য রিক্সার সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে তাদের হারিয়ে দিল। এক দুরন্ত ক্ষ্যাপামি যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

তার গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। একবার ভাড়া খেটেই শরীর বেশ হালকা লাগল, পায়েও যেন জোর সে ফিরে পাচ্ছে। আবার ছুটল আর এক সোয়ারির সন্ধানে। নামি রেসের ঘোড়া যেমন দৌড়ে এসেই আবার ছুটবার জন্যে মাটিতে অধৈর্য হয়ে পা দাপায়, তেমনি হোলো খুশির অবস্থা। চুপ করে বসে থাকতে সে চাইল না, পারল না। এগারোটা পর্যন্ত সোয়ারি নিয়ে সে ছুটল, তারপর রিক্সাখানা আস্তানায় এনে রাখল।

ভোরবেলা কাপড় জামা ছেড়ে, খাওয়া দাওয়া সেরে সে আস্তানার ম্যানেজারকে হেসে বলল, একটা দিন আমি ছুটি নেব—অনেক কাজ আছে, সেরে ফেলব। পরদিন থেকে শুরু হবে নতুন জীবন।

সে প্রথমে লণ্ড নর্থ স্ট্রীটের দিকেই ছুটল। চাও-কর্তা হয়তো ফিরে এসে সেই বাড়িতেই উঠেছেন। যেতে যেতে সে বার বার এই প্রার্থনা করল: চাও-কর্তা যেন বাড়িতে থাকেন, হে ঈশ্বর, চাও-কর্তা যেন ফিরে আসেন! দোহাই, তোমার, আমাকে এমনি করে আর ঘুরিও না! পয়লা ব্যাপারেই যদি ধাক্কা খাই, তাহলে যে কিছুই করতে পারব না। খুশি তো একেবারে বদলে গেছে, হে স্বর্গের দেবতা, তোমাদের কি তবু দয়া হবে না, তোমরা কি তাকে রক্ষা করবে না?

চাওদের বাড়ির দরজায় বেল টিপতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠল। কে এসে দরজা খুলবে কে জানে! বুক কাঁপছে, কলজেটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে চেনা দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে রইল। আগের কথা মনেও পড়ছে না। সে শুধু ভাবছে: এমন কেউ এসে যেন দরজা খুলে দেয়, যার মুখখানা অন্তত সে দেখলেই চিনতে পারে। বহুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। একসময়ে

তার মনে হোলো বাড়িতে কেউ থাকে না। ফাঁকা বাড়ি না হলে এমন নির্জন হয় কখনো ?

হঠাৎ ভিতরে একটা শব্দ শোনা গেল। খুশি চমকে উঠল। সে যেন এমন একজন লোক যে, বন্ধুর মরা শরীরটা রাতে পাহারা দিচ্ছে, হঠাৎ শবাধারের ভিতরে ফিসফিসানি শুনে চমকে উঠল। দরজা এবার খুলেছে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ছিটকিনি, আর খিল খোলার। কার স্বরও যেন ভেসে এল—খুবই ঘনিষ্ঠ, খুবই অন্তরঙ্গ সে স্বর: ওমা তুমি! কাও-মা এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপর খুশি যে হঠাৎ? এতদিন তো দেখাই পাইনি? এত রোগা হয়ে গেলে কি করে?

খুশি তাকিয়ে দেখল, কাও-মা বেশ মুটিয়েছে।

কত্তা আছেন নাকি? খুশি জিজ্ঞেস করল। তার দুদণ্ড আলাপ করবার সময় নেই।

হাঁ, বাড়িতেই আছেন, তুমি ভালো লোক বাপু! এসেই কত্তা কত্তা শুরু করেছ, কেন তোমার সঙ্গে কি আমার চেনা নেই নাকি? তুমি তো একবার জিজ্ঞেসও করলে না, আমি ভালো আছি কিনা! এস, এস! হাঁ, এ-কমাস ভাল ছিলে তো খুশি? কথা বলতে বলতে কাও-মা তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

না, খুশি হেসে উত্তর দিল।

সেকি! কি ব্যাপার?…কত্তা! ঘরের বাইরে থেকে কাও-মা ডাকল। খুশি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

শ্রীযুক্ত চাও তার পড়বার ঘরে নার্শিসাস ফুলের টবগুলো রোদে নিয়ে রাখছিলেন।

এস, ভিতরে এস!

যাও, ভিতরে যাও! ফিরে এস, কথা হবেখন। আমি যাই গিন্নীকে গিয়ে খবর দিই, আমরা সবাই তোমার কথা বলাবলি করি, কি হোলো ছোকরার! অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? সরল লোককে সবাই ভালোবাসে। কাও-মা বকতে বকতে চাও-গিন্নির ঘরের দিকে চলে গেল।

খুশি এবার ঘরে ঢুকল।

কত্তা, আমি! সে ভাবল, কত্তার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

আরে এস, এস! শ্রীযুক্ত চাও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার গায়ে একটা ফতুয়া, মুখে প্রশান্ত হাসি। বোসো, বেসো! হাঁ—কি যেন তিনি ভাবলেন, তারপর বললেন, আমরা বহুদিন হোলো ফিরে এসেছি। বুড়ো চেঙের কাছে শুনেছিলাম, তুমি মানবমিলনেই আছ। একদিন কাও-মাকে সেখানে পাঠিয়েও ছিলাম, কিন্তু সে

তোমাকে পায়নি। আরে বোসো বোসো! তারপর কেমন ছিলে? কাজকর্ম ভালো চলছে তো?

খুশির কাঁদতে ইচ্ছে করল। তার বুকের এককোণে সে কত কথা লুকিয়ে রেখেছে, সেই জানে। সে সব কথা রক্ত দিয়ে তৈরী—লোকে তা বুঝতে পারবে না। অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল, সে চাইল তার সেই সরল কথার ধারা ঢেলে দিতে, বন্যা বইয়ে দিতে। একটা কথাও সে ভোলেনি, লাল নিশানের মতোই তার স্মৃতিতে তারা উজ্জ্বল হয়ে আছে। একটা কথা মনে পড়লেই নিশানের মতো সমস্ত স্মৃতি যেন ছড়িয়ে পড়ে তার সুমুখে।

কিন্তু চাও-কর্তার কাছে অমন এলোমেলো ভাবে বলতে পারবে না। আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে বলবে, একটির পর একটি ঘটনা সাজিয়ে নেবে তার মনে। এক জীবন্ত ইতিহাস সে বলতে যাচ্ছেঃ এর মানে সে জানে না, কিন্তু তিলে তিলে তারই দুঃখদুর্দশা দিয়ে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। সে-দুঃখদুর্দশাই তো তার জীবনের চরম সত্য, সেখানে একটুও আবছা কিছু নেই।

শ্রীযুক্ত চাও বুঝতে পারলেন যে খুশি পুরনো দিনের কথা ভাবছে। তিনি চুপ করে বসে রইলেন। কখন সে কথা কইবে কে জানে।

খুশি বোবার মতো বসে রইল। হঠাৎ একবার মাথা তুলে শ্রীযুক্ত চাওর দিকে তাকাল। কেউ শুনতে না চাইলে তারও বসবার ইচ্ছে নেই—এমনি যেন তার ভাবখানা।

বল খুশি, তুমি কি বলতে চাও? শ্রীযুক্ত চাও এবার বললেন।

খুশি তার নিজের জীবনের ঘটনা বলে গেল। প্রথম যেদিন গাঁ থেকে শহরে এল সেই থেকেই শুরু করল। এইসব বাজে কথা বলবার তার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু না বলে সে পারল না। তাহলে যে তার কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার স্মৃতিতে দুঃখের ছুরি দাগ কেটে কেটে এ কাহিনী লিখে দিয়েছে, বলতে গিয়ে সে কিছুই বাদ দিতে পারল না। কোথাও একটু বিদ্রূপের আভাসও দেখা দিল না। তার প্রতিবিন্দু ঘাম, প্রতিবিন্দু রক্ত নিংড়ে এই ঘটনার স্রোত চলেছে, একে সত্যিকারের রূপ দিতে তো হবেই।

সে সত্যিকারের রূপই দিল। তার কথায় ফুটে উঠল ছবির পর ছবি। শহরে এসে সে হোলো শ্রমিক; টাকা জমিয়ে সে রিক্সা কিনল, সেই রিক্সা সে হারাল, তারপর বহু দুঃখদুর্দশার মধ্য দিয়ে এই অবস্থায় সে পৌঁছেচে। সে নিজে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল, এমন স্বাভাবিকভাবে এতক্ষণ ধরে তাহলে সেও কথা বলতে পারে! ঘটনাগুলো যেন একটার পর একটা লাফিয়ে আসছে; এত জীবন্ত তারা। আর তারা তাদের নিজের কথা নিজেরাই বলছে; লাইনের পর লাইন আসছে,

আশা-আনন্দ, নিরাশা আর চোখের জলের আনাগোনা চলছে। অতীতের এই জীবন্ত মিছিল থামাতে পারে এমন সাধ্য তার নেই। কথা শেষ হলেও ওরা যেন থাকবে, ওর চারপাশে ঘুরবে। বলতে বলতে খুশির বুকের ভার খানিকটা হালকা হয়ে গেল, সে খুশি হয়ে উঠল। সে নিজেকে ভুলেই গেল। প্রতিটা কথা যেন তার নিজেরই একটা অংশ, তার নিপীড়িত, পতিত আত্মার এক অসংকোচ নিবেদন।

কাহিনী শেষ হয়ে গেল। তার কপালে ঘাম পড়ছে। বুক একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে, ফাঁকা আর শান্ত তার বুক। যেন সে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল, এবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, চোখ চাইছে।

তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছ বোধ হয়?

খুশি ঘাড় নাড়ল। যা বলবার সে বলেছে, এখন আর কথা বলতে তার ইচ্ছে করছে না।

বেশ! কিন্তু গেয়েন্দার ব্যাপারটা আমি প্রথমে তোমাকে বলতে চাই। ওটা বোধ হয় তুমি এখনো ঠিক বুঝতে পারনি? আমি যখন চলে গেলাম, তখন তো তুমি—

হুঁ!

হাঁ, ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দুই এক ক্লাসে পড়াই। উয়ান সিঙ্ বলে ওখানকার একটি ছেলে প্রথম থেকেই আমার কাছে আসত যেত, পড়া বুঝে নিত। লোকে আমাকে সোশালিস্ট বলে জানে। ওঃ একদম ভুলে গেছলাম যে, তুমি আবার খুলে না বললে বুঝতে পারবে না। সোশালিস্টরা বিশ্বাস করে যে, জমি, কারখানা সব সাধারণ মানুষের জন্যেই হবে, তারা তার লাভের ভাগ পাবে। কয়েকটা মুনাফাখোরের হাতে এসব থাকলে তারা শুধু গরীবকে শুষে নিজেরা টাকা জমাবে, গাড়ি কিনবে, ভালো খাবে-দাবে, এদিকে অন্য লোকেরা মরবে উপোস করে। কি, বুঝতে পারলে তো?

খুশি দায় মারা গোছের মাথা নাড়ল। সেই ছাত্রীটির কথা তার মনে পড়ল, তাকে চিঙ্‌হুয়া নিয়ে যাওয়ার সময় এমনি কয়েকটা কথা সে বলেছিল। কিন্তু পৃথিবীতে ওসব কখনো হবে না, সে জানে।

এখন এই উয়ান সিঙ্ ছোকরাটা আমার থেকেও কড়া সোশালিস্ট বলেই নিজেকে জাহির করত, তাই ওর সঙ্গে প্রায়ই আমি তর্ক-বিতর্ক করতাম। কিন্তু সে ছাত্র আর আমি তার মাষ্টার বলেই ব্যাপারটা কখনো ঝগড়ায় দাঁড়ায় নি। মাষ্টারদের কাজই হচ্ছে, ছাত্ররা কি রকম পড়লো দেখা, আমার সঙ্গে ভাব করে যে পড়াশুনোয় কেউ ফাঁকি দেবে এ আমি কখনো চাই না।

খুশি কিছুই বুঝতে পারল না। চাও-কর্তাকে সে মান্য করে, তাই শুনবার আগ্রহ দেখিয়ে বসে রইল। সে বুঝতেই পারল না গোয়েন্দা সানের সঙ্গে উয়ান সিঙের কি সম্বন্ধ।

শ্রীযুক্ত চাও' টের পেয়ে বললেন, উয়ান সিঙের কথা কেন বলছি, এখনি বুঝতে পারবে। আবার তিনি বলতে শুরু করলেন।

কিছুদিনের ভিতরেই আমি বুঝতে পারলাম, উয়ান সিঙের মত আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে যা বলে নিজেই তা বিশ্বাস করে না। শুধু সকলের চাইতে সে জ্ঞানী, এইটে দেখাবার জন্যেই বিপ্লবের বড় বড় বুলিগুলো আওড়ায়। ক্লাশের পড়ার দিকেও তার নজর নেই। আমার সঙ্গে সে বড় বড় কথা বলবার সুবিধে হবে বলেই সে ভাব করেনি, তার পরীক্ষার খাতায় ছাইপাশ যাই সে লিখুক না কেন—তাকে আমি পাসের নম্বর দিয়ে দেব—এই ভেবেই সে ভাব করেছিল।

আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত চাও-এর মন কিছুক্ষণের জন্যে নিজের চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গেল, সে এইটাই ভাবত যে, দেশের অরাজকতার সুযোগ নিয়ে যেসব নেতা ওঠেন তারা অনেক দিকে অপদার্থই হন। আমি ইতিহাস পড়েছি, সুতরাং একথা জেনে তাকে নিশ্চয়ই পরীক্ষায় ফেল করবে না। সেও তো একজন হবু নেতা। তার নজিরও ছিল বহু। লেখাপড়া নিয়ে কথা উঠলেই সে বলত: কোন বিখ্যাত লোকটা স্কুলে গাধা ছিল না আমাকে বলুন?

যখন পরীক্ষা এল আমি ওকে আমার বিষয়ে পাসের নম্বর দিতে পারলাম না। আর অন্যসব বিষয়েও এত খারাপ করেছিল যে আমি পাস-নম্বর দিলেও ক্লাসে উঠতে সে কিছুতেই পারত না। তবু আমার উপরই তার রাগ হোলো, যেন আমি তাকে পাস করিয়ে দিলাম না, ছেলেদের কাছে তার মুখ রইল না। তা মান বজায় রাখাও তো বিপ্লবের মতোই বিশেষ দরকারী জিনিস! শ্রীযুক্ত চাও হাসলেন।

সে ভাবল, আমি এমন একজন ছাত্রকে বুঝতে পারলাম না। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা এত ভালো অথচ আমিই কিনা শেষে তার পরীক্ষায় ফেল করার কারণ হলাম। সে এবার ছেলেদের কাছে বলে বেড়াতে লাগল, আমার হাড়ে হাড়ে দুষ্টবুদ্ধি—আমি বিশ্বাসঘাতক।

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পাস করালেই সে টিকে যেত, আমি না হয় আর একবার তার পরীক্ষা নিতাম, পাস করিয়েও দিতাম। কিন্তু সে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিল। সে সমাজব্যাবস্থা বদলাবর জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। তার আর পড়াশুনো করবার সময় তখন কোথায়? সে বলে বেড়াতে লাগল সমাজ

ব্যবস্থা বদলাবার চেষ্টাই সে করবে, পড়াশুনো চুলোয় যাক। ও কেমন কুড়েও যেন হয়ে গেল, কিন্তু বিনা পরিশ্রমে মান মর্যাদা পাবার ফিকির খুঁজে বেড়াতে লাগল। সোশালিস্ট কজন আছে বল তো?

হাঁ, যখন সে দেখল, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোনোরকমেই টিকতে পারবে না, তখন আমার উপরে এসে তার সমস্ত রাগ পড়ল। এ-যেন তেমনি একজন লোক—যাকে টাকার জন্যে কেউ বন্দি করে রেখেছে, কিন্তু এই অবস্থার ভিতরে মুক্তির টাকার ভাগীদার জোটাতে সে ব্যস্ত। সে ভাবল, সে তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাবেই, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমি যেসব কথা সরকার বা সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ক্লাসে বলেছি, সেইসব কথা ভালো করে জোড়াতাড়া দিয়ে গুপ্ত সংবাদ হিসেবে কর্তৃপক্ষের কানে তুলল। সে এও বলল যে, আমার মত উগ্র বামপন্থীকে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে দেওয়া উচিত নয়। আমি এই সব উদ্ভট মত প্রচার করে ছোকরাদের মাথা খাচ্ছি।

পরে আমি এসব জেনেছি, তখন শুধু একটা গুজব কানে এসেছিল, আমি ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিলাম। হাসির কথা বইকি—আমাকে ওরা শেষটায় বিপ্লবের অগ্রদূত বলে ঠাওরালে। সত্যি এমন কথা কখনো বিশ্বাস করা যায়। আমার সঙ্গে যারা কাজ করতেন আর কয়েকজন ছাত্র আমাকে একটু সাবধান থাকতে বলল।

শ্রীযুক্ত চাও সবই বললেন, শুধু এই কথা এড়িয়ে গেলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে তার ধারণাটা নিতান্তই ভাসা-ভাসা, তিনি যে সৌন্দর্যের বোধ পেয়েছেন, সেই সৌন্দর্যই তাকে বিপ্লবী হতে দেবে না। কিন্তু এই শিক্ষাই তার হোলো যে, নিজে নির্দোষ হলেও অভিযোগ আসতে কিছুমাত্র বাধে না। অথচ তিনি ভাবতেন, পৃথিবীর এই হইহট্টগোলের মধ্যে শান্ত মনই হচ্ছে নিরাপত্তার একমাত্র উপায়। কি ভুলই না তিনি ভেবেছিলেন!

খুশিকে তিনি বলতে লাগলেন, শীতের ছুটিতেই গোয়েন্দারা শিক্ষাবিভাগকে ঠাণ্ডা করবার সুযোগ খোঁজে। তারা নানা তদন্ত করে, খানাতল্লাশ করে। আমার অনেক সময়েই মনে হোতো, কে যেন আমার পেছনে লেগে আছে, পিছনের এই ছায়ার টের পেয়েই আমি সাবধান হয়ে গেলাম। তাহলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয় দেখছি।

আমি এ নিয়ে ভাবতেও শুরু করলাম। যদি পাস করতে হয় এই তো মস্ত সুযোগ। বোমা ফেলা বা অন্য কিছু করার চাইতে দুদশদিন জেলে যাওয়া ঢের সহজ, শ্রীযুক্ত চাও আবার হাসলেন। জেলে গেলেই নামের পথ তৈরী হয়ে গেল।

খুশিও হাসল। এবার ব্যাপারটা যেন খানিকটা বুঝতে পারছে। চাও-কর্তার এখান থেকে যাওয়ার পর বেশ বার কতক জেল খেটে এসেছে। সে অবিশ্যি নাম কিনতে পারেনি, কিন্তু জেলে গেলে যে কটা দিন বেশ সুস্থে কাটানো যায়, একথা সে জানে।

কিন্তু অমন সস্তায় কিস্তি মাত করতে আমি চাই না। সরকারের মতো অমন খেলা খেলতেও আমি রাজি নই। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ নাম কেনবারও তখন সুবিধে ছিল, কিন্তু আমি তা পারলাম না। শ্রীযুক্ত চাও কথাগুলো বলে গেলেন, এর পিছনে রইল এক গভীর মনস্তত্ত্ব। তিনি সত্যিকারের বিপ্লবী নন বলেই নিজেকে ঘৃণা করেন, আবার নকল বিপ্লবী হতেও তিনি রাজি নন।

আমি গিয়ে আমার বন্ধু চোর কাছে পরামর্শ চাইলাম। চো উপায় বাতলে দিলে। সে বললে, যখনই বেগতিক দেখবে, আমার বাড়িতে এসে উঠবে। আমার বাড়ি ওরা তল্লাস করবে না। চোর বহু বান্ধব আছে, আর বন্ধুরা যে আইনের থেকে অনেক বড় একথা তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি এখানে এসে কদিন থাক, তাহলেই ওরা বুঝবে তুমি ভয় পেয়েছ। চো বুদ্ধি দিল, তারপর ওদের কাছে গিয়ে অপোস করে ফেললেই হবে, কটা টাকা হয়তো খরচ হবে। একে তো আমরা ভয় পেয়েছি শুনলেই তারা খুশি হবে, তার উপর হাতে টাকা গুঁজে দিলে তো আর কথাই নাই। তারপর তুমি বাড়ি ফিরে যেও, দেখবে কিছু হবে না।

গোয়েন্দা সানের উপর ছিল আমাকে নজরে রাখার ভার! সে আমাকে প্রায়ই চো-র বাড়িতে যেতে দেখেছে। সে বুঝতে পেরেছিল, তাড়া খেলেই আমি চো-র বাড়িতে গিয়ে উঠব। কিন্তু চো-র বাড়িতে এসে তো আর হামলা করতে পারে না। তাছাড়া আমাকে হয় তো ঘাবড়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। সে যাই হোক, চো-বাড়িতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারলে যে আমার কাছ থেকে একটা পয়সাও পাবে না, একথা ওরা জানত।

সুতরাং সেই ভাবেই ওরা কাজ করল। আমার কিছু টাকা গেল, ভয় পেয়ে সাঙহাই পালিয়ে গিয়ে কমাস রইলাম। কিন্তু এত ভয় পাবার সত্যিই কারণ ছিল না।

খুশি সানের উপরে রেগে লাল হয়ে উঠল: ওরা আমার টাকা কেড়ে নিয়ে গেল যে?

শ্রীযুক্ত চাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তোমার টাকা কেড়ে নেওয়া আসলে গোয়েন্দা বিভাগের মতলব ছিল না। কিন্তু তোমাকে সামনে পেয়ে গোয়েন্দাটার মাথায় বোধ হয় এই মতলব খেলে। ধরতেই যখন পেরেছে, তখন আর শিকার না

করে ছেড়ে দেয় কেন? পুলিসের লোকগুলো ঐ ফিকিরেই তো থাকে। ওরা ভাবে, লোকটা যখন সামনেই রয়েছে, তখন দশ-বিশ ডলার যা পাওয়া যায় মোচড় দিয়ে নেওয়া যাক।

খুশি সেদিনের কথা মনে করে অস্ফুট চিৎকার করল। সেদিনের কথা এখনো সে ভুলতে পারেনি, সেকথা মনে করলে তার কান্না পায়।

হাঁ, হাঁ, তাকে ঠিক কায়দামতো পেয়ে গেল কিনা, যা পারে আদায় করে নিল। এতে তোমার কোনো দোষ নেই। তোমার মনে আছে তো, আমিই তোমাকে বাড়ি যেতে বলেছিলাম, যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে আমার। শ্রীযুক্ত চাও এবার কথাটা পালটে অন্য কথায় এলেন। যা ঘটে গেছে তার তো আর উপায় নেই। খুশি এ নিয়ে বেশি ভাবে তিনি চান না। তুমি তো সব ব্যাপার জানোই। কিন্তু যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কি হবে, এখন কি করতে চাও বলো? এখনো রিক্সাই টানবে না কি?

খুশি মাথা নাড়ল। এই একটা জিনিসই সে এখনো পারে। এ ছাড়া সে আর কি করবে?

যখন রিক্সাই টানতে চাও, শ্রীযুক্ত চাও আস্তে আস্তে বললেন, দুটো উপায় আছে। এক টাকা জোগাড় করে নিজের রিক্সা কেনা, আর এক উপায় ভাড়া নিয়ে টানা। ঠিক বলিনি? তোমার হাতে তো কিছু পুঁজি নেই, তোমাকে তো টাকা ধার করেই রিক্সা কিনতে হবে? তখন যে টাকাটা ভাড়ায় যেত সেইটে সুদে চলে যাবে। তাই বলি, প্রথমটা একখানা রিক্সা ভাড়া নিয়েই শুরু করে দাও। আর মাস-মাইনের কাজে ছুটকো ভাড়াখাটার চাইতে ঢের বেশি সুবিধে। কাজের একটা সময় বাঁধা আছে, তাছাড়া মাসের শেষেই মাইনেটা আসছে, খোরাক আর থাকবার জায়গার জন্যেও তোমার কিছু খরচা হবে না। আমি যা দেখছি, তাতে আমার তো মনে হয়, আমার এখানেই তোমার চলে আসা ভালো। আমি চো-র কাছে আমার রিক্সাখানা বিক্রি করে দিয়েছি। তা একখানা না হয় ভাড়া করেই নেব। কি বলো তুমি?

তাহলে তো খুব ভালো হয় কত্তা! খুশি উঠে দাঁড়াল।

হাঁ, একটা ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত, শ্রীযুক্ত চো যেন আপন মনে বলছেন বলেই মনে হোলো, আমি এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই না, কিন্তু উয়ান এখন হোমরা-চোমরা সরকারী কর্মচারী। আমার তার সঙ্গে এখন খুব কিন্তু—

খুশি হাতের একটা ভঙ্গী করে বলল, কত্তা যদি না ডরান, আমিই বা ডরাব কেন?

বেশ, বেশ! শ্রীযুক্ত চাও হাসলেন। হাঁ, এইমাত্র না খুদে লক্ষ্মীর কথা বলছিলে? তার সম্বন্ধে কি করবে ভেবেছ?

আমার মাথায় তো কোনো মতলবই আসছে না।

আচ্ছা, তোমার হয়ে আমিই না নয় ভেবে দেখব, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়। তুমি এখুনি যদি তাকে বিয়ে করে একটা ঘর ভাড়া নিতে চাও তাহলে খুব সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না। ঘর ভাড়া, কয়লা, আলো, এইসব কিনতে কিনতেই তোমার টাকা উড়ে যাবে। মাইনেয় মোটেই কুলোবে না। এক হয়, কোথাও যদি দুজনের জন্যেই চাকরি জোগাড় করতে পার। একই বাড়িতে তুমি রিক্সাওয়ালা আর তোমার বৌ ঝি হবে, এরকম ভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। শ্রীযুক্ত চাও মাথা নাড়লেন। না, না, আমাকে ভুল বুঝো না! আচ্ছা, কখন তুমি মেয়েটিকে বিয়ে করবে ঠিক করলে? ওকে কি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়?

খুশির মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল; কয়েকবার ঢোক গিলে সে বলল: যখন আর কোনো উপায় ছিল না, তখনই তো ঐ ব্যবসা ও নিল। আমার মাথার দিব্যি কত্তা, আমি অমন ভালো মেয়ে দেখিনি! সে—তার মনে সব যেন গোল পাকিয়ে গেছে: একটা যেন লোহার বলের মতো হৃদয়বৃত্তিগুলো এতদিন শক্ত হয়ে ছিল, এবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। সে কথা শেষ করতে পারল না, থেমে গেল।

যদি তাইই হয়, চাও আস্তে আস্তেই বললেন, ব্যাপারটা যেন একটু বেশি ঘোরালো, তাড়াতাড়ি কোনো পরামর্শ দেওয়া চলে না, এক হয় যদি তোমাদের দুজনকেই এখানে রাখি। তুমি তো গোটা একটা ঘরই পাবে, দুজন হলেও সেখানে কোনো অসুবিধে হবে না। থাকবার সমস্যা তো একরকম মিটল! আমি জানি না, সে বাসন-কোসন ধোয়া বা দুএকটা টুকিটাকি কাজ পারবে কিনা। যদি পারে তো কাও-মার সাহায্যই হবে। শীগ্‌গিরই তোমাদের কর্ত্রীর ছেলেপুলে হবে। কাও-মার ঘাড়ে তখন বহু কাজকর্ম চাপবে। খুদে লক্ষ্মী তাকে সাহায্য করতে পারলে তো খুবই ভালো হয়! আমি তাকে খোরাক দেব, কিন্তু মাইনে দিতে পারবো না। কি এ ব্যবস্থাটা তোমার কেমন মনে হয়?

সে তো চমৎকার হবে কত্তা! খুশি ছোট ছেলের মতোই সহজভাবে হাসল।

তাছাড়া যতদিন তোমার চুরি যাওয়া টাকাটা না পূরণ হয় ততদিন প্রতি মাসে কয়েক ডলার করে বেশি মাইনে দেব। খুশির মুখে এমন কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠল যে শ্রীযুক্ত চাও তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফেরালেন। হাঁ, আর একটা কথা। মেয়েটির সম্পর্কেই বলছি—একা তো আমি কিছু বলতে পারছিনে—তোমাদের কর্ত্রীকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে—

নিশ্চয়ই! খুশি বলল, কর্ত্রী যদি দেখতে চান, আমি ওকে এখানে নিয়ে অসবখন।

হাঁ, হাঁ, তাইই কর, শ্রীযুক্ত চাও হাসলেন, আমি কথাটা তোমাদের কর্ত্রীর কাছে পেড়ে রাখব, তুমি তারপর একদিন এর ভিতরে ওকে নিয়ে এসো। উনি যদি রাজি হয়ে যান তো সব দিক দিয়েই ভালো হয়।

আমি এখুনি যাব কর্তা? খুশি খুদে লক্ষ্মীকে এখুনি খুঁজে বার করতে চায়, তাকে জানাতে চায় এই সুখবর। এতো সে আশাও করতে পারেনি।

দুপুরের ঠিক আগে সে চাও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। শীতের শেষ দিকের এই সময়টা চমৎকার। একেবারে খটখটে দিন, উজ্জ্বল নীল আকাশে একখণ্ড মেঘ নেই; সূর্যের আলো ছড়িয়ে গেছে সারা শহরে, উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে চুপিয়ে উঠছে আনন্দ। মোরগ ডাকছে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, ফেরীওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে। এক রাস্তার গোলমাল আর এক রাস্তায় এসে পৌছুচ্ছে। রিক্সাগুলোর পর্যন্ত ঢাকনি খোলা, আলোয় চকচক করছে পিতলের কাজ, পথে উট ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে, মোটরগাড়ি ছুটছে। মানুষ, জন্তু, গাড়ি-ঘোড়া, পাখী—শহরের প্রতিটি স্পন্দন যেন নতুন রূপ নিয়ে আজ ভোরে দেখা দিয়েছে। এই হৈ-হট্টগোলের ভিতরেও এক শান্তির ছোঁয়া লেগেছে। পথের পাশের গাছপালাগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

খুশির মনে হোলো, কলজেটা যেন শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে পাখা গজিয়ে পায়রার মতোই আকাশের নীলে উড়ে বেড়াতে চাইছে। সে যা এতদিন ধরে চেয়েছে সবই তো আজ মুঠোর ভিতরে। কাজ, মাইনে, খুদে লক্ষ্মী সবাইকেই সে পেল। এতদিন ভেবে ভেবেও সে কিছু ঠিক করতে পারেনি, অথচ আজ কটা কথায় সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। এ তো সে ভাবতেও পারেনি।

আরি সুখের সময় এলে কি আবহাওয়াও বদলে যায় নাকি। শীতকালে এমন চমৎকার দিন তো তার কখনো নজরেই পড়েনি।

তার খুবই আনন্দ হোলো। সে চট করে কিছু বরফ দেওয়া খেজুর কিনে ফেলল। খেজুরগুলো এত ঠাণ্ডা! তা কি করবে, এই আনন্দ তো সে ফুস করে উড়ে যেতে দেবে না। খেজুরে কামড় দিতেই মুখখানা যেন ঠাণ্ডা মেরে গেল, দাঁতের গোড়া শির্ শির্ করে উঠল। এবার গলা বেয়ে পাকস্থলীতে নামছে, সারা শরীরে লেগেছে কাঁপুনি। দুতিন বার চেষ্টা করে সে কোঁত করে গিলে ফেলল। জিভ অসাড় হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরটা যেন শান্ত, বড় শান্ত হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে খুদে লক্ষ্মীর খোঁজে চলল। তার মনে ভেসে উঠল, সেই সরকারি উঠোন, সেই পায়রার খোপ, সেইখানেই সে থাকে—তাকে সে ভালোবাসে। দূর, পা যে চলছেই না। আহা, তার যদি এখন দুখানি পাখনা হোতো সে উড়ে চলে যেত তার কাছে। একবার তার দেখা পেলে হয়, তারপর

অতীতকে সে এক খোঁচায় বাতিল করে দেবে; নতুন পৃথিবীতে থাকবে তারা দুজন। সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। তার তাগিদ যেন বেড়ে গেছে, কই চাও-কর্তার সঙ্গে দেখা করতে তো এত তাড়াতাড়ি সে ছুটে যায়নি। চাও-কর্তা তার মনিব, তার বন্ধু মিতা, তাকে সে ভক্তি করে, মান্য করে, কিন্তু খুদে লক্ষ্মীকে সে ভালোবাসে, তার জন্যে তো তাগিদ একটু বেশিই হবে।

খুদে লক্ষ্মী তো তার শুধু বন্ধুই নয়; সে তাকে প্রায় সমস্ত জীবন বিলিয়ে দেবে, উৎসর্গ করবে। তারা যেন দুটি আত্মা নরক থেকে সবে মুক্তি পেয়েছে; দুর্দিনে দুজনের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরাধরি করে সুমুখের দিকে এগিয়ে চলবে। চাও-কর্তার কথায় তাকে অভিভূত করেছে, কিন্তু খুদে লক্ষ্মীর তো কথা বলারই দরকার নেই। চাও-কর্তার কাছে সে বলেছে তার জীবনের কাহিনী, কিন্তু খুদে লক্ষ্মীকে তা বলার তো দরকার নেই। সে এমন কথা তাকে শোনাবে, যা শুধু তাকেই বলা যায়, সে যেন তার জীবন, তাকে না পেলে জীবনের কোনো মানেই হয় না, কিছুরই মানে হয় না। নিজের খাওয়ার জন্যে পরিশ্রম করা তো বোকামি। সে বোকামি সে এতদিন করে এসেছে, লক্ষ্মীছাড়া জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু ভালো তো লাগেনি। তাই তো আজ চলেছে খুদে লক্ষ্মীকে সেই পায়রার খোপ থেকে ছিনিয়ে আনতে। সে যে সেখানে বন্দী। তাকে খালাস করে এনে সে আর খুদে লক্ষ্মী দুজনে বাসা বাঁধবে মস্ত বড় এক ঘরে। খটখটে শুকনো আর ঝক ঝকে সে ঘর। দুটি ছোট পাখীর মতোই তারা থাকবে। স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক আর একান্ত অন্তরঙ্গ হবে তাদের জীবন।

খুদে লক্ষ্মী বাপ-ভাইদের সংসার ছেড়ে তার কাছেই চলে আসবে, জোরমস্ত? জোরমস্ত তো ইচ্ছে করলেই কাজ দেখতে পারে, ছেলে দুটোর জন্যেও কাজের জোগাড় হয়ে যাবে। ওরা দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে একখানা রিক্সাও তো চালাতে পারে। খুদে লক্ষ্মীকে না হলেও ওদের চলে যাবে, কিন্তু খুশির তো চলবে না! খুশির তাকে চাই, তাকে পাওয়া চাই। তার নিজের শরীর, মন, কাজ, সব কিছুর জন্যেই তো খুদে লক্ষ্মীকে দরকার। খুদে লক্ষ্মীরও তার মতো পুরুষ ছাড়া গতি নেই।

যতই সে এমনি ধারা ভাবতে লাগল, ততই তার মন গেল খুশিতে ভরে, পা-ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন ছুটে চলল। এই আকাশের নিচে, এই দুনিয়ায়, মেয়ে তো বহু আছে, কিন্তু খুদে লক্ষ্মীর মতো বুঝি আর একটিও নেই। ঠিক যেন ওরই সঙ্গে জোড় বাঁধবার জন্যেই তৈরী হয়েছে এমন মেয়ে। এরই মধ্যে একটা মেয়েমানুষকে সে বিয়ে করেছে, আর একটাকে ফুসলে সে ঘায়েল করেছে—না, সে ঘায়েল করেনি; তাকেই ঘায়েল করেছে। তাছাড়া বুড়ী আর ছুঁড়ী বহু মেয়েদের সঙ্গেই সে রাত্তের

পর রাত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কেউ বা তারা সুন্দরী, কেউ বা কুৎসিত; কিন্তু কেউই মনের উপর ছাপ রেখে যেতে পারেনি তারা শুধু মেয়েমানুষ, খেলনা, দুদণ্ড খেলা করা যায়, কিন্তু সেরা মেয়েমানুষ নয়—তার সারা জীবনের সঙ্গী হতে পারে এমন তারা নয়।

এ অবিশ্যি সত্যি যে, শহরে প্রথম যখন এসেছিল তার মনের আশা ছিল, একটি সতী মেয়েকেই সে বিয়ে করবে। খুদে লক্ষ্মী সেদিক দিয়ে সতী মেয়ে মোটেই নয়। সে তো শরীর বিকিয়ে রোজগার করে। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে বড় মায়া হয়, তাছাড়া কাজে সাহায্য করতে এমন মেয়ের জুড়ি মিলবে না। গাঁয়ের মেয়েরা সতী হতে পারে, কিন্তু তাদের তো খুদে লক্ষ্মীর মতো অমন বুদ্ধি নেই। মেয়েটার বুদ্ধি নানা দিকে ঘোরা ফেরা করে। তারপর নিজের কথাটাও তো একবার ভাবতে হবে। তার মনেও তো বহু দাগ ধরে গেছে। সেই বা কোন ভালো আছে? তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুজনেই মিলেছে ভালো। কেউ কারো চাইতে উঁচু ধাপের লোক নয়। তারা যেন দুটো কলসী, দুটোই ফাটা, কিন্তু এখনো জল পড়ে না, তাদের পাশাপাশি থাকাই তো উচিত।

যে দিক থেকেই খাতয়ে দেখা যাক না, তাদের মিলনে ভালোই হবে। ভাবতে ভাবতে খুশি এবার বাস্তবে নেমে এল। প্রথম মাসের মাইনেটা সে আগাম পাচ্ছে—তাছাড়া চাও-কর্তা কিছু, সেই চুরি-যাওয়া টাকাটার কিছুও দেবেনখন, ঐটাকাটা পেলে তুলোর একটা কামিজ সে খুদে লক্ষ্মীকে কিনে দেবে, জুতো আর মোজাও অবিশ্যি দেবে। স্নান করিয়ে, নতুন জামা-জুতো পরিয়ে তারপর চাও-গিন্নির সুমুখে নিয়ে তাকে হাজির করবে। একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে, লম্বা ধবধবে সাদা কামিজ পরে সে যখন গিয়ে দাঁড়াবে, তখন নিশ্চয়ই তাকে খুব বেমানান দেখাবে না। মুখ আর গড়ন তো ওর ভালোই, তার উপরে আছে যৌবন। চাও-গিন্নি নিশ্চয়ই খুশি হবেন—সে হলফ করে বলতে পারে।

যখন ঠিকানায় গিয়ে খুশি পৌঁছল, তার সারা শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। ফটকের ভাঙা দরজাটার সুমুখে দাঁড়িয়ে তার মনে হোলো, বহুদিন পরে সে যেন আবার তার পুরনো বাড়িতে ফিরে এসেছে। ভাঙা দরজা, খসেপড়া দেয়াল, উঠানের জঞ্জালের ভিতরে দুএকটা আধমরা আগাছা দেখে তার কেমন আনন্দই হোলো। হঠাৎ যেন সবকিছু ভালো লাগছে তার, অথচ আগে যখন এখানে থাকত, এসব তাকিয়েও সে দেখেনি। ফটকের ভিতরে ঢুকেই সে খুদে লক্ষ্মীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কড়া নাড়া বা হাঁক দেওয়া তার পোষাবে না, সে সোজা ঘরেই ঢুকে পড়বে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই দুপা সে পিছিয়ে এল। তক্তপোশের উপর একটি আধা-বয়েসী মেয়েমানুষ পা গুটিয়ে বসে আছে। ঘরে আগুনের কুণ্ড নেই বলেই একটা ছেঁড়া লেপ কাঁধের উপর জড়িয়ে বসে আছে। তার নোংরা শুকনো হাত দুখানা দেখা যাচ্ছে। খুশি বোকার মতো উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল।

তক্তপোশের উপর মেয়ে মানুষটা খেঁকিয়ে উঠল.।

কি ব্যাপার গা? তুমি কি কোনো খারাপ খবর নিয়ে এলে নাকি? কেউ মরল না কি গা? তার পর তোমার কেমন ধারা আক্কেল, বলা নেই কওয়া নেই হুট করে এসে ঢুকে পড়লে? কাকে খুঁজছ।

খুশির বুকখানা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল। সে দরজার চৌকাঠ ধরে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু এখনো সে আশা ছাড়েনি।

আমি—আমি খুদে লক্ষ্মীকে খুঁজছি।

কার কথা বলছ জানি না বাপু। কিন্তু বলে দিচ্ছি. এর পরে যখন কাউকে খুঁজতে যাবে হুট করে দরজা খুলে ঢুকে না পড়ে, একবার অন্তত হাঁকডাক দিও বাছা, এখানে খুদে লক্ষ্মী বা বড় লক্ষ্মী কেউ নেই। ভালো চাও তো সরে পড়।

চুপ করে ফটকের বাইরে সে বহুক্ষণ বসে রইল। তার বুকখানা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। কি করবে সে ভেবে পেল না। সব যেন ভুলে গেছে।

আস্তে আস্তে তার মনে পড়ল—খুদে লক্ষ্মীর মুখ তার মনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল। ম্যাজিক লণ্ঠনের মতই যেন একবার আসছে, একবার যাচ্ছে খুদে লক্ষ্মী। বড় বড় দেখাচ্ছে ওকে। শরীরের প্রতিটি ডোল ও দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এমনি সারা জীবন ধরে আনাগোনা করলেও তার তো কোনো দাম নেই। করুক, আনাগোনা করুক। খুশি বাজপড়া লোকের মত বসে রইল।

এবার খুদে লক্ষ্মীর ছায়া ছোট হয়ে গেল, ছবি গেল ঝাপসা হয়ে, আবার তার চেতনা জাগছে। সে বুঝতে পারল কতবড় দাগা সে পেয়েছে।

মানুষ যখন নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারে না, তখন সে ভালোটাই ভাবে তা সে যত অসম্ভবই হোক না কেন! খুশি মনে মনে ভাবল, খুদে লক্ষ্মী এখান থেকে চলে গেছে, বাড়ি বদলেছে মাত্র, তার অবস্থার হয় তো বিশেষ কোনো পরিবর্তনই হয়নি। তার নিজের উপর রাগ হোলো। নিজেরই তো দোষ! সে কেন মাঝে মাঝে ওকে দেখতে আসেনি, ও কেমন আছে কেন খোঁজ নেয়নি? অনুতাপের চাবুক পড়তেই মানুষ জেগে ওঠে, ভুল শোধরাবার জন্যে চেষ্টা করে। খুশিও তাই করবে ঠিক করল। আশেপাশের বাসিন্দেদের সে জিজ্ঞেস করে দেখবে—তারা হয় তো খুদে-লক্ষ্মীর ঠিকানা জানে। সে আবার বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়ল। এবার একজন পুরনো পড়সীর সঙ্গে তার দেখা হোলো। কিন্তু সে স্পষ্ট কোনো উত্তরই পেল না।

খুশি তবু আশা ছাড়ল না, ছাড়তে পারল না। বিকেল গড়িয়ে গেছে, এখনো তার খাওয়া দাওয়া হয়নি। খাওয়ার ইচ্ছেও তার নেই। জোরমন্তকে বা বাচ্চা ভাই দুটোকে খুঁজে বার করতে পারলেই সব ফয়সাল্লা হয়ে যাবে। ওদের নিশ্চয়ই সে পথে কোথাও না কোথাও পাবে ; তাদের খুঁজে বার করা তেমন শক্ত হবে না।

যাকেই সে পথে দেখল, তাকেই সে জিজ্ঞেস করল। গলি ঘুঁজির বাঁকে বাঁকে রিক্সার আড্ডায় আড্ডায়, চা-খানায় আর বস্তিগুলোতে—সব জায়গায়ই সে খুঁজে বেড়াল। সেদিন সন্ধে আর তার পরদিন সারাদিন ধরেই সে খুঁজল। কিন্তু কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় দিনে যখন রিক্সার আস্তানায় এসে হাজির হোলো, তখন তার শরীরের আর জোর নেই। তখন আর আশা নেই, কি করে আশা করবে? যারা গরীব কে তাদের সন্ধান রাখে। তারা মরে যায়, লোকে তাদের ভুলে যায়, কে বলতে পারে খুদে লক্ষ্মীও মরেনি? আর যদি সে বেঁচেও থাকে, জোরমন্ত হয় তো তাকে আবার বিক্রি করেই দিয়েছে। এবার হয়তো কাছে পিঠে নয়, বহুদূর দেশে। কিন্তু তাই যদি হয়, সে তো মৃত্যুর চাইতেও ভয়ানক!

চাও-বাড়িতে যেতে তার আর ইচ্ছে নেই। মনিবকে মুখ দেখাবে কি করে? কি করে সে বোঝাবে যে, খুদে লক্ষ্মীকে এত ভালোবেসেও সে কয়েক মাসের ভিতরে একবারো দেখা করতে যায়নি। আর খুদে লক্ষ্মী তারই ফলে হারিয়ে গেছে, একেবারে হারিয়ে গেছে। মনিব বাড়িতে সে যাবে না—এ খবর পাঠাবারও দরকার নেই। কি হবে খবর পাঠিয়ে? তার ভাগ্য গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, চাও-কর্তা শত চেষ্টা করলেও তা জোড়া লাগাতে পারবেন না।

কিন্তু দশদিন বৃথা খোঁজ করে বেড়াবার পর খুশি চাও-বাড়িতে ফিরে এসে তার নিজের ঘরে ঢুকল। এখানা খুদে লক্ষ্মীরও ঘর হবে এই তো সে ভেবেছিল। কাউকে সে কোনো কথাই বলল না, কাও-মা তো অত কথা বলে, কিন্তু সেও কিছু জিজ্ঞেস করল না।

মদ ও সিগারেট হোলো এবার তার বন্ধু। সিগারেট না টানলে সে কি করে ভাববে? আবার মদ না খেলে ভাবনা সে কি করে তলিয়ে দেবে?

বছর আবার ঘুরে এল। আবার এসেছে উৎসব, দিনগুলিতে গরমের আমেজ দেখা দিচ্ছে।

শ্রীযুক্ত চাও উৎসবে তাকে একদিন ছুটি দিলেন। সেদিন সে যা খুশি করবে, যেখানে খুশি যাবে। কিন্তু খুশির মনে আর ফুর্তি বলতে কিছু নেই। আগেকার ফুর্তির সেই দিনগুলো এখন অচেনাই ঠেকে। সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে বেড়াল। একটা ভূত যেন, কবরখানায় ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু শহর তার মনে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার ধার ধারে না। সে তার চারদিকে সোরগোল তুলল। কাগজের পাখার ফেরিওয়ালারা এতদিন শীতে কোথায় মুখ গুঁজে বসেছিল, এবার পথে বেরিয়ে এল, পথ ছেয়ে ফেলল। তাদের গলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলানো এক একখানা বড় থালা, দড়ির সঙ্গে বাঁধা ঘণ্টা টুংটাং করে বাজছে, পথিককে টানছে। পথের ধারে ধারে বসেছে ফলের দোকান। সবুজ রঙের খেজুরের মতো ফলের স্তূপ তৈরী হয়েছে, চেরির লাল রং চোখ ঝলসে দিচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে হলদে মৌমাছি উড়ে উড়ে পড়ছে বড় বড় লাল গোলাপ আর খেজুরের উপর, আবার চলে যাচ্ছে। চীনে মাটির বড় বড় বাসনে হরেক কিসিমের কাচের জিনিস দোকানে দোকানে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলো এসে ঠিকরে পড়ছে, দুধের মতো সাদা আলো। কাঁধের বাঁকে করে বাক্স নিয়ে চলেছে ফেরিওয়ালা, গাদা গাদা মিষ্টি খাবার তাতে ভরতি। পথের দোকানে দোকানে নানা রং-বেরঙের জিনিস দেখা যাচ্ছে।

লোকেরাও শীতের দিনের বিশ্রী মোটা জামাগুলো বদলে পাতলা জামা পরেছে। নানা রং কত না তার বাহার। সমস্ত সড়কটাই যেন বদলে গেছে, একেবারে বদলে গেছে।

রাস্তায় ঝাড়ুদাররা ঝাঁট দিচ্ছে, আগের থেকে যেন মনোযোগ দিয়েই কাজ করছে। পথে জল ছিটিয়ে চলেছে, ধুলো উঠছে, পথিকদের বিরক্ত করে তুলেছে। কিন্তু এই ধুলোর ভিতর দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে উইলো গাছের নুয়ে পড়া ডাল, সোয়ালো পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে। সবাই যেন নিজেরাই অজান্তে খুশি হয়ে উঠেছে। কে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, অথচ উজ্জ্বল দিন বয়ে

যাচ্ছে। কেমন আলসেমি লাগছে, একটু যেন ক্লান্তিও; বারবার শুধু হাই উঠছে। দিন বয়ে চলেছে।

নানা মিছিল বেরিয়েছে পথে। একদল গাইয়ে ধান বোনবার সেই পুরনো গান গাইছে, কেউ বা সেই বিখ্যাত সেনাপতি পাঁচ বাঘের কাহিনী গাইতে গাইতে চলেছে। কোনো মিছিলে বা সয়তানকে ভয় খাইয়ে দেবার জন্যে কাগজের সিংহ নিয়ে চলেছে। একটার পর একটা মিছিল চলেছে পথে, এঁকে বেঁকে শহরের পথ দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটেছে। ঢাক আর কাঁসর বাজছে, চকচকে রঙ করা বাক্স, হলদে রঙের নিশান কাঁধে নিয়ে একটার পর একটা দল চলেছে। পুরনো থুথ্‌ড়ে বুড়ো পিকিঙ যেন আবার নতুন উৎসাহে মেতে উঠেছে, জনগণের মনে এসেছে উদ্দীপনা। তারা চলেছে, পরিবেশ ছড়িয়ে আছে গানের রেশ, ধুলো উড়ছে—প্রতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর কাছে পৃথিবীর কলুষের কাহিনী সে বলে যাচ্ছে।

যারা মিছিলে চলেছে, যারা দাঁড়িয়ে দেখছে—সকলেরই মনে ঘনিয়ে এসেছে এক উষ্ণ অনুভূতি, উত্তেজনা আর ধর্মবিশ্বাস এসে দেখা দিয়েছে। পার্থিব এই হট্টগোল, এই কাজ কর্ম এ তো সংস্কার থেকেই জন্মায়; যারা মূর্খ তারাই তো এই পার্থিব মায়ায় ডুবে নিজেকে প্রতারণা করে, ভুলে থাকে। রঙের বৈচিত্র্য, শব্দের বন্যা, এই ধুলো ভরা পথ, প্রতি লোককে যেন নতুন প্রেরণা জোগাচ্ছে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এবার যারা পাহাড়ে যাবে, তারা চলে গেল, যারা মন্দিরে যাবে তারা গেল মন্দিরে; যারা ফুল দেখতে বেরিয়েছে, তারা সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল; আর হাজার হাজার লোক, যারা এই করে সময় নষ্ট করতে পারে না, তারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই উত্তেজনা দেখল, ভগবান বুদ্ধের কথাই তাদের বার বার মনে হোলো।

চারিদিকে ফুর্তি, উত্তেজনা, শব্দ আর রঙের সমারোহ। দক্ষিণ আর উত্তর সমুদ্রের নিথর জলে উইলো ডালের ঘন ছায়ায় নৌকা বেঁধে বসে রইল প্রেমিক-প্রেমিকারা। কেউ বা পাশাপাশি পাড়ে শুয়ে রইল; প্রেমের গান গুন গুন করে গাইল—বহু বহুদিন আগের প্রেমের গান। এই অলসতায় গা ঢেলে দিয়ে তারা পরস্পরকে চুমু খেল, চোখে চোখে চেয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি বুঝিয়ে দিল কি তারা চায়। আর দেহ? দেহের তখন যেন প্রথম সম্ভব শুরু হয়েছে।

স্বর্গের ব্রীজের কাছে একটা মেরাপ বেঁধে খোলা হাওয়া চা-খানা তৈরী হয়েছে। সাদা ঢাকনা দেওয়া টেবিলে টেবিলে ভিড়, এখানে ওখানে দুএকটি গাইয়ে মেয়ে টল টল করছে।

সম্ভ্রান্ত লোক আর সংস্কৃতি আর রুচি বোদ্ধারা চলেছেন সরকারী বাগানে। সেখানে ক্যামেলিয়া আর পিয়োনিতে ছেয়ে আছে। তারা আস্তে আস্তে ফুলের ভিতরে ঘুরছেন, হাতের পাখা নেড়ে শরীর জুড়োচ্ছেন, বড় ঘরের মেয়ে বা দক্ষিণী নাচওয়ালীদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে পথে গাড়ি ছুটে চলেছে, বড় ঘরের মেয়েরা বা দক্ষিণী বড় বড় নাচওয়ালী গাড়িতে দেখা যাচ্ছে। সাজসজ্জায় আজ তাদের তেমন বাহার নেই। সাদাসিধে জামা পরেছে, শুধু শরীরের প্রতিটা রেখা আঁটো জামার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠছে। বড় ঘরের মেয়েরা তাদের দেহসৌষ্ঠব দেখাবার আজ একান্ত সুযোগ পেয়েছে।

গ্রীষ্মের প্রথমদিকে গরম যেন দেবতার আশীর্বাদ। পুরনো শহরের সৌন্দর্য যেন সে ফুটিয়ে তুলেছে। পিকিঙ এমনি যেন আফিঙের নেশায় ঝিমিয়ে পড়েছে, কিন্তু এই সময়ই জাগে তার চেতনা। দুঃখদুর্দশা, দুর্ঘটনা, সব ভুলে গিয়ে সে তার ক্ষমতা জাহির করবার জন্যে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। হাজার হাজার লোককে যাদু করে তাদের স্বপ্নের রাজ্যে এনে ছেড়ে দেয়। দুঃখদুর্দশা বুকে চেপে, মৃত্যুর শোক ভুলে গিয়ে তারা স্তব করে এই মহানগরীর! সে কুৎসিত, পূতিগন্ধময়, আবার সে সুন্দরী, সে জরতী, সে ক্ষয়িষ্ণু ; আবার সে জীবন্ত, হাস্যময়ী ; সে হতাশাময়ী, আবার সে শক্তির প্রলেপও বুলিয়ে দিতে জানে। এই তো পিকিঙ, বিস্তীর্ণ পিকিঙ, অননুকরণীয় পিকিঙ,—এই তো মহানগরী পিকিঙ! তাকে ভালো না বেসে তো তুমি পারবে না!

খুশি হয় তো আজও পিকিঙ ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারত না—কিন্তু তার মোহ ভেঙে গেছে, মহানগরীর যাদু আর তাকে বাঁধতে পারছে না। অন্য সময়ে উৎসবের দিনে সে ছোটছেলের মতোই আনন্দে মেতে উঠত, কিন্তু আজ সে উদাসীন, সে ক্লান্ত।

ভোরের আলো তখনো প্রখর হয়ে উঠেনি, এমনি সময় তার সঙ্গে একজন পরিচিতের দেখা হোলো। লোকটা টাট্টুর ঠাকুর্দা। বুড়ো রিক্সাটানা ছেড়ে দিয়েছে, তার চেহারা আর ছেঁড়া পোশাক দেখলে মনে হয় আগের থেকেও দুরবস্থায় সে পড়েছে। তার কাঁধে একটা উইলো কাঠের বাক্স, তারই সঙ্গে একটা মস্ত বড় চায়ের কেতলি ঝুলানো ; আর পিছন দিকে একটা ভাঙা বাক্সে কিছু পিঠে আর মিষ্টি। খুশিকে সে এখনো ভোলেনি। দেখেই সে চিনতে পারল।

কথায় কথায় খুশি জানতে পারল, টাট্টু আজ ছমাস হোলো মারা গেছে, বুড়ো তার ভাঙা রিক্সাখানা বেচে দিয়ে এখন কেক ফল আর চা বিক্রি করেই চালাচ্ছে। রিক্সার আড্ডায় আড্ডায় ফেরি করেই সে বেড়ায়। এখন তেমনি আছে বুড়ো,

শুধু পিঠখানা আরো কুঁজিয়ে গেছে, চোখে একটু হাওয়া লাগলে জল গড়িয়ে পড়ে, চোখ যেন কেঁদে কেঁদেই ফুলে লাল হয়ে উঠেছে।

খুশি তার কাছ থেকে একপাত্র চা খেল, তারপর দুএকটা কথায় নিজের দুঃখের কথা বলল।

ওঃ, নিজের চেষ্টায়ই কিছু একটা করবে ভেবেছিলে বুঝি? বুড়ো বলল, তোমার আর দোষ কি ভাই, আমরা সবাই অমনি ভাবি। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলাম? যখন প্রথম রিক্সা টানতে বেরুই, শরীরটা ছিল ইয়া লম্বা আর মজবুত, মনে ছিল কত আশা। কিন্তু কি হোলো? এখন পর্যন্ত খাটছি, বুঝছি। কি করেছি সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ ভাই। তোমার শরীরে তাগদ আছে! কিন্তু তাগদে কি করবে ভাই? লোহার মানুষ হলেও আমাদের এই সয়তানের ফাঁদে ধরা পড়লে আর বেরিয়ে যেতে পারবে না। তুমি ভালো লোক? তাতেই বা কি হবে রে ভাই!

যারা ভালো লোক ভগবান তাদের ভালো করেন, আর যারা মন্দ তারা ছারেখারে যায়—ওসব কথা দেবতা বা মানুষের কোনো আইনেই নেই। এই তো আমার যখন বয়েস ছিল, কত লোকের জন্যে কত কি করেছি, অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখলেই মনে হয়েছে এতো আমারই দুঃখ-কষ্ট। নিজের জন্যে যতটা না খেটেছি, পরের জন্যে খেটেছি তারচাইতে ঢের বেশি। কিন্তু কি হোলো? খিছুই হোলো না!

বহুলোকের জীবন বাঁচিয়েছি। বহুলোককে নদী থেকে তুলেছি, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে যাবে এমন মেয়েকে রক্ষে করেছি, কিন্তু তার জন্যে কি পেলাম শুনি? কিছুই না। কবে যে উপোস করে মরে যাব, শীতে জমে যাব তা আমি নিজেই জানি না। গরীবরা কি করে জানো, এক লাফেই স্বর্গে যেতে চাই।

কিন্তু লাফিয়ে কতটা উঠতে পারি তা জানি না। তুমি ফড়িঙের দিকে কখতো নজর করেছ? যখন ফড়িঙটা একা থাকে, তখন যতো উঁচুতেই সে লাফিয়ে উঠুক না কেন, একটা একরত্তি ছেলেও তাকে ধরে সুতো দিয়ে বাঁধতে পারে, তখন তার আর শূন্যে ওঠা সাধ্যে কুলোবে না।

কিন্তু এই ফড়িঙটাকেই তুমি ওর দলে ছেড়ে দাও, দেখবে তখন ওর কি তেজ! একেবারে ক্ষেতকে ক্ষেত ওরা সাবাড় করে দিয়ে যাবে। কে তখন ওকে থামায়? একরত্তি ছেলে সুতো দিয়ে তখন বাঁধতে পারবে? কি, আমি ঠিক বলিনি?

অতো ভালো হয়ে আমার কি ফল হোলো দেখ না! একটা নাতি, তাকেও পেটভরে খাওয়াতে পারলাম না। সে অসুখে পড়ল, তাকে এক ফোঁটা ওষুধ

মেয়ে-বৌ দেখলাম না। আমার নিজের কোলে শুয়ে সে মারা গেল, আর দেখ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখলাম। যাক ও নিয়ে বলে আর কি হবে।

...র গো, কার চাই এক পেয়ালা চা—গরম গরম চা!

...খুশি বুঝতে পারল। ন'কর্তা লিউর উপর শোধ নিয়েছে বলে সেদিন সে মনে ...নে বড় খুশি হয়ে উঠেছিল, আজ কিন্তু খতিয়ে দেখে বুঝতে পারছে, এর কোনো মানে ...ই। ন'কর্তা, ইয়াঙবো, গোয়েন্দা সান তার শাপে তাদের কিছু হবে না। নিজে ...জে যে এত খেটে মরল, তাতেই বা কি? কোনো দামই সে পাবে না। নিজের ...পর নির্ভর করে সে বুড়োর গল্পের ঐ ফড়িঙের মতো তার দশা হয়েছে। ঠিক সুতোয় ...ধা পড়েছে ফড়িঙ। পাখা থাকলেই বা কি হবে, উড়বে কি করে?

খুশি তার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলতে যাবে এমন সময় একটা ছোকরা ...বরের কাগজওয়ালা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল।

উয়ান সিঙ্ উগ্র বামপন্থীদের গ্রেপ্তার করেছেন। তাদের ফাঁসি হবে। আজ ...কালে দশটায় তাদের শহরে শহরে ঘুরিয়ে আনা হবে।

উৎসবের দিন ভোরে যারা ফুর্তির সন্ধানে বেরিয়েছে, এমন চাঞ্চল্যকর খবর শুনে ...রা খুশিই হোলো। দিনটা মাঠে মারা যাচ্ছিল, বরং এই খবরটা এসে বেশ চাঙা ...রে তুলেছে। এমন খবর দু-তিন-চারবার পড়লে একঘেয়ে লাগে না। তবু যাহোক ...নটার একটা গতি হোলো। পয়সার পর পয়সা ছোকরা খবরওয়ালার হাতে গুঁজে ...য়ে ঠেলাঠেলি করে পথিকরা এই 'বিশেষ ফাঁসি সংখ্যা' কিনে নিল।

খুশি আর বুড়ো যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তাদেরও পাশে একজন দোকানি তার ...বরের কাগজখানা তাড়াতাড়ি দেয়ালের গায়ে এঁটে দিল। পাশেই তার মদের ...দাকান। বুড়ো কাছে গিয়ে দেখতে লাগল, একটা ভিড় সেখানে জমে ...ঠল।

ও বড় ভাই, আমরা তো অক্ষরই চিনি না। আমাদের পড়ে শোনাও না।

বুড়ো একটু হাসল। সে যে পড়তে জানে একথা ওরা ধরে নিয়েছে। সে ঘটনার ...ব চাইতে কৌতূহলোদ্দীপক জায়গাটা জোরে জোরে পড়ল। কাগজের বেশির ভাগ ...য়গায় উয়ান সিঙের সুখ্যাতিতে ভরা। তার সঙ্গে সংবাদদাতা দেখা করতে গিয়ে ...রকারের জন্য সে যা করেছে তারই লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে। এই কাজের জন্যেই ...াকি সে এখন এতবড় কাজ পেয়েছে। এ হেন উয়ান সিঙ্ গোয়েন্দা বিভাগ ...ার লি বলে একটা লোকের সাহায্যে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী একদল বিপ্লবী ...রে ফেলেছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় কত বড় যোগ্য লোক এই উয়ান ...সিঙ্ আর কি তার সাহস। সংবাদদাতার বিবরণের মাঝখানে উয়ান সিঙের একখানা ...বিরাট ছবি ছেপে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কোন কোন পথ দিয়ে প্রাণদণ্ডিতদের

এই সময়ে একজন ঘোড়সওয়ার পুলিশ তার পিছনে এসে ব্যাটন জল গড়ি তাকে বেশ্যা বলে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিল। শেষবারের মত্রো হুকুমে চিৎকার করে উঠল :

প্রকাশের স্বাধীনতা!

এই শেষ। ঘোড়সওয়ারের দল চলে গেল, তারা মিলিয়ে গেল। শব্দও আর শোনা যায় না। অনেকে পিছনে পিছনে ছুটল। সারা শহরে ঘুরে যে পর্যন্ত না স্বর্গের ব্রিজে পৌঁছে ওদের গুলী করে মারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা এই কলের সঙ্গেই ঘুরবে। অন্য সকলের মজা দেখা হয়ে গেছে; এর স্বাদ কিন্তু কেমন যেন আলাদা, কেমন তেতো যেন। উৎসবের আনন্দ যেন খানিকটা উবে গেছে।

যখন সেই খোলা ট্রাক আর ঘোড়সওয়ার পুলিসের দল চলে চলে যাচ্ছিল, খুশি আর বুড়ো দেয়ালের ধারে পুরনো ভাঙাচোরা স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের পাশেই দেয়ালে খবরের কাগজখানা লাগানো ছিল। তারা ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে নজর চালিয়ে দেখল, কিন্তু বন্দীদের সম্বন্ধে তাদের কোনো কৌতূহলই জাগেনি। হঠাৎ মেয়েটি মাথা তুলতেই খুশি চমকে উঠল।

খুশি চিনতে পারছে: এই সেই চিঙহুয়ার ছাত্রী, কমাস আগে ওকে সে সোয়ারি নিয়ে গিছল। এই মেয়েটিই সেদিন ওকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচায়। ওকে দেখে খুদে লক্ষ্মীর কথাই তার মনে পড়েছিল। খুশির সমস্ত শরীরখানা ওৎ পাতা জন্তুর মতোই কুঁচকে গেল। মুখে চোখের যা অবস্থা হোলো কহতব্য নয়।

বুড়ো তার চায়ের কেতলি আর বাক্সটা রেখে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, হঠাৎ তার ছোকরা সঙ্গীটির হাতখানা তার কাঁধে পড়তেই সে খুশির দিকে তাকাল। খুশি কাঁপছে, কাঁপা হাতে জোর করে তার কাঁধ চেপে ধরে আছে।

ও তো এখনো ছেলেমানুষ! খুশির ঠোঁট থেকে যেন নিশ্বাস ঝরে পড়ল, মুখ সে বুজে রইল।

বুড়ো তার দিকে তাকাল। একদিকে জনতা, আর একদিকে খুশি, মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়া জোর বইছে না, তবু তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।

ওরা তোমাকেও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। খুশির মনে যে উত্তেজনা এসেছে তারই কাছে যেন উত্তর দিল, তোমার কিছু করবারও তো উপায় নেই।

জানি, খুশি দেয়ালে ঠেস দিয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে বলল। বুড়ো তার পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

মেয়ে-বৌরা . করে বসে রইল, কোনো কথা বলল না। ধীরে ধীরে ভিড় ফাঁকা দেখে . । তারপর আস্তে আস্তে খুশি উয়ান সিঙ আর চাও-কর্তার গল্প চিঙহুয়ার ঐ মেয়েটি কেমন করে পুলিশের সঙ্গে তর্ক করে তার পক্ষ .র্থন করেছিল, সে কথাও সে বলল। মেয়েটি তাছাড়া সেদিন তাকে আরো কয়েকটা কথা বলেছিল, তার মানে সে আজও বুঝতে পারেনি। তারপর রীতি মতো মোটা বকৃশিস্‌ও দিয়েছিল।

হাঁ, আমার টাকার দরকার বলেই ও দিল। শেষ করল তার কাহিনী।

হাঁ, বুঝেছি! ঐ সব ভাবনার জন্যেই তো ওকে আজ ওরা গুলি করে মারবে। বুড়ো আস্তে আস্তে বোঝাতে লাগল। শাস্ত্রে আছে, সবাই তো ভালো হয়েই জন্মায়, তারপর তারা মন্দ হয়ে যায়। হানদের ভিতরে আলো আর আঁধার দুইই আছে, যখন আঁধার খুব জমাট বেঁধে উঠল, তখনই ওরা ধন সম্পত্তির আইন জারি করল। ঐ কথাটাই মেয়েটি বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছিল। টাকা টাকা! টাকা মন্দ, টাকা কালোয় কালো বলেই না আমাদের ভিতরের যা কিছু মন্দ ও টেনে হিঁচড়ে বার করে, ভালো সড়কটাকে বন্ধ করে দেয়, আমরা যত লোক ঠকাব, যত চুরি করব, অন্যকে উপোস করিয়ে রাখব, ততই আমাদের টাকা হবে; আর তা না পারলে, আমাদেরও উপোস করতে হবে! কেউ তো আর উপোস বা ভিক্ষে করে খেতে চায় না, তাদের ছেলেমেয়েরা উপোস বা ভিক্ষে করে মরুক এও তারা চায় না। যাদের টাকা আছে, তারা যদি সে টাকা রাখতে চায়—আরো বাড়াতে চায়, হয় তো তাদের আমরা খুব নিন্দে করতেও পারি না। যত টাকা হবে, ততই টাকায় টাকা আনবে, আর তারাও নিশ্চিন্তে থাকবে, ক্ষ্যামতাও বাড়বে। কিন্তু যারা সেই টাকার গোড়ার কথা নিয়ে কিছু বলতে যাবে, তাদের তারা খুন করবে, জেলে পুরবে। এই ছাত্রীটি তো তাইই করেছিল।

খুশির চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হোলো। তার মনে হোলো, সামান্য কটা টাকা ন'কর্তার কাছে রাখতে তাই কত অনিচ্ছে ছিল, আর বাঘিনীর সঙ্গে যে সে সংসার পাতিয়ে ছিল, সেও তো কতকটা টাকার জন্যেই। এখন সে বুঝতে পারছে, টাকার ব্যাপারে ইয়াঙ-গিন্নির মতোই সে স্বার্থপর। সে তো ন'কর্তার পথেই চলেছিল, যাদের সে ঘেন্না করে তাদের পথেই চলেছিল।

তুমি উয়ান সিঙের কথা বলছিলে না? বুড়ো বলতে লাগল। সে তো সরকারের হাতের পুতুল, ওরা তো অমনি হবেই। কিন্তু যাকে সত্যিকারের ঘেন্না করতে হয় সে ঐ বেটন দাগওলা লি। কাগজে লিখেছে, ঐ বেটাই গোয়েন্দাগিরি করে ঐ দুজন ছোকরা আর মেয়েটিকে ধরিয়ে দেয়।

উয়ান সিঙও তো তোমার মনিবকে অমনি ফ্যাসাদে ফেলেছিল। কিজ্বল গড়ি সরকারী কাজ পেল না, তিন জনকে বিয়ে দিয়ে ষাট ডলার পুরস্কার পে বাজারের সস্তা দরে মানুষের প্রাণ বিকোচ্ছে এক এক জনের মাথা পিছু বিজ্রের ডলার।

আচ্ছা পশ্চিম শহরে যে রিক্সা চালাত—সেই দাগওলা লি নয় তো?

হাঁ, হাঁ, সেই বেটাই। সে আমাদের মতোই হতভাগা। আফিম ধরেছিল বেটা, দুবছর ধরে টাকার জন্যে কি যে করেনি তার ঠিক নেই! কুত্তারও অধম বেটা। কিন্তু তারই যে দোষ তাই বা কে বলবে? হাজার হাজার বছর ধরে মেহনৎ করে মানুষ জানোয়ারদের চাইতে উঁচু ধাপেই উঠেছে, কিন্তু এখনো ভাই-বেরাদারদের সেই বুনো জানোয়ারদের ভিতরে ঠেলে ফেলে দেয়ার তাদের কি চেষ্টা! এই যে এতবড় শহর দেখছ, কতো সভ্যভব্য আর পুরনো, কিন্তু এখানে বেশির ভাগই তো আমরা জানোয়ার!

ইস, জানোয়ার হতে হতে একটুর জন্যে বেঁচে গেছি বুড়ো! খুশি চিৎকার করে বলল। আপন মনে ভাবতে লাগল, টাকার জন্যে আর টাকার অভাবে সে কি করেছে। সামান্য কটা টাকা থাকলেও সে কি আর খুদে লক্ষ্মীকে হারাত! সত্যিই সবার উপরই কি অভিশাপ পড়েছে? তারা কি পথ খুঁজে পাবে না, এই অন্ধকার থেকে বেরুতে পারবে না?

ওকে এত কথাই যখন বলেছে, তখন সত্যিকারের বন্ধু ভেবেই খুশি তার কাছে খুদে লক্ষ্মীর কথা আগাগোড়া খুলে বলল।

আমার তো মনে হয়, বুড়ো ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, দুটো পথ এখন আছে। যদি জোরমস্ত তাকে কারো কাছে বিক্রি করে না দিয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই সাদা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, সাদা বাড়িতেই সে গেছে। কি জন্যে বলছি জানো? তার একবার বিয়ে হয়ে গেছে, আর একবার কি কেউ আর সহজে নিতে চাইবে? লোকেরা রক্ষিতা কেনার সময় নয়া মোড়কে নয়া মাল কিনা ভালো করে দেখে নেয়। তাই বলছি, দশ আনার মধ্যে অন্তত আট আনা সম্ভব যে, সে সাদা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। আমার প্রায় ষাট বছর বয়েস হোলো, কতো দেখলাম! যখন কোনো তাগড়াই চেহারার রিক্সাওয়ালাকে দুতিন দিন রাস্তার মোড়টিতে দেখবে না, তখনই জানবে হয় সে মাস-মাইনের কাজ পেয়েছে, নয়তো সাদা বাড়িতে পড়ে আছে। আমাদের মতো গরীবদের মেয়ে কি বৌকে যখনই হঠাৎ পাওয়া যাবে না, তখনও দশ আনার মধ্যে আট আনা সম্ভব যে, তারা সাদা বাড়িতে গিয়েই উঠেছে। আমরা আমাদের ঘাম বিকোই আর আমাদের

ময়ে-বৌরা বিকোয় তাদের মাংস। তুমি, ওকে ঐ জায়গাগুলিতে খুঁজে দেখ। সে যে ওখানেই গেছে এমন কথা আমি বলছিনে, কিন্তু—

আমি শহরের সব জায়গাতেই খোঁজ করেছি।

তুমি হয় তো সাদা ময়দার বস্তার নাম শুনেছ? বুড়ো জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, ওর নাম শুনেছি।

বেশ, পশ্চিম দরজার বাইরে বাড়িটা আছে না, ওরই বাড়িউলী সাদা ময়দার বস্তা। ও শহরের সব সাদা বাড়ির খবর রাখে। ওর কাছে গেলে খুদে লক্ষ্মীর খবর মিলতে পারে।

আচ্ছা, আমি ওখানে যাচ্ছি। শিগ্‌গিরই আবার আমাদের রাস্তার এই মোড়ে দেখা হবে।

খুশি এক নিশ্বাসে পশ্চিম দরজায় গিয়ে হাজির হোলো।

পশ্চিম দরজা পার হয়েই শুরু হয়েছে গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম। কেমন ফাঁকা যেন। দূরে পশ্চিমের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনের উত্তরে একটা জঙ্গল। জঙ্গল পার হতেই সে কতগুলি ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পেল। নিচু তাদের ছাদ। তার মনে হোলো, বোধ হয় এই সাদা বাড়ি। ওরই উত্তরে দশ হাজার জীবিতের বাগানের পাশে একটা জায়গা পড়ে আছে। চারদিক নিঝুম। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না।

বাড়িগুলিতেও কোনো সাড়া শব্দ নেই। একেবারে নিঃসাড়ে পড়ে আছে: তার হঠাৎ সন্দেহ হোলো, সত্যিই এটা কি সাদা বাড়ি, না সে ভুল করেই এখানে এসেছে। সাহস করে সে মাঝখানের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজায় ঘাসের হলদে রঙের নতুন পর্দা ঝুলছে। সে জানে, এইসব বাড়ির মেয়েরা বাড়ির দরজায় খালি গায়ে বসে থাকে, গরীব খদ্দেরদের পথ থেকে ডেকে আনে। খদ্দের চিনতে দেরি হয় না। সাদা বাড়ির কাছাকাছি এলেই খদ্দেররা বেশ্যাবাড়িতে বহু প্রচলিত এক কলি গেয়ে ওঠে। ওতেই পুরনো লোকদের জানা যায়। কিন্তু আজ হঠাৎ এত চুপচাপ কেন? সবাই কি উৎসব দেখতে মন্দিরে গেছে নাকি?

এমনি সে ইতস্তত করছে, এমন সময় পর্দাটা নড়ে উঠল। একখানা মেয়েমানুষের মুখ পর্দা ঠেলে উঁকি মারছে। খুশি চমকে উঠল, মুখখানার দিকে প্রথমে তাকালে মনে হয় একেবারে অবিকল বাঘিনী। সে মনে মনে বলল: আমি খুদে লক্ষ্মীর খোঁজে এসেছি। বাঘিনীকে পেলে তো আমার চলবে না!

ভিতরে এস না বোকা নাগর! মুখখানা কথা কইল: না, গলার স্বর বাঘিনীর মত নয়! কিন্তু কেমন ভাঙা ভাঙা: স্বর্গের ব্রিজের কাছে যারা লতাপাতা টোটকা ওষুধ বিক্রি করে ঠিক তাদেরই মতো!

ঘরে কিছুই নেই। কয়েকখানা তক্তা পড়ে আছে একধারে আর আছে মেয়েমানুষটা। ঘরে দুর্গন্ধে নিশ্বাস নেওয়াই দায়। তক্তার উপরে একটা ছেড়া আর তেলে কালচিটে বিছানা। মেয়েমানুষটার চুলগুলো পর্যন্ত এলোমেলো, মুখখানা ধোয়নি বলে মনে হয়। একটা কালো রঙের জামা তার পরনে, জামার বোতামগুলো খোলা। নিচে একটা সুতির পাতলা পা-জামা।

খুশি নিচু হয়ে দরজা দিয়ে ঢুকল। সে ঘরে ঢুকতেই মেয়েমানুষটা তাকে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁচুলীটা ফাঁক হয়ে মাই দুটো বেরিয়ে পড়ল, অতো বড় আর লম্বা স্তন খুশি জীবনে দেখেনি।

খুশি মাথা তুলতে পারছে না, গলায় লাগছে। এই মেয়েমানুষটাই বোধ হয় 'সাদা ময়দার বস্তা।' খুশির আনন্দ হোলো, তাহলে সে ঠিক ঠিকানায়ই এসে পৌঁছেচে। কেন সে ওর নাম 'সাদা ময়দার বস্তা' খুশি ওর স্তনের বহর দেখেই বুঝতে পারল।

গল্প শোনা যায়, ও নাকি মাই দুটো ইচ্ছে করলে নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারে। ওর খদ্দেররা প্রায়ই ওকে এই কায়দাটা দেখাতে বলে। এটা পাওনার উপরে হোলো ফাউ। কিন্তু সে শুধু এই দুটো বস্তার জন্যেই বিখ্যাত হয়নি। সাদা বাড়িতে থেকেও তার স্বাধীনতা সে বজায় রেখেছে। সে এখানে দায়ে পড়ে আসেনি, নিজের খেয়াল তাকে এখানে টেনে এনেছে। শোনা যায়, তার নাকি পাঁচ পাঁচটা সোয়ামী ছিল। শুয়োরের মাংস যেমন ভাজতে ভাজতে শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়, তেমনি করে ওরাও শুকিয়ে গেল, মরে গেল, সে আর বিয়ে না করে বেশ্যাবাড়িতে স্বাধীন জীবন কাটাতে শুরু করল। সেই থেকে এইখানেই আছে।

সে স্বাধীন বলেই রেখে ঢেকে কথা কয় না। তোমার যদি 'সাদা বাড়ি' সম্পর্কে গোপনে কোনো খবর নিতে হয়, ওর কাছেই তোমাকে আসতে হবে। অন্য বাসিন্দেরা তো ভয়েই কিছু বলতে পারবে না। তাই ওকে সবাই চেনে, আর ওর কাছে ভিড়েরও কামাই নেই। লোকের পর লোক আসছেই। কিন্তু ওকে কি কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে হলেই চা খেতে কিছু পয়সা দিতে হবে। তবে ও মুখ খুলবে। এতে ওর ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে।

খুশি এসব কথা জানত বলেই প্রথমে চা খেতে পয়সা তার হাতে গুঁজে দিল। সাদা ময়দার বস্তা এবার বুঝতে পারল, সে কেন এসেছে। ওকে সে ছেড়ে দিল। একটা পাহাড় দেখতে ইচ্ছা হলে যেমন চট করে সামনের দরজাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেয়, তেমনি খুশি চট করে কথাটা জিজ্ঞেস করে বসল, ঘুদে লক্ষ্মী বলে কোনো মেয়েকে সে দেখেছে কিনা।

'সাদা ময়দার বস্তা' ঘাড় নেড়ে জানাল, সে কখনো নামও শোনেনি।

খুশি তাকে ঘুদে লক্ষ্মীর চেহারার বর্ণনা করতে সে বুঝতে পারল।

হাঁগো, হাঁ। এইখানেই তো মেয়েটা আছে। কাঁচা বয়েস, সাদা ঝকঝকে দাঁত—এই তো সেই মেয়ে গো! আমরা ওকে 'খুদে তুলতুলে মাংস' বলেই ডাকি।

কোন ঘরে সে আছে? হঠাৎ খুশির চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল। মেয়েমানুষটির মুখের ভাব বদলে গেল: তুমি তার দেখা পাবে না।

আমি দেখা করবই!

সে তার এখন মরমর অবস্থা!

খুশি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল। তার মুখখানা রাগে সাদা হয়ে গেছে।

তুমি আমাকে নিয়ে চল, না হলে খুন করে ফেলব। খুশি চিৎকার করে উঠল।

আমি ভেবেছিলাম—আমি—.চল, চল তোমাকেই নিয়ে যাচ্ছি। সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। পথ দেখিয়ে সে নিয়ে চলল। মাথাটা তার ঘুরছে, মাথায় রক্তের চাপ বেড়ে গেছে।

একেবারে কোণের ঘরে, বিকেলে আবছা আলো ভেজানো দরজার ভিতর দিয়ে এসে পড়েছে। সেই আলোতে খুশি তাকে দেখতে পেল। শুয়ে আছে সে। হাঁ, হাঁ, সেই!

বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে খুশি তার নাম ধরে ডাকল! খুদে লক্ষ্মী।

মুখখানা তার চুপসে গেছে, ময়লা চাদরের নিচে তার রোগা শরীরটা দেখা যাচ্ছে। একেবারে ছোট ছেলেমেয়ের মতোই এতটুকু হয়ে গেছে তার শরীর। আস্তে আস্তে সে চোখ মেলল, ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে গেল, সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। খুদে লক্ষ্মী চিনতে পেরে হাসল।

খুশি? তার স্বর স্পষ্ট অথচ ক্ষীণ। নিশ্বাস তার যেন ফুরিয়ে আসছে। দূর থেকে ভেসে আসা ফিস্‌ ফিসানির মতো খুশির কানে পৌঁছল সে স্বর। আবার একটু থেমে বলল, এত দেরি করে এলে কেন বড় ভাই?

খুশি পাগল হয়ে গেছে যেন। বুকের ভিতরটা কেমন করছে! আমি তো তেমাকে খুঁজেই পাইনি।

ওঃ, আর বছর শীতকালে এখানে এসেছি। ছোট ভাইটা অসুখে মারা গেল, তারপর বাবা মাতাল হয়ে রাস্তায় বরফে জমে গেল, অন্য ভাইটা গেল পালিয়ে। কবর দেবার খরচা দিয়ে ভাড়া দিতে পারি এমন পয়সা তখন হাতে নেই। কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। শেষে এইখানেই এসে উঠলাম।

কি অসুখ? খুশি আস্তে আস্তে সাদা ময়দার বস্তাকে জিজ্ঞাসা করল

কে জানে! তিন দিন তো কিছু মুখে দেয়নি। এ জীবন ওর সহ্য হচ্ছে না।

আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই। এ বাড়ির বাড়িউলী তো তুমি?

কি বললে? এখান থেকে পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে না নিলে কেউ যেতে পারবে না। আর এই বাড়ির আর এক পাল মেয়েমানুষগুলির মালিক তো আমি নই, মালিক

হচ্ছেন মেজভাই কু। ওঃ, ওর নাম বুঝি শোননি। উনি একজন মস্ত বড়
পাঁচটা জেলার মধ্যে ওর মতো অতো বড় লোক নেই। খবরদার, ওসব মতলব ক...
যেয়ো না! তাহলে বেশিদিন আর বাঁচতে হবে না।

ওকে কিছু খাবার এনে দাও না।

ও আমার কপাল! ও কিছু মুখেই দিতে চায় না যে!

হ্যাঁ, আমি খাব! খুদে লক্ষ্মী ফিস ফিস করে বলল।

খুশি সাদা ময়দার বস্তার দিকে কটমট করে তাকাল। যাও, খাবার নিয়ে এস।

মেয়েমানুষটা চলে গেল।

এই মেয়েটি, বিছানায় শুয়ে আছে, পাতের মতো লেগে আছে মেয়েটি—
মেয়েটিই ওর জীবন। ও মরতে পারবে না। ওকে সে মরতে দেবে না। এ...
এই দুর্গন্ধে, এই গর্তে ওকে রেখে সে চলে যেতে পারবে না। সে তাকে পেতে...
ওকে না পেলে হুমড়ি খেয়ে অন্ধের মতো সে দাগওলা লি-দের দলে গিয়েই সে ভি...
কিন্তু ওকে যদি সে পাশে পায় দুজনেরই একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

এখনো তার বুকে সেই বাক্যহীন আশা ঘুরে মরছে, হয় তো ওরই সঙ্গে...
তাদের ধ্বংস করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, ওরা গিয়ে এমন এক দলে ...
যারা পৃথিবীর অন্যায়ের বিপক্ষে যুদ্ধ করছে।

কিন্তু উপায় কি? খুদে লক্ষ্মীকে দিয়ে ওদের আর কোনো দরকার নেই।
ওরা যদি জানতে পারে খুশি তাকে চায়, তাহলে মেজ ভাই কু আর সাদা
বস্তা এমন একটা দর হাকবে, যা সে কোনোদিনই দিতে পারবে না।

ভাবতে ভাবতে তার কপাল আর হাতের চেটো ঘেমে উঠল। এখন মর...
তাদের আর কোনো উপায় নেই। আর ওকে নিয়ে যদি এই বাড়ি থেকে বে...
না পারলে, তাহলে দুজনেরই তো মরা ভালো।

হঠাৎ সে ভেবে ঠিক করল, সে কি করবে। হাঁ, হাঁ, কেউ তাকে আর বাধা
পারবে না। তাড়াতাড়ি ক্ষুদে লক্ষ্মীকে বিছানা থেকে তুলে চাদর দিয়ে ঢেকে
তারপর গুঁড়ি মেরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্রমে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে জঙ্গলের ...
ঢুকে পড়ল।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। গরম কমে গিয়ে এখন একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। হেঁটে চ...
তার কোলের বোঝা একটু একটু নড়ে উঠছে। খুদে লক্ষ্মী বেঁচে আছে, খুশি
আছে। তারা এখন মুক্ত, তারা স্বাধীন।